ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ৭ সংখ্যা : ২৬
এপ্রিল-জুন : ২০১১

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

উপদেষ্টা
শাহ আবদুল হান্নান

সম্পাদক
আবদুল মান্নান তালিব

নির্বাহী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

সহকারী সম্পাদক
শহীদুল ইসলাম

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দিকা
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সোলায়মান
প্রফেসর ড. আনোয়ারুল হক খতিবী

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.pathagar.com

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৬

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : এপ্রিল–জুন : ২০১১

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭ ২২০৪৯৮, **বিপণন বিভাগ** : ০১৯১৪-৩৮২১২৪
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
Web : www.ilrcbd.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা।

প্রচ্ছদ : আন-নূর

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার বিভাগ ।

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 100 US $ 5

www.pathagar.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৫

অসহায় শিশুর নিরাপত্তা আইন : একটি পর্যালোচনা ১৩
ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম
মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম

ইসলামে ন্যায় বিচারের গুরুত্ব ও পদ্ধতি ৪৩
ড. মো ঃ শামছুল আলম

ইসলামী ব্যাংকে অনুসৃত বায়' মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতি : একটি সমীক্ষা ৫৯
ড. মোঃ আখতারুজ্জামান

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শ্রম ও শ্রমনীতি ৮৫
মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ

নবাবী আমলে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা ১০৩
ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান

ইসলামে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর বিধান ১১৭
মোহাম্মদ ইলিয়াছ ছিদ্দিকী
মোহাম্মদ মুরশেদুল হক

বিচারবহির্ভূত হত্যা : প্রচলিত আইন ও ইসলামের ফৌজদারি নীতিমালার তুলনা ১৩৩
মো : শাহাদাত হোসেন

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৬
এপ্রিল-জুন : ২০১১

সম্পাদকীয়

আল্লাহর আইনের অন্তরনিহিত বাণী অনুধাবন করুন

মুসলমানরা বিশ্বাস করে আল্লাহ এক অনাদি অনন্ত সত্তা। সবকিছু তিনি সৃষ্টি করেন আবার তিনিই এর বিলুপ্তি ঘটান। তিনি সবার প্রতিপালন করেন। তিনি সর্বশক্তিমান। এসব শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই। আর কেউ তাঁর এ ক্ষমতায় বিন্দুমাত্র শরীক নেই। মানুষ পৃথিবীতে যা কিছু ক্ষমতা লাভ করেছে সবই তাঁর প্রদত্ত। মানুষের মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা এবং ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এর জাজ্বল্য প্রমাণ।

একটা হচ্ছে বিশ্বাস আর একটা বাস্তবতা। যেটা অদৃশ্য সেটা বিশ্বাস হতে পারে কিন্তু যেটা দৃশ্যমান সেটা বাস্তবতা। সেটাকে তো মেনে নিতেই হয়। আল্লাহর অস্তিত্ব ও সত্তা সম্পর্কে আমরা একটা বিশ্বাস পোষণ করি। কিন্তু আল্লাহর ক্ষমতা কেবল বিশ্বাসের বস্তুই নয় এটা নিরেট বাস্তবতা। আল্লাহ আইন, বিধান ও নিয়ম-নীতি তৈরি করেছেন সমস্ত বিশ্বজাহানের জন্য। তার ভিত্তিতে সমস্ত সৃষ্টি পরিচালিত হচ্ছে। কোথাও এ নিয়মের ব্যত্যয় নেই। বিরোধী পক্ষের (যারা আল্লাহকে মানে না) 'কো-ইন্সিডেন্স' আইনের ব্যতিক্রম। আল্লাহর আইনে কোনো ব্যতিক্রম নেই।[১] প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি আল্লাহর অস্তিত্ব না মানি তাহলে তাঁর ক্ষমতার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো চতুরদিকে ছড়ানো ক্ষমতার মধ্য দিয়ে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণিত। কাজেই আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্ষমতা মেনে নিয়েই আমাদের সমস্ত কাজ পরিচালনা করতে হবে।

---

১. আল-কুরআন ৩৩ : ৬২, আল-কুরআন ৩৫ : ৪৩, আল-কুরআন ৪৮ : ২৩

www.pathagar.com

আল্লাহ্ আমাদের পৃথিবীতে বসবাস ও জীবন যাপনের জন্য আইন দিয়েছেন। এ আইন দেবার অধিকার তাঁরই আছে। কারণ আমরা মানি বা না মানি কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তাঁরই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ আইন কি আমাদের ওপর জোর করে চাপানো বোঝা, না আমাদের প্রতি তাঁর করুণা? আমরা মৃত নই, জীবিত। আর আমাদের জীবনের জন্য আমাদের অস্তিত্বের সাথে আমাদের পরিবেশও জড়িত। এ পরিবেশও তাঁরই সৃষ্টি। কাজেই আমাদের ভেতরের ও বাইরের নাড়ী নক্ষত্র একমাত্র তিনিই জানেন। এগুলোর প্রকৃতি, আচরণ, ক্ষমতা, প্রভাব ও কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই জানার সীমানার মধ্যে অবস্থান করছে। তিনি কেবল এগুলো জানেনই না বরং তিনি এগুলোর স্রষ্টাও। কাজেই সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে। এসব বিবেচনায় তিনি আমাদের জন্য আইন তৈরি করলে তা আমাদের ওপর বোঝা হবে, না আমরা আমাদের জন্য আইন তৈরি করলে তা হবে আমাদের জন্য বোঝা?

এটা একটা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। এ জন্য বেশি জ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। আমরা যেখানে কিছুই জানি না, নিশ্চিত জ্ঞানের কোন অংশই আমাদের আয়ত্তে নেই, অন্ধের হাতি দেখার মতো কেবল আন্দাজ ও অনুমানের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে আমাদের আইন তো আমাদের ওপর বোঝা হবেই, যার ফলে প্রতিনিয়ত তা হবে পরিবর্তনশীল। এক্ষেত্রে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর আইন আমাদের প্রতি তাঁর করুণা ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই আমাদের সীমিত বুদ্ধির বিবেচনায় এ আইনকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলে চলবে না। আমাদের অনুধাবন, উপলব্ধি ও অনুসন্ধান করতে হবে এ আইনের তাৎপর্য, প্রকৃতি, জ্ঞানময়তা, পরমতত্ত্ব ও দর্শন (Philosophy)। আল্লাহ কেবল আইন তৈরি করেননি, তিনি সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাও পরিচালনা করছেন। আমরা যা কিছু করছি তাঁর ব্যবস্থাপনার মধ্যে অবস্থান করেই করছি। সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি তথা বিশ্বের সৃষ্টি ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টিকে তাঁর আইন হুবহু মেনে চলতে হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের জন্য অর্থাৎ মানুষের জন্য কিছুটা অপশন (Option) তথা নির্বাচন করার অধিকার দেয়া হয়েছে। আমরা চাইলে এ আইন মানতে পারি এবং চাইলে নাও মানতে পারি। তবে এ আইন মেনে নিলে আমাদের সমস্যার সুষ্ঠু, মানবিক, জাগতিক

www.pathagar.com

ও ন্যায়ানুগ সমাধান সম্ভবপর। আর না মানলে, আল্লাহর দেয়া আইন না মেনে নিজেরা নিজেদের জন্য আইন তৈরি করলে তাতে পদে পদে আমাদের জন্য সংকট, সমস্যা ও বিড়ম্বনা দেখা দেবে। ফলে এক একটা তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে তা পরিবর্তন করে নতুন করে আবার আইন তৈরি করতে হয় এবং আবার তাও পরিবর্তন করতে হয়। এর ফলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়।

তবে এ 'অপশন' কেবল তাদের জন্য যারা আল্লাহকে মেনে নেয়নি। আর যারা আল্লাহকে মেনে নিয়েছে এবং তাঁর আনুগত্য করার স্বীকৃতি দিয়েছে, তাদের জন্য অবশ্যই এ 'অপশন' নেই।[২] তাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে আল্লাহর বিধান মেনে নিয়ে এর মধ্যে অবস্থান করে। আল্লাহর এই বিধানকে মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং এর মধ্যে কোনো প্রকার হেরফের, পরিবর্তন, পরিবর্ধন না করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এরই অধীনে নিজেদের জন্য আইন তৈরি করে তারা এগিয়ে যেতে পারে।

একথা ঠিক, আমরা যখন কোনো বিধান তৈরি করি পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রাখি। এ পরিবেশ পরিস্থিতি পরিবর্তনশীল। আর এ পরিবর্তন কোন দিকে যাবে তা আমরা জানি না। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে আমাদের বিধানও পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত। বরং তিনি পরিস্থিতির স্রষ্টা। তার প্রকৃতি তিনিই নির্ধারণ করে দেন। তাই পরিবেশ পরিস্থিতির সর্বময় চাহিদা পূরণের যোগ্যতার ভিত্তিতে তাঁর বিধান রচনা করেন। এজন্য তাঁর বিধান হয় অপরিবর্তনীয় এবং একমাত্র বাস্তবানুগ বিধান। বরং তাঁর বিধান অমান্য করলে প্রকৃতির সাথে সংঘাত, অস্থিতিশীলতা, অবক্ষয় এবং ধ্বংসাত্মক পরিণতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। এটাকেই কুরআনে বলা হয়েছে–

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি তিনি (আল্লাহ) তাদের আস্বাদন করান যাতে তারা ফিরে আসে।"[৩]

---

২. আল-কুরআন ৩৩ : ৩৬; আল-কুরআন ৫ : ৪৪, ৪৫, ৪৭

৩. আল-কুরআন ৩০ : ৪১

www.pathagar.com

আইন রচনার ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রেক্ষিত বিবেচনার সাথে সাথে আর্থ-সামাজিক অবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক অবস্থা সমাজের একটি প্রধান পরিচালিকা শক্তি। মানুষের সমাজ পুরুষ ও নারীর সমন্বিত রূপেই গড়ে উঠেছে। পুরুষ ছাড়া নারীর অস্তিত্ব নেই এবং নারী ছাড়া পুরুষের অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ্ প্রথম মানুষ আদম আ.-কে যেমন সরাসরি মাটি থেকে তৈরি করেন তেমনি প্রথম নারী হাওয়াকে সরাসরি মাটি থেকে তৈরি করেননি। বরং হাওয়াকে তৈরি করেন আদম থেকে। তারপর প্রত্যেকটি মানুষকে আদম-হাওয়ার সম্মিলনের মাধ্যমে তৈরি করেন। আল্লাহর এ সৃষ্টি রহস্য তাৎপর্য বিহীন নয়। সৃষ্টিগত দিক দিয়ে এই পার্থক্য পুরুষ ও নারীর দৈহিক অবয়ব ও দৈহিক শক্তি-সামর্থের মধ্যে সুস্পষ্ট। এরি ভিত্তিতে আল্লাহ্ মূল অর্থনৈতিক দায়িত্ব পুরুষের ওপর চাপিয়েছেন। স্ত্রীকে দেনমোহরের অর্থ প্রদান করে অর্থনৈতিকভাবে তাকে লাভবান করার দায়িত্ব আল্লাহ্ পুরুষের ওপর প্রদান করেছেন। স্ত্রীর ভরণপোষণসহ পুরো সংসারের অর্থনৈতিক দায়ভার পুরুষের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন। সংসারের কোনো অর্থনৈতিক দায়ভার নারীর ওপর অর্পণ করেননি। বাপের ও স্বামীর সংসারে তার কোনো অর্থনৈতিক দায়ভার নেই।

পুরুষের ওপর আল্লাহ্ একতরফাভাবে যে অর্থনৈতিক দায়ভার চাপিয়েছেন তা বহন করার ক্ষমতা পুরুষের আছে। অন্যদিকে নারীর সে ক্ষমতা নেই। আংশিকভাবে কিছু থাকতে পারে, তবে সামগ্রিকভাবে নারী এ দায়ভার বহন করার ক্ষমতা রাখে না। আর আইন তৈরি করার ক্ষেত্রে সামগ্রিক অবস্থাকে সামনে রাখা হয়। কোনো আংশিক অবস্থা বা ব্যতিক্রমের ভিত্তিতে আইন রচনা করা হয় না। কাজেই বাপের সম্পত্তিতে ছেলে আর মেয়ে যদি সমানভাবে ভাগ পায় তাহলে মেয়ে লাভবান হয় এবং ছেলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ক্ষতিপূরণ করার জন্যে আবার মেয়েকেও ছেলের মতো বাপের সংসারে অর্থনৈতিক দায়ভার গ্রহণ করতে হয়। এটা কি বাস্তবসম্মত? বিয়ের পর মেয়ে চলে যাচ্ছে স্বামীর সংসারে। সেখান থেকে সে আবার বাপের সংসারের অর্থনৈতিক দায়ভার বহন করবে কেমন করে? এ বিবেচনায় কোনো প্রকার দায়ভার ছাড়াই আল্লাহ তাকে যে অর্ধেক সম্পত্তি দান করেছেন তা তার অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য কম নয়। অন্যান্য ধর্মে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান বিকৃতির ফলে যেখানে কুরআনের আগমন হয়েছে সেখানে অন্যান্য ধর্মে নারীকে বাপের সম্পত্তির কোনো অংশ না

www.pathagar.com

দিলেও কুরআন শুরু থেকেই নারীকে অর্ধেক ভাগ দিয়েছে কোনো প্রকার অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব ছাড়াই। এটা নারীর একান্ত নিজস্ব তহবিল। এক্ষেত্রে নারী লাভবান। বাস্তব দৃষ্টিতে বিষয়টি বিচার-বিশ্লেষণ করা উচিত। চৌদ্দশো বছরের সমাজ কাঠামো উলটিয়ে দেয়া কোনো সহজ ও স্বাভাবিক বিষয় নয়। ফলে সমাজে যে বিপর্যয়টা দেখা দেবে সেটাকে রুখবে কে? সমাজ বিজ্ঞানী, আইনজ্ঞ ও চিন্তাশীলদের অবশ্যই এ ব্যাপারে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে। 'কুরআনের অনেক বিধান আমরা মেনে চলি না আর একটা বিধান না হয় ভাঙা হলো এতে আর কি হবে!' এ ধরনের হালকা কথা ও চিন্তা অভিপ্রেত নয়।

আসল বিষয়টা আমরা এখানে আলোচনা করতে পারি। কুরআনের অমোঘ বিধান পরিবর্তন করার আগ্রহের পেছনে আসলে যে বিষয়টি কাজ করছে সেটি হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। কুরআনের বিধানকে নারীর ক্ষমতায়নের পথে বাধা মনে করা হচ্ছে। একদল মনে করছেন, কুরআনের বিধান নারীর অগ্রগতির পথের বাধা। এই বাধাকে উপড়িয়ে ফেললে নারীরা নিশ্চিন্তে এগিয়ে যেতে পারবে। নারীর এই ক্ষমতায়ন বলতে আমরা কি বুঝবো? নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি! জীবনের সব ক্ষেত্রে নারীকে সক্ষম করে তোলা এবং তার সক্ষমতা, শক্তি-সামর্থ্য, মেধা ও কর্ম কুশলতাকে পূর্ণাঙ্গ পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়া। এ পথে চলার যাবতীয় বাধা দূর করা।

নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিশ্চয়ই পুরুষের সক্ষমতা কমাবার কথা চিন্তা করা হচ্ছে না। এ কথা চিন্তা করা হচ্ছে না যে, এতদিন পুরুষরা সমাজ ও রাষ্ট্র চালিয়ে এসেছে, নারীরা ছিল তাদের অধীন। এবার নারীরা এসব চালাবে এবং পুরুষরা থাকবে তাদের অধীন। নিশ্চয়ই হাজার হাজার বছরের এই সামাজিক কাঠামো ও সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করার আজগুবি চিন্তা করছে না তারা। কারণ নারীর মধ্যে সামগ্রিকভাবে যদি এ ধরনের যোগ্যতা ও শক্তি থেকে থাকে তাহলে তাকে সক্ষম করে তুলতেও তো হাজার বছরের প্রচেষ্টার প্রয়োজন হতে পারে। মানুষের সমাজ ও সভ্যতা যেটা আজ গড়ে উঠেছে এটাও তো হাজার হাজার বছরের প্রচেষ্টার ফসল। নতুন আরেকটা নারীতান্ত্রিক সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলতেও তো তেমনি হাজার বছরের সাধনার প্রয়োজন হবে। সেজন্য কি পৃথিবী অপেক্ষা করবে? নিশ্চয়ই নয়। পৃথিবী থেমে থাকে না, পেছনে তাকায় না, সামনে এগিয়ে চলে। নিশ্চয়ই তাহলে নারীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্য পৃথিবীকে পিছিয়ে দেয়া নয়। তাহলে নারীর ক্ষমতায়ন হতে পারে নারীকে

www.pathagar.com

সকল প্রকার ভার ও অবরোধ মুক্ত করে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল করা যাতে তার গতি হতে পারে অবাধ ও দুর্বার। এক্ষেত্রে নারীর প্রতি জুলুম, অন্যায় ও অবিচারের পরিমাপ করতে হবে।

নারীর প্রতি এ পর্বত প্রমাণ জুলুম, অন্যায় ও অবিচারের অবসান ঘটানোর জন্যই তো কুরআনের আগমন হয়েছিল আজ থেকে চৌদ্দশো বছর আগে। কুরআন এসে পুরুষের পাশাপাশি সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। নারী সম্পদের মালিক হয়েছিল, যা সে ইতঃপূর্বে ছিল না বরং ইতঃপূর্বে নারী নিজেই ছিল একটি সম্পদ এবং পুরুষের মনোরঞ্জনের সামগ্রী। কুরআনের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদ্যা শিক্ষা অর্জন করা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য সমানভাবে ফরয করে দিয়েছিলেন।[৪] নারীর সম্মতি ছাড়া বিয়ে দেয়াও অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন। নারীর কর্মসংস্থানেও কোনো বাধা ছিল না। মদীনার কৃষি নির্ভর সমাজে অনেক মেয়ে তাদের কৃষি খামারে ও খেজুর বাগানে কাজ করতেন, সেগুলোর তত্ত্বাবধান করতেন। মেয়েরা গৃহে কাজ করতেন। গৃহের বাইরেও কাজ করতেন। যুদ্ধ বিগ্রহেও অংশ নিয়েছেন।

আজ থেকে চৌদ্দশো বছর আগের কুরআনিক সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের যে ভিত রচিত হয়েছিল, তা ইতঃপূর্বে দুনিয়ার আর কোথাও ছিল না, তারি ভিত্তিতে মুসলমানদের সমাজ এগিয়ে আসছিল সবচেয়ে আলোকিত সমাজ হিসেবে। শত শত বছরের পথ পরিক্রমায় অন্য জাতিদের অন্ধকার তাদের আলোকে গ্রাস করে। কুরআনী সমাজে পুরুষ ও নারী ছিল একই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। তারা ছিল একে অন্যের লেবাস-পোশাক ও আবরণ আচ্ছাদন এবং মান-সম্মানের প্রতীক।[৫] নবীর ভাষায় "নারীরা পুরুষদের সহোদর।"[৬] অন্যদিকে অন্যান্য জাতিদের অন্ধকার জগতে নারী ছিল পুরুষের আশ্রিত ও অংকশায়িনী একটি

---

৪. 'প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর ওপর বিদ্যা অর্জন করা ফরয।' ইবনে মাজাহ, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আস-সুন্নাহ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল উলামা ওয়াল হিস্‌সু আলা তালাবিল ইল্‌ম, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ২৪৯১

৫. আল-কুরআন ২ : ১৮৭

৬. আবু দাউদ, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আত-তাহারাত, অনুচ্ছেদ : ফির রাজুলি ইয়াজিদুল বাল্লাতা ফী মানামিহি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১২৩৯

www.pathagar.com

বাকশক্তি সম্পন্ন দ্বিপদ বিশিষ্ট জীব। সেখানে নারী এক জাতি, পুরুষ আর এক জাতি। নারী ছিল পুরুষের অধীন, পুরুষের সম্পদ। নারী শোষিত নির্যাতিত হয়ে এসেছে পুরুষের হাতে শত শত হাজার হাজার বছর ধরে। এখনো এ নির্যাতন শেষ হয়নি। আধুনিক সভ্যতার দৃষ্টিতে নারীর বাজারের পণ্য হওয়ার যোগ্যতা এখনো কমেনি। পণ্যের বিজ্ঞাপন নারীদেহ ছাড়া জমে ওঠে না।

প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক সভ্যতার জাহেলী অন্ধকারে মুসলিম সমাজও আকণ্ঠ ডুবে গেছে। কুরআনিক সমাজে নারীর যথার্থ ও স্বাভাবিক ক্ষমতায়নকে তারা অব্যাহত রাখতে পারেনি। ফলে মুসলিম সমাজেও নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গেছে। নারী হয়ে গেছে পুরুষের অধীন। নারী তার সম্পত্তি ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নারী নিগৃহীত হচ্ছে পুরুষের হাতে। যেখানে শিক্ষালাভ করা উভয়ের জন্য সমান ফরয ছিল সেখানে মুসলিম নারীরা শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক পেছনে। অনেক মুসলিম দেশে তারা রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারও পুরোপুরি লাভ করতে পারছে না। মুসলিম নারীরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। ফলে মাত্র কয়েকশো বছর আগে ইউরোপের শিল্প বিপ্লব ও তার পরবর্তী পর্যায়ে বুদ্ধির মুক্তির পতাকাবাহী ফরাসী বিপ্লবের পর ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন জাতির নারীরা যে মুক্তির স্বাদ লাভ করা শুরু করেছে মুসলিম নারীরা বহু পূর্বে থেকেই তা লাভ করে আসছিল। কিন্তু প্রথম দিকের কয়েকশো বছর ছাড়া পরবর্তীকালে সবই ছিল কাগজে কলমে। পরিবর্তিত সামাজিক ও জাগতিক পরিস্থিতিতে তার উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে অন্য জাতিদের থেকে আমরা পিছিয়ে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে। আমাদের জাতির বর্তমান কর্ণধাররা যেহেতু বিরাট 'গ্যাপের' মধ্য দিয়ে উঠে এসেছেন, তাঁরা মুসলিম মিল্লাতের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, স্বাধীন দেশের অধিপতি হিসেবে মুসলমানদের ওপরে শাসন চালাচ্ছেন কিন্তু মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও আকীদা বিশ্বাসের ধারক তাঁরা নন। তাই তাঁরা বিজাতির মতো ব্যবহার করছেন মুসলিম জনসাধারণের সাথে। কুরআনকে তারা ছেলের হাতের মোয়া ঠাউরেছেন। তারা অনেক বড় বড় কেতাব পড়ছেন, তাদের অনেকে লণ্ডন মিউজিয়ামের মতো বিশাল বিশাল লাইব্রেরীতে গিয়ে

www.pathagar.com

অনেক বড় বড় এবং বিপুলায়তন গ্রন্থের পাতা উলটিয়েছেন। কিন্তু একবার নিজেদের গৃহে সযত্নে রক্ষিত কুরআনের পাতাটি উলটিয়ে কি তার বক্তব্য বুঝার চেষ্টা করেছেন? তারা যত কেতাব পড়ে থাকুন তাদের জানা উচিত কুরআনই সমস্ত জ্ঞানের আধার। এর মধ্যে সংশয় ও ভুলের লেশমাত্র নেই। কাজেই এর কোনো বিধান পরিবর্তন না করে বরং এর যথার্থ বিশ্লেষণে যত্নবান হোন। আমাদের জ্ঞানবানরা এ কাজই করে এসেছেন শত শত বছর ধরে। যখন তারা এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছেন তখন দুনিয়ায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর যখন আমরা এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে যাচ্ছি না তখন অন্যের নেতৃত্বে আমরা পরিচালিত হচ্ছি।

কাজেই কুরআনের বিরুদ্ধে অবস্থান না নিয়ে কুরআনের বক্তব্য ও অন্তরনিহিত বাণী, উদ্দেশ্য ও লক্ষ অনুধাবন ও উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। কুরআনের অনুসরণ মানে নারীর ক্ষমতায়ন এবং কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ মানে নারীর অধিকার হরণ।

–আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৬
এপ্রিল-জুন ঃ ২০১১

অসহায় শিশুর নিরাপত্তা আইন : একটি পর্যালোচনা

ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম*
মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম**

[সারসংক্ষেপ : শিশুরা মানবতার রক্ষাকবচ। মানব-প্রজন্মের অস্তিত্বের প্রতীক। তৃতীয় বিশ্ব বিশেষ করে এশিয়া আফ্রিকার রাস্তা-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে পরিচয়হীন অগণিত শিশুদের দেখা যায়। এরা পথশিশু, পথকলি, টোকাই, ভবঘুরে শিশু বলে সমাজে পরিচিত। এদের নেই কোন পরিচয়, নেই ঠিকানা। বেশিরভাগ পথশিশুর পিতা-মাতা নেই। অনেকের পিতা-মাতা হয়তো আছে; কিন্তু যোগাযোগ নেই, নেই পরিচয়। শিশুরা দারিদ্র্য, দাম্পত্য বিচ্ছেদ, পরিবার থেকে পলায়ন ও যৌন নিপীড়নের কারণেই রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হয়। কেউ তাদের দেখাশুনো করে না। এরা রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল, অফিস চত্বর, পার্ক, রাস্তার ধারে ও খোলা আকাশের নিচে বাস করে। দরিদ্র বাবা-মায়ের বিবাহ বিচ্ছেদ বা একাধিক বিবাহ পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থা, পারিবারিক অশান্তি, যৌন নির্যাতন, ক্ষুধা, অসুস্থতা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, নদী ভাঙ্গন, হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণে গৃহহীন ও আশ্রয়হীন শিশুরাই অসহায় শিশু নামে পরিচিত। এ সমস্ত অসহায় শিশু ও মায়া-মমতা মাখা আচরণ কারও থেকে পায় না। তারা সেবা-যত্ন থেকে বঞ্চিত থাকে। শিশুদের বিপর্যস্ত জীবনের কারণসমূহের মধ্যে পিতা-মাতা না থাকা অন্যতম। দ্বিতীয় কারণ হলো অবৈধ সন্তান এবং তৃতীয় হলো যারা পিতামাতা থেকে বিতাড়িত, অন্যদের কাছ থেকে এমনকি একান্ত নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকেও পিতার স্থলাভিষিক্ত কাউকে না পাওয়া। অন্যের সেবা-যত্নের মধ্যে কিছু না কিছু এমন অভাব থাকে যার ফলে সে হয়ত পেটভরে খেতে পায় কিন্তু তার অতীব প্রয়োজনীয় আরও অনেক কিছু অপূর্ণ থেকে যায়। এমতাবস্থায় অসহায় শিশু বিভিন্ন দিক দিয়ে উচ্ছন্নে যাওয়া শুরু করে এবং বিপর্যস্ত জীবনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। আস্তে আস্তে তারা অপরাধ জগতের দিকে চলে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। যার ফলে অসহায় শিশুরা অন্ধকার জগতে প্রবেশ করতে থাকে। অত্র নিবন্ধে প্রাসঙ্গিকতার নিরীখে অসহায় শিশুর পরিচয়, প্রকারভেদ, অসহায় হওয়ার কারণ, অসহায় শিশুর নিরাপত্তা আইন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।]

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, উত্তরা, ঢাকা।

www.pathagar.com

অসহায় শিশুর সংজ্ঞা

অসহায় শিশুর অধিকার বিষয়ে আলোকপাত করার পূর্বে শিশুর পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। শিশু শব্দের আভিধানিক অর্থ– মানুষের শাবক[১]। 'লিসানুল 'আরাব' গ্রন্থে শিশু-এর প্রতিশব্দ الطِّفْلُ করা হয়েছে, الطفل : الصغير من كل شيء "প্রত্যেক বস্তুর ছোটকে শিশু বলা হয়।"[২]

পরিভাষায়- الصَّبِـيُّ يُدْعى طِفْلاً حين يسقط من بطن أُمه إِلـى أَن يَحتلـم "মায়ের গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে স্বপ্নদোষ হওয়া পর্যন্ত বয়সকালীন মানব সন্তানকে শিশু বলে।"[৩]

Shorter Oxfort English Dictionary-তে শিশুর অর্থ বলা হয়েছে, *Childhood : The state or stage of life a child. The time during which one is a child. The time from birth to puberty.*[4]

শিশুর সামগ্রিক সংজ্ঞা নির্ণয়ে ও নিরূপণে জাতীয় নীতি, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ এবং জাতিসংঘ প্রদত্ত সংজ্ঞায় পার্থক্য দেখা যায়। জাতিসংঘ সনদের ধারা-১-এ ১৮ বছরের কম বয়সী প্রত্যেককেই শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।[৫] তাই শিশু

---

১. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-এর 'বাংলা ভাষার অভিধান' এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রভৃতিতে শিশু বলতে বোঝানো হয়েছে অনূর্ধ্ব আট কিংবা ষোল বছরের বালক, পরবর্তীকালে সমবয়সী বালক-বালিকাসহ অনূর্ধ্ব ১৬ বছরের মনুষ্য সন্তানকে। তবে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষে একই সঙ্গে ১১ বছর হতে ১৫ বছর বয়সীদের কিশোর হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। উইলিয়াম কেরীর *'Dictionary of Bengali Language'*-এ শিশুকে 'ইনফ্যান্ট'-এর সমার্থক বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "শিশু From শশ্ to go by leaps, a child, an infant, a boy under eight years of age."

২. আরবী ভাষায় শিশুকে طفل এবং বহুবচনে اطفال বলা হয়। অনুরূপ الطفل শব্দকে و الطفالة الطفولية و الطولة ইত্যাদিও বলা হয়। তাছাড়া الـصبي বহুবচনে الـصبيان ; الـصغير বহুবচনে الصغار; الولد বহুবচনে الأولاد ; غلام বহুবচনে غلمان ; مولـود কন্যাশিশুদের ক্ষেত্রে صبية বহুবচনে صبيات ; بنت বহুবচনে بنات .

ইব্ন মানযূর, *লিসানুল আরাব*, ইরান : নাশ্‌রু আদাবিল হাওযাহ, ১৪০৫, খ. ১১, পৃ. ১০৪

আল-কুরআনে এসেছে– هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ আল-কুরআন, ৩৯ : ৬৭

৩. ইবনে মানযূর, *লিসানুল আরাব*, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ১০৭

৪. *Shorter Oxfort English Dictionary*, A-M, Newyork : Oxford University press, 1993. Vol-1, 15 th Edition, P.394.

৫. ইসলাম, ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল সম্পাদিত, *বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার*, ঢাকা : ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ১৯৯৭, পৃ. ৯

www.pathagar.com

সম্পর্কিত সকল আইন, নীতি ও অনুশীলন এই বয়সের মানব সন্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তাই ১৮ বছরের নিচে সবাই শিশু; যদি না দেশের আইন আরো কম বয়সের ব্যক্তিকে সাবালক হিসাবে অনুমোদন করে।[৬]

উক্ত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জাতিসংঘ প্রদত্ত শিশুর সংজ্ঞা বলতে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন শিশু আইনের দৃষ্টিতে যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে শরীয়তের মুকাল্লাফ (শরীয়তের বিধান যার ওপর প্রযোজ্য) হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছেলে-মেয়েকে শিশু বলা যাবে। মোটকথা যাদের ওপর শরীয়তের বাধ্যবাধকতা নেই তারাই শিশু।

অসহায় শিশু বলতে আমরা সে সব শিশুদের বুঝি যাদের কোন পিতৃপরিচয় নেই, পথশিশু যারা পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, পথেই কাজ করে ও পথেই ঘুমায় এবং যাদের মা-বাবা নেই তথা ইয়াতীম; এরাই সমাজ ও দেশের মধ্যে অসহায় শিশু নামে পরিচিত।

অসহায় শিশুর প্রকারভেদ

অসহায় শিশুকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– ১. পিতৃ-পরিচয়হীন শিশু, ২. পথশিশু, ৩. ইয়াতীম শিশু।

নিম্নে এ তিন প্রকার শিশুর পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

১. পিতৃ পরিচয়হীন শিশু : মানুষ সাধারণত তার পিতার পরিচয়েই পরিচিত হয়ে থাকে। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলাও মানুষকে তাদের পিতার নামসহ ডাক দিবেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের পিতার নামসহ ডাক দেয়া হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের নাম সুন্দর রাখবে।"[৭] পরিচয়হীন শিশু তাদেরকে বলা হয় যাদের সামাজিকভাবে কোন পিতৃ পরিচয় নেই।

২. পথশিশু : সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজ সেবা অধিদপ্তরের এপ্রোপ্রিয়েট রিসোর্সেস ফর ইমপ্রভিং স্ট্রিট চিলড্রেন্স এনভায়রনমেন্ট (এরাইজ) নামে পরিচিত (বর্তমানে প্রটেকশন অব চিলড্রেন্স এট সিক্স বা পিকার নামে পরিচিত)

---

৬. রাইটস ক্লাস্টার, *শিশু অধিকার, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ*, ঢাকা : ইউনিসেফ, ১৯৯২, পৃ. ৮

৭. আবু দাউদ, ইমাম, *আস্-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ফী তাগায়ীরিল আসমা, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১৫৮৫-৬; *আল-বাইহাকী*, ইমাম, *শুয়াবুল ঈমান* ফী হুকুকিল আওলাদ ওয়াল আহলিয়্যিন, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলামিয়্যাহ, ১৪১০, খ. ১৮, পৃ. ১৪৮

عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم

www.pathagar.com

প্রকল্পটি পথশিশুদের নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে–

ক. ১ থেকে ১০ ঘন্টা বা তার বেশি সময় যে শিশু রাস্তায় থাকে, কাজ করে এবং কাজ শেষে ফিরে যায় বস্তিতে বা বাসায়।

খ. ১ থেকে ১০ ঘন্টা বা তার বেশি সময় রাস্তায় কাজ করে ফিরে যায়, আত্মীয়-স্বজন বা আশ্রয় কেন্দ্রে।

গ. ১ থেকে ১০ ঘন্টা বা তার বেশি সময় রাস্তায় কাজ করে, থাকে চাকরিদাতার বাসায়।

ঘ. ২৪ ঘন্টার সারাটা সময় রাস্তায় থাকে, রাস্তায় খায় এবং রাস্তায় ঘুমায়।

তবে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'অপরাজেয় বাংলাদেশ' ২৪ ঘন্টার সারাটা সময় যারা রাস্তায় থাকে, কাজ করে এবং রাস্তাতেই ঘুমায় কেবল তাদেরকেই পথশিশু মনে করে।[৮]

৩. ইয়াতীম শিশু : ইয়াতীম (يتيم) বলা হয় এমন শিশুকে যার পিতা নেই এবং যে নাবালক শিশু, অনাথ শিশু।[৯] পিতৃ-মাতৃহীন শিশুকেও ইয়াতীম বলা যায়। অর্থাৎ নাবালেগ অবস্থায় যার পিতা মারা যায় তাকে ইয়াতীম বলা হয়। বালেগ হয়ে গেলে তাকে আর ইয়াতীম বলা যায় না। ইয়াতীম বললেও সেটা পরোক্ষভাবে বলা হয়, বাস্তবে সে ইয়াতীম নয়।[১০] ইমাম কুরতুবী মাওয়ারদীর সূত্রে বলেন: "যে আদম সন্তানের মা মারা যায় তাকেও ইয়াতীম বলে। তবে ইমাম কুরতুবীর মতে, মানুষের পিতা মারা গেলে তাকে ইয়াতীম বলা হয়। আর পশুর মা মারা গেলে সে পশুকে ইয়াতীম বলা হয় না।"[১১]

শিশু অসহায় হওয়ার কারণ

মানব শিশু অসহায় হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কারণসমূহ অন্যতম :

ক. অপরিণত বয়সে পিতা-মাতা মারা যাওয়া : প্রত্যেক মানব শিশু আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে পিতামাতা এবং মানব জাতির জন্য নিআমত ও আমানত স্বরূপ। পৃথিবীতে মানবজাতির বংশধারা সুরক্ষার জন্য মানব-মানবীর বৈধ দাম্পত্য জীবনের ফসল হচ্ছে মানব শিশু। এই শিশুরাই মানব সভ্যতার রক্ষাকবচ, মানব প্রজন্মের

---

৮. *বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার*, সংখ্যা-২০, এপ্রিল-নভেম্বর-২০০৫

৯. রহমান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, *আল-মুজামুল ওয়াফী*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫, পৃ. ৯৫১

১০. মানছুর, মুহাম্মদ আলী, *নিজামুত তাজরীম ওয়াল ইক্বাব*, মদীনা মুনাওয়ারা : আল-ইহরাম আল-তিজারীয়া প্রেস, মুআস্সাসাতুজ জাহরা লিল ঈমান ওয়াল খাইর, ১৩৯৬, খ.১, পৃ. ৩৫৩

১১. কুরতুবী, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ, *আল-জামি লি আহকামিল কুরআন*, আল-কাহেরা : দারুশ শায়ব, ১৩৭২, খ.২, পৃ.১২

www.pathagar.com

ভবিষ্যৎ এবং পিতামাতা ও উম্মাহর সমৃদ্ধ জীবনের আশার আলো। শিশু সন্তান হচ্ছে পার্থিব জীবনের শোভা।[১২] শিশু অসহায় হওয়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান। তন্মধ্যে অপরিণত বয়সে তার পিতা-মাতা মারা যাওয়া অন্যতম। পিতৃ-মাতৃহীন অনেক ক্ষেত্রেই সদাচরণ ও মায়ামমতা মাখা আচরণ পায় না। সে পরিপূর্ণ সেবা-যত্ন থেকে বঞ্চিত থাকে। শিশুর জীবনের প্রাথমিক স্তরে পিতৃবিয়োগ হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার মাথার ওপর স্নেহের হাত রাখার ও দয়ার্দ্র হৃদয়ের বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়। শিশুর বিপর্যস্ত জীবনের মূল কারণের মধ্যে পিতা-মাতা না থাকা অর্থাৎ ইয়াতীম হওয়া অন্যতম। অন্যদের কাছ থেকে এমনকি একান্ত নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকেও পিতার স্থলাভিষিক্ত কাউকে পাওয়া যায় না। অন্যের সেবা-যত্নের মধ্যে কিছু না কিছু এমন অভাব থাকে যার ফলে সে হয়ত পেটভরে খেতে পেল কিন্তু তার অতীব প্রয়োজনীয় আরও অনেক কিছু অপূর্ণ থেকে যায়। এমতাবস্থায় ইয়াতীম শিশু বিভিন্ন দিক দিয়ে উচ্ছন্নে যাওয়া শুরু করে এবং বিপর্যস্ত জীবনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। আস্তে আস্তে তার সুকুমার বৃত্তিগুলোর জায়গাগুলো কুপ্রবৃত্তি দখল করে নেয়। ফলে ধীরে ধীরে সে অপরাধ জগতের দিকে ঝুঁকতে থাকে। পরিণামে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হতে থাকে।

খ. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য কলহ : বিয়ে, সংসার এবং দাম্পত্য জীবন মানবজীবনের এক অপরিহার্য অংশ। সুখী দাম্পত্য জীবন মহান আল্লাহর এক বিশেষ নিআমত। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের ঐকান্তিক চেষ্টায় এ সুখ আসতে পারে। এ জন্য দু'জনকেই হতে হয় ধৈর্যশীল, আন্তরিক ও কল্যাণকামী। বাংলাদেশে দাম্পত্য কলহের কারণে শুধু ঢাকা নগরীতে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ২৪.৪১টি বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে যা হিসাব করলে প্রতি মাসে ৭৩২.৩ টিতে দাড়ায়। এখানে যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তা আসল সমীক্ষা নয়। কারণ এছাড়া আরো অনেক রয়েছে যেগুলোর খবর আমরা জানি না এবং অনেকে ব্যাপারটি ধামাচাপা দেয়। তাছাড়া সকল বিরোধ সব সময় বিচ্ছেদে রূপ নেয় না। অর্থাৎ বিরোধ ও কলহের সংখ্যা প্রচুর। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ দাম্পত্য কলহের কারণে শিশু অনেক সময় তাদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। আর তখন সে অসহায় শিশুর মধ্যে গণ্য হয়।

স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের সহযোগী। উভয়ের সমঝোতা, সহযোগিতা এবং যৌথ প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর পরিবার গড়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কী ধরনের হবে সে ব্যাপারে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অতুলনীয় মহান আদর্শ। তাঁর ব্যাপারে তাঁর স্ত্রীগণ সুউচ্চ ধারণা এবং ভূয়সী প্রশংসা করতেন। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি কর্তব্য পালনে পরিবার একটি সুখের আবাসে পরিণত হয়। আবার কর্তব্যে

---

১২. আল-কুরআন, ১৮ : ৪৬, الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

www.pathagar.com

অবহেলার কারণে পারিবারিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠতে পারে। আল-কুরআনের চেতনা অনুযায়ী দাম্পত্য জীবন গড়ে তুললে কলহ-বিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠতে পারে না। সেজন্য কতিপয় বিষয়ের প্রতি দম্পতিদের গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। যেমন– স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে ভূষণ ও পরিচ্ছদ মনে করা, পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা, একত্রে থাকা ও খাওয়া, পরিবারকে শান্তির নীড় হিসেবে গড়া, আল্লাহর কাছে দুআ করা, সুদৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করা, একে অপরকে পরিপূরক মনে করা, ত্যাগের মানসিকতা থাকা, পূতঃপবিত্র জীবন যাপন করা, পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, হাসি-তামাশা করা, উপঢৌকন বিনিময় করা, আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহার করা, স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন না করা, যৌতুক দাবি না করা, উভয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, একে অপরকে সদুপদেশ দেয়া, একে অন্যের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, উত্ত্যক্ত না করা, স্বামীর আদেশ মেনে চলা, সতীত্ব রক্ষা করা, স্বামীর আহ্বানে সাড়া দেয়া, শালীনতা রক্ষা করে চলা, স্বামীর বিনা অনুমতিতে অর্থ ব্যয় না করা ও গৃহ ত্যাগ না করা এবং সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা ইত্যাদি। এগুলো মেনে চললে স্বামী-স্ত্রী সকল প্রকার কলহ-বিবাদ থেকে মুক্ত থাকবে। আর তখন অসহায় অবস্থায় আর কোন শিশু থাকবে না।

গ. পরিবার থেকে পলায়ন : আমাদের দেশে অনেক শিশু আছে যারা পরিবার থেকে বাবা-মাকে না বলে বিভিন্ন কারণে পরিবার থেকে পালিয়ে শহরে চলে যায়। শহরে যেয়ে যখন কোন আশ্রয় খুঁজে না পায় তখন এ সব শিশুর আবাসস্থল হয় রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল, অফিস চত্বর, পার্ক, রাস্তার ধারে ও খোলা আকাশের নিচে।

ঘ. পারিবারিক দরিদ্রতার কারণে শিশুশ্রমে নিয়োগ : আমাদের দেশে অনেক পিতা-মাতা বাধ্য হয়ে তাদের শিশু সন্তানকে শিশুশ্রমে নিয়োগ করেন, অথচ তা সংবিধান সম্মত নয়। 'আমরা শিশু, আমাদেরও আছে অধিকার'। এ শ্লোগান আজ সবার। শিশুদের শিক্ষিত করতে হবে। শিশুদের উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। একদিকে এসব শ্লোগান সারা বিশ্বে ঝড় তুলছে, অন্যদিকে শিশুদের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন যেন নীরবে এর প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে যুগের পর যুগ। সকল প্রত্যাশাকে গুড়িয়ে দিয়ে কোমলমতি শিশুরা বরণ করে নিচ্ছে শিশুশ্রমের মত নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে। জীবনের শুরুতেই যখন শিক্ষার আলোর ছোঁয়া তারা পায় না, তখন উন্নয়নের ধারণা জীবন থেকে বিদায় নেয়। এরূপ বাস্তব চিত্রই এখন আমাদের চোখের সামনে ঘটছে।

শিশুরা যে শ্রম দেয় তাই-ই শিশুশ্রম। এখানে শ্রম কথাটাকে একটু বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। শ্রমকে তখনই শ্রম হিসেবে গণ্য করা হবে, যখন এই শ্রমের বিনিময়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আর্থিক সুবিধা অর্জিত হবে। আর শিশুরা যখন প্রত্যক্ষ বা

www.pathagar.com

পরোক্ষভাবে আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে শ্রম দিবে তখন তাকেই বলা হবে শিশুশ্রম। যদিও শিশুদের বয়-শ্রেণীভেদে সংজ্ঞায়িত করা শিশু ধারণাটি একটু অস্পষ্টই থেকেই গেল, তথাপি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সরকার কর্তৃক ঘোষিত ১৬ বছর পর্যন্ত বয়সের সবাইকে শিশু হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এই বিধান অনুযায়ী বয়সশ্রেণী উল্লেখ করে শিশুশ্রমের সংজ্ঞা দিতে গেলে বলতে হয় ১ থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শ্রেণীর মানুষ যখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে কাজ করে বা শ্রম দেয় তাকে শিশুশ্রম বলা যাবে।[১৩]

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম এদেশের শিশুশ্রম সম্পর্কে তাদের গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছে যে, তারা ৪৩০ ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে শ্রম বিক্রয় করে থাকে। তারা সাধারণত চাষের জমি কর্ষণ, ধান রোপণ, ধানক্ষেত থেকে আগাছা নির্মূলকরণ, ধান কাটা, ধান মাড়াই, পাট কাটা, পাটখোলা, পাট রোদে দেয়া, পাট বিক্রয়, আখের চারা রোপণ, আখ ক্ষেতের পরিচর্যা, আখ কাটা, আখ মাড়াই, ঝোলাগুড় বিক্রয়, শষ্যক্ষেত থেকে পাখি তাড়ানো, সব্জিআবাদ ও বিক্রয়, পান পাতা সংগ্রহ পান ও সুপারি সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিক্রয়, আম সংগ্রহ, লিচু সংগ্রহ, জুম চাষের প্রয়োজনে সম্ভাব্য ভূমি আগাছা মুক্তকরণ, ডাল-পালা ও শুকনো পাতায় অগ্নিসংযোগ, জুম ক্ষেতে বীজবপন ও পরবর্তী পরিচর্যা ও আগাছা মুক্তকরণের কাজ করে থাকে।[১৪]

এ ফোরাম বাংলাদেশের শিশু শ্রমকে নিম্ন বর্ণিত তিনটি পর্যায়ভুক্ত করে আলোচনা করেছে। (১) সাধারণ শিশুশ্রম, (২) ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম, (৩) নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

গবেষকদের মতে বাংলাদেশের শিশু শ্রমিকেরা যে সকল কাজে সম্পৃক্ত আছে তার মধ্যে কেমিক্যাল, গ্যাস কাটার, ওয়েলডিং মেশিন, হ্যাকস, আগুন ও ভারি যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজসহ প্রায় ৬৫টি হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এছাড়া তারা বহু নিকৃষ্ট ধরনের কাজও করে থাকে।[১৫]

৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিশুদেরকে বেতন, মুনাফা বা বিনাবেতনে কোন পারিবারিক খামার, কারখানা বা সংস্থায় কাজের জন্য নিয়োগ করা শিশুশ্রমের

---

১৩. *বাংলাদেশ গেজেট, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ (সংশোধন) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন,* ২০০৩, ধারা-৯; ১৯৬৫ সালের ৪নং আইন কারখানা আইন, ধারা ২(গ), শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ, ১৯২৩ আইনে ১৫ বছরের নিচের বয়স্ককে শিশু শ্রমিক বলা হয়েছে। অনুরূপ কারখানা বিধিমালা ১৯৭৯ শিশুশ্রমিক নিয়োগ আইন ১৯৩৮, শিশুশ্রমিক নিয়োগ বিধিমালা ১৯৫৫, শিশু (শ্রম বন্ধকী), আইন ১৯৩৩ প্রভৃতি।

১৪. *http://www.bsafchild.org/bsaf lab.php)*

১৫. আক্তার, রুনু, *ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ও শিশুশ্রমিক,* বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ), স্টেট অব চাইল্ড রাইটস ইন বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ৭৫

www.pathagar.com

আওতায় পড়ে। অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে বেশিরভাগ পরিবারকে তাদের সন্তানদের উপার্জনমূলক কাজে জড়িত করতে বাধ্য করে। ১৫ বছরের নিচে বিশ্বের প্রায় এক-দশমাংশ শিশু (১৫০ মিলিয়ন) বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত আছে। এর মধ্যে কিছু পেশা রয়েছে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। কর্মজীবী শিশুদের বেশির ভাগই চরম দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মধ্যে বড় হয় এবং বেঁচে থাকে। তারা উন্নত জীবনের জন্য শিক্ষাগ্রহণ ও দক্ষতা উন্নয়নের কোন সুযোগ পায় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গ্রেট ব্রিটেনে কারখানা চালু হলে সর্বপ্রথম শিশুশ্রম একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল ও মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে গৃহযুদ্ধের পর এবং দক্ষিণে ১৯১০ সালের পর শিশুশ্রম একটি স্বীকৃত সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। আগেরকার দিনে শিশুরা কারখানায় শিক্ষানবিশ অথবা পরিবারের চাকর হিসেবে কাজ করত। কিন্তু কারখানাগুলোতে তাদের নিয়োগ প্রকৃত অর্থে হয়ে দাঁড়ায় দাসত্ব। ব্রিটেনে ১৮০২ সালে এবং পরবর্তী বছরগুলোতে সংসদে গৃহীত আইন দ্বারা এ সমস্যার নিরসন হয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশে একই ধরনের আইন অনুসরণ করা হয়। যদিও ১৯৪০ সাল নাগাদ বেশির ভাগ ইউরোপীয় দেশে শিশুশ্রম আইন প্রণীত হয়ে যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উৎপাদন বৃদ্ধির আবশ্যকতা বহু শিশুকে আবার শ্রমবাজারে আনে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯০৮ এবং ১৯২২ সালে সুপ্রীমকোর্ট মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত শিশুশ্রম আইন অসাংবিধানিক ঘোষণা করে। ১৯২৪ সালে কংগ্রেসে একটি সংবিধান সংশোধনী পাশ করা হয়, কিন্তু সেটি অনেক অঙ্গরাজ্যেই অনুমোদন লাভ করেনি। ১৯৩৮ সালে প্রণীত প্রথম 'লেবার স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্টস' ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত পেশার জন্য ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর এবং সাধারণ নিয়োগের জন্য ১৬ বছর ধার্য করে।[১৬]

বাংলাদেশে শিশুশ্রম আইনে কারখানায় ১৪ বছরের কম বয়সের শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ।[১৭] তবে ৫ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের গৃহে, মাঠে এবং কারখানায় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অথবা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে দেখা যায়। বাংলাদেশে শিশুদের অধিকারের প্রতি যৎসামান্যই গুরুত্ব দেয়া হয়। শিশু অধিকারের অব্যাহত অপব্যবহার এবং লঙ্ঘন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘনবসতি, সীমিত সম্পদ এবং ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে এবং এ অবস্থায় শিশুরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিশুদের রক্ষা ও কল্যাণের জন্য প্রণীত আইন ও আইনগত বিধানগুলো হচ্ছে–

---

১৬. *কারখানা আইন*, ১৯৫৫, ধারা-২ (গ), ধারা ৫৬

১৭. *নিম্নতম মজুরি অধ্যাদেশ*, ১৯৬১ এবং ৩৯ নং অধ্যাদেশ

www.pathagar.com

ন্যূনতম মজুরি অধ্যাদেশ (১৯৬১) কিশোরসহ সকল শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম মজুরি প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে এবং নিয়োগকারী কর্তৃক কিশোর শ্রমিককে (১৮ বছরের নিচে) এই অধ্যাদেশের আওতায় গঠিত বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের কম মজুরি প্রদান বেআইনি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। দোকান ও স্থাপনা আইন (১৯৬৫) দোকানে বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ১২ বছরের কমবয়সী শিশুনিয়োগ নিষিদ্ধ। এই আইন ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তির জন্য শ্রমঘণ্টাও নির্ধারণ করে দিয়েছে।[১৮]

কারখানা আইন (১৯৬৫) ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ১৪ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিকে নিয়োগদান নিষিদ্ধ করেছে এবং শিশু ও কিশোরের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কাজের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রবিধান দিয়েছে। এছাড়া এই আইন কোন কারখানায় নারী শ্রমিকদের ৬ বছরের নিচে সন্তানদের লালন-পালনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির নির্দেশ দিয়েছে।[১৯]

শিশু আইন (১৯৭৪) এবং শিশু বিধি (১৯৭৬) সকল ধরনের আইনগত প্রক্রিয়াকালে শিশুর স্বার্থ রক্ষা করবে। এই আইনে আলাদা কিশোর আদালত গঠনের জন্য বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু অপরাধী যদি যৌথভাবে একই অপরাধ করে থাকে তাহলেও তাদের যৌথ বিচার অনুষ্ঠান করা যাবে না।[২০] খনি আইন (১৯২৩) ১৫ বছরের কম বয়সের কোন ব্যক্তিকে কোন খনিতে নিয়োগদান নিষিদ্ধ করেছে এবং ১৫ থেকে ১৭ বছরের যুবকদের নিয়োগ প্রদান নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। শিশু নিয়োগ আইনে (১৯৩৮) বলা হয়েছে যে, রেলওয়ের কয়েকটি কাজে শিশুদের নিয়োগ দেয়া যাবে না এবং রেলওয়ে কারে অথবা বাসে অথবা কোন বন্দরের অধীন এলাকায় শিশুরা কোন দ্রব্য বিক্রয় করতে পারবে না।[২১] শিশু (শ্রম অঙ্গীকার) আইনে (১৯৩৩) ১৫ বছরের কমবয়সী শিশুর শ্রম চুক্তির অঙ্গীকার অকার্যকর ঘোষণা করা হয়েছে।[২২]

বাংলাদেশের একটি সাধারণ দৃশ্য হচ্ছে, মেয়েশিশু অভ্যন্তরীণ 'মহিলা' অঙ্গনে আর বালকরা বাইরের 'পুরুষ' অঙ্গনে কাজে নিয়োজিত থাকে। এর ফলে বালিকাদের মধ্যে স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয়। শিশুদের শ্রমশক্তি অনেক পরিবারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের সাথে যে অর্থনৈতিক মূল্য জড়িয়ে আছে তাই জনগণকে বড় পরিবার গঠনে অনুপ্রাণিত করে। শিশুদের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ার প্রত্যাশার জন্ম হয় পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের সাথে সাংসারিক বোঝা ভাগাভাগি করে নেয়ার গভীর মনস্তাত্ত্বিক ধারণা থেকে। জীবনের শুরুতেই উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ শিশুদেরকে তাদের শিশুত্বের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য

---

১৮. *দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন*, ১৯৬৫ এর ৭নং ধারা

১৯. *কারখানা আইন*, ১৯৬৫

২০. *শিশু আইন ১৯৭৪ ও শিশুবিধি* ১৯৭৬

২১. *শিশু শ্রমিক নিয়োগ আইন* ১৯৩৮ এর ২৬ নং ধারা ও শিশুশ্রমিক নিয়োগ বিধিমালা ১৯৫৫

২২. *শিশু (শ্রম বন্ধকী) আইন*, ১৯১৩

www.pathagar.com

দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রথম পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা অর্জনে বাধ্য করে। এই পরিবর্তন শিশুর উৎপাদন জীবনচক্র' অনুধাবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় ধরনের খাতেই নিয়োগ দেয়া হয়। সংগঠিত খাতে শিশুরা আইন দ্বারা প্রতিরক্ষা পায়, কিন্তু অসংগঠিত খাতে তারা এতটা সৌভাগ্যবান নয়। সেখানকার কাজের পরিবেশ অত্যন্ত নিম্নমানের। বাংলাদেশের আনুমানিক ২১.২% পরিবারে ৫-১৪ বছরের কর্মজীবী শিশু রয়েছে। এই সংখ্যা শহুরে পরিবারগুলোর জন্য ১৬.৮% এবং গ্রামীণ পরিবারের জন্য ২২.৫%। কর্মজীবী শিশু পরিবারের ৫৬.৪ শতাংশ পরিবার-প্রধান নিরক্ষর, ২৪.৬% প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত, ১১.৩%-এর নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা আছে, ৫% এসএসসি/ এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস করেছে এবং মাত্র ২.৭% উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। এক হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ৫-১৪ বছর বয়সী মোট শিশু জনসংখ্যার ১৯%, ছেলেশিশুদের ক্ষেত্রে এই হার ২১.৯% এবং মেয়েশিশুদের ক্ষেত্রে তা ১৬.১%। অর্থনীতির খাত অনুযায়ী শিশুশ্রমিকদের বণ্টনের চিত্র হচ্ছে: কৃষি ৩৫%, শিল্প ৮%, পরিবহন ২%, অন্যান্য সেবা ১০% এবং গার্হস্থ্যকর্ম ১৫%। তবে শিশুশ্রম নিয়োগের প্রায় ৯৫%-ই ঘটে অনানুষ্ঠানিক খাতে। এদের জন্য সাপ্তাহিক গড় কর্মঘণ্টা আনুমানিক ৪৫ এবং মাসিক বেতন ৫০০ টাকার নিচে। মেয়েশিশু শ্রমিকের মাসিক বেতন ছেলেশিশু শ্রমিকের তুলনায় গড়ে প্রায় ১০০ টাকা কম। আমাদের দেশে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে শিশুদের উপর শিশুশ্রমের নামে অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়।[২৩] এমনকি অনেক মেয়েশিশুকেও রাস্তায় ও ইটের ভাটায় ইট ভাঙ্গতে দেখা যায়।[২৪]

---

২৩. একটি পত্রিকার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৮৯ সালের ১০ নভেম্বর জাতিসংঘে গৃহীত শিশু অধিকার সনদের ৫৪ টি ধারার মধ্যে ৪১টি ধারাই শিশু অধিকার সম্পর্কিত। অথচ জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত রাষ্ট্র বাংলাদেশেই মোস্তাকিনা (১০), শিরিন (১৪), হাসনাহেনা (১৩) বানু (১৫), নুপুর (১০), পুতুল (১১) ও ইয়াসমিন (৮) এর মত নিষ্পাপ ফুলের মতো প্রাণগুলোর (পরিচারিকা) ওপর সামান্যতম শিশুসুলভ বা গুরুত্বহীন ছোট ছোট অপরাধের জন্যও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল-এর ডাক্তার (মার্চ ২০০৪), শাহজাহানপুর রেলওয়ে অফিসার্স কোয়ার্টারের উপ-সচিবের স্ত্রী ও কলেজের অধ্যাপিকা (ঢাকা) এবং রাজশাহীর গৃহকর্ত্রী ডাইনীর মত নির্যাতন চালাতো। ওই শিশু পরিচারিকাদেরকে তারা ইলেকট্রিক হিট দিত। মলমূত্র খাওয়াত, লোহার খুন্তি গরম করে গুপ্তাঙ্গে ঢুকিয়ে দিত। পিঠে হাতে গরম লোহার ছ্যাঁকা দিত, গলা টিপে ধরত, কিল-ঘুষি মারত, হাতুড়ি দিয়ে আক্রমণ করত, নোংরা গালিগালাজ করত। তারাই খুলনার পুতুলকে প্রহার করতে করতে মেরেই ফেলেছে, তারাই রাজশাহীর শিরিনকে হত্যা করেছে (মার্চ ২০০৪)। সংবাদ মাধ্যমগুলোতেও বেশ প্রচারিত হয়েছে কিন্তু এ সব নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা দিন দিন বাড়ছে বৈ কমছে না। এ প্রসঙ্গে সুহৃদ 'চতুরঙ্গ' সামাজিক সন্ত্রাসের অংশ হিসেবে তুলে ধরেছেন। *দৈনিক ইত্তেফাক* ১৫ সেপ্টেম্বর,২০০৪

২৪. পারভীন দশ বছরের এক কিশোরী। সারাদিন ইট ভাঙতে ভাঙতে হাতে ফোসকা পড়ে গেছে। সকাল ১১ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কাজ করলে পায় ২৪ থেকে ২৫টাকা। প্রতি ফুট ৬ টাকা করে। সারাদিনে সে ৩-৪ ফুট ইট ভাঙতে পারে। কিন্তু পারভীন স্বপ্ন দেখে একদিন

www.pathagar.com

এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ৯৫% কাজে নিয়োজিত শিশুরা (বাসা বাড়িতে) ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত ৯-১০টা পর্যন্ত কাজ করে। তাদের বিশ্রাম/ অবসরকাল দুঃখজনক। তাই একদিন শিশুশ্রমিকটি ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি করলে গৃহকর্ত্রী তাকে ঘুমন্ত অবস্থায়ই মারতে মারতে মেরেই ফেলে (১৫সেপ্টেম্বর ইত্তেফাক)। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশলীর বাসার ঘটনা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশলীর বাসার কাজের মেয়ে নূর বানুকে (ওরফে লাল বানু) ধর্ষণ ও শ্বাসরোধ করে হত্যার পর পেট চিরে ও চোখ উৎপাটন করে আগুনে পোড়ানো হয়।[২৫]

সুবিধাবঞ্চিত এসব ছেলে-মেয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি। তারা সুযোগ পেলে স্কুলে যেতে চায়। শুধু বাঁচার জন্য ছোটোখাটো ছেলেমেয়েরা ইট ভাঙার মত অত্যন্ত কষ্টের ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে। কিন্তু তাদেরও আছে অধিকার লেখাপড়া শেখার, আনন্দময় শৈশবের। একটু উন্নত পরিবেশে ভালভাবে বাঁচার। তাদের এ অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব সম্পর্কে সমাজ ও রাষ্ট্রকে সচেতন হতে হবে।

ঙ. শিশু অপহরণ ও পাচার : নারী ও শিশু পাচারের মত জঘন্য অপরাধের প্রবণতা আগেও ছিল, বর্তমানেও আছে। যেমন– কুরআনে এসেছে ইউসুফ (আ)-কে খ্রিষ্টপূর্ব কয়েক বছর পূর্বে একদল ব্যবসায়ী কূপ থেকে তুলে মিসরে নিয়ে যায় এবং বিক্রি করে দেয়।[২৬] ইসলাম পূর্ব জাহিলীযুগে আরবেও শিশু পাচারের ঘটনা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ যায়িদ ইবনে হারিছার ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি পাচার হয়ে দাস

বিউটিশিয়ান হবে। নিজের দোকান হবে। আর ইট ভাঙতে হবে না। সারাদিন সে মেয়েদেরকে সাজিয়ে সুন্দর করে দেয়ার কাজ করবে। আর তাই ইট ভাংতে যাওয়ার আগে সকালে সে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে যায়। বার বছর বয়সের মোর্শেদা। বাবা দিনমজুর। অভাবের সংসারে খুব ছোট থেকেই ইট ভাঙার কাজ শুরু করে। স্কুলে ভর্তি না হওয়ার কারণ হিসেবে বলে রোজগার করে সংসার চালাতে হয় তাই আমারে স্কুলে ভর্তি করায়নি। প্রতিদিন ২০-২৫ টাকা পায়। তাই মার হাতে তুলে দেয়। তবে সে স্বপ্ন দেখে একদিন চাকরি করবে। কি চাকরি? "বিউটি পার্লারে কাজ করমু। মাইয়াগো সুন্দর করার কাজ। শিখতাছি। যাতে আমার পরে ইট ভাঙতে না হয়। ইট ভাঙা খুব কষ্টের কাজ। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ জানুয়ারি, ২০০৩

অপর একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে যে, সাগরের বয়স ১৩ কি ১৪ হবে। ক্যামেরা কাঁধে ঘুরঘুর করছে। তুমি কি ফটোগ্রাফার? প্রশ্ন করতেই বললো, হ্যাঁ, আমি মানুষের ছবি তুলে দেই। একটা ছবিতে ১৫ টাকা পাই। তবে ভবিষ্যতে আমি বড় ফটোগ্রাফার হব। একটা স্টুডিও দেব। সাগর জানায়, সে ইট ভাঙার কাজ করত। বিজ্ঞান ও গণশিক্ষা কেন্দ্রে সে ভর্তি হয়ে ফটোগ্রাফী শিখেছে।এখন ইট ভাঙা ছেড়ে দিয়েছে। ছবি তোলার পাশাপাশি একটা গার্মেন্টসে সুতা কাটার কাজ নিয়েছে। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৪)

২৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৪

২৬. আল-কুরআন, ১২ : ১৯-২০, وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ – وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

www.pathagar.com

জীবন যাপন করেন। পরে রসূলুল্লাহ স. তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন।[২৭] অবশ্য শিল্প বিপ্লবের পর এর বিস্তার এত বেশি হয়েছে যে, তা সামাল দেয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। বর্তমান যুগে অর্থ উপার্জনের সহজ মাধ্যম হিসেবে একটি দেশী-বিদেশী দুষ্টচক্র লোক পাচার করার কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

'পাচার' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Trafficking, Kidnapping, Smuggling.[২৮] শব্দটির প্রচলিত অর্থ হচ্ছে, অন্যায় ও অবৈধ উপায়ে কোন জিনিস যথাযথ স্থান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া। যেমন– আমরা অনেক সময় বলি, ঘর থেকে ঘড়িটি পাচার হয়ে গেছে অর্থাৎ কেউ ঘড়িটিকে অন্যত্র নিয়ে গেছে। আবার বলি, বাংলাদেশ থেকে জ্বালানি তেল পাচার হচ্ছে অর্থাৎ অবৈধ পদ্ধতিতে দেশ থেকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও শব্দটি ক্রয়-বিক্রয় করা, স্থানান্তর, মানুষ সংগ্রহ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২৯]

আইএলও (ILO) মনে করে, গত ২০ বছরে বাংলাদেশ থেকে দুই লাখ নারী ও শিশু বিদেশে পাচার হয়েছে। প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৩৫০ জনকে পাচার করা হয়। আইএলও (ILO) সূত্রে আরো জানা যায়, প্রতি বছর শিশু কেনাবেচা, পাচার ও হস্তান্তরে সাত বিলিয়ন ডলার লেনদেন হয়। উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে ধারণা করা যায়, বাংলাদেশ থেকে বছরে পাঁচ হাজার নারী ও শিশু বিদেশে পাচার হয়ে থাকে। বর্তমানে এ সংখ্যা কমলেও তা শ'-এর ঘরে নামেনি। এখনো হাজারের ঘরেই আছে। আর বাংলাদেশ থেকে মানুষ পাচারের যে ঘটনা ঘটছে, তার ৮০ শতাংশই শিশু।[৩০]

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, দেশের মোট জনসংখ্যার ১৬ কোটির মধ্যে ৪ কোটি ২৪ লাখই শিশু। তাই শিশুদের পাচাররোধে আমাদের বিশেষ ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। "বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে তুলে বাংলাদেশের শিশুদের সুরক্ষায় এগিয়ে আসা প্রয়োজন" আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইস এক প্রতিবেদনে বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় নারী ও শিশু পাচারের রুট হিসেবে ভারত ব্যবহার করছে। বাংলাদেশের মেয়েশিশুদের পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে বিদেশে পাচার করা হচ্ছে। উপসাগরীয় অঞ্চলের

---

২৭. আল-আসকালানী, ইবনে হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত্ তুরাসিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি. পৃ. ২৩৪-২৩৫; ইবনে কাসীর, *আলবিদায়াহ ওয়ানিহায়াহ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি., পৃ. ২০৩-২০৪

২৮. *Bagla English Dictionary*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৫, পৃ. ৪১৮

২৯. *The SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prpstitution.* Articles-1. Definitions, p.1-5

৩০. *দৈনিক যায়যায়দিন*, ১০ জানুয়ারি, ২০০৭

www.pathagar.com

দেশগুলোতেও উটের জকি করার জন্য বাংলাদেশের শিশু পাচার অব্যাহত আছে। এমন কঠিন বাস্তবতার মধ্যে আমাদের সবাইকে সম্মিলিতভাবে শিশু পাচার প্রতিরোধে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অসহায় শিশুর নিরাপত্তা আইন

অসহায় শিশুদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের কোন নিশ্চয়তা নেই। পথে পথেই তাদের বসবাস। যেখানেই রাত হয় তারা সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ে। বাজার, রেল স্টেশন, বাস স্টেশন, লঞ্চঘাটের মত ব্যস্ত স্থানের পাশাপাশি বিভিন্ন পার্ক, পতিত বাড়ির বারান্দা, মাজার এলাকা হয়ে ওঠে তাদের আশ্রয়স্থল। আবার কেউ থাকে খোলা আকাশের নীচে সড়ক ও ফুটপাতগুলোতে। কেউ থাকে বিভিন্ন এলাকায় গড়ে ওঠা বস্তিতে। ঘরের বাইরে অভিভাবকহীন এমন আশ্রয় স্বাভাবিকভাবে নিরাপত্তাহীন। চিকিৎসা সুবিধার ক্ষেত্রে পথশিশুরা চরমভাবে বঞ্চিত। তাদের নানা রকম অপরাধ, অস্ত্রবহন, যৌন কাজে ব্যবহার করাসহ পাচার হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। ভয় থাকে কিডনি, চোখ বিক্রি হয়ে যাওয়ার। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্থানের অপরাধীচক্র তাদের জন্য হুমকি হিসেবে কাজ করে। মেয়ে পথশিশুদের অবস্থা আরো নাজুক। তাদের নিরাপত্তা আরো ঝুঁকিপূর্ণ। নিম্নে অসহায় শিশুর নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১. পথ শিশুর নিরাপত্তা আইন

বাংলাদেশের পথশিশুদের সঠিক সংখ্যা অজ্ঞাত। কিন্তু বিভিন্ন সংস্থা এদের নিয়ে কাজ করছে। বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজ সেবা অধিদপ্তরের ২০০১ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, দেশে ছয়টি বিভাগীয় শহরে সারে চার লাখ পথশিশু রয়েছে। এরাইজ প্রকল্পের অধীনে ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পরিচালিত এক জরিপ প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশে ১৮ বছরের নিচে প্রায় পঞ্চান্ন মিলিয়ন শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে পথশিশুর সংখ্যা প্রায় চার লাখ পয়তাল্লিশ হাজার দুইশত ছাব্বিশ জন। যার শতকরা ৭৫ ভাগ রাজধানী, ৯.৯ ভাগ চট্রগ্রাম বিভাগে, ২.৪ ভাগ রাজশাহীতে, ৮.৫ ভাগ খুলনায়, ২.৬ ভাগ বরিশালে ও ১.৫ ভাগ সিলেট বিভাগে বসবাস করে। পথশিশুদের মাঝে শতকরা ৪৩ ভাগ ছেলে এবং ৪৭ ভাগ মেয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ ইনিস্টটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এর ২০০৫ সালের এক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে সে সময় পাঁচ লাখ পঁচিশ হাজার পথশিশু ছিল। বর্তমানে তাদের সংখ্যা আরো বেশি।[৩১]

---

৩১. *স্টেট অব চাইল্ড রাইটস ইন বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬

www.pathagar.com

বাংলাদেশে শিশু নীতি ও শিশু আইন যা আছে তা শিশু রক্ষার অনুকূল বলেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বাংলাদেশে বিরাজমান বাস্তব অর্থনৈতিক ও আন্তরিক উদ্যোগের অভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে পারিবারিক পরিবেশ বঞ্চিত পথশিশুদের লালন-পালনের এবং সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। যে সকল শিশুর কোন গৃহ বা নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান নেই অথবা নিয়মিত ও যথাযথভাবে তত্ত্বাবধানের জন্য পিতা-মাতা বা অভিভাবক নেই কিংবা যে সকল শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবক কারাদণ্ড ভোগ করছেন অথবা অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকলেও অবহেলা বা নিষ্ঠুর ব্যবহারের শিকার এমন প্রকৃতির শিশুদেরকে ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের ৩২ ধারা অনুসারে শিশু আদালতের আদেশসাপেক্ষে কোন অনুমোদিত আবাসে বা শিশুর কোন আত্মীয়ের নিকট শিশুটির বয়স ১৮ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তত্ত্বাবধানের জন্য প্রেরণের বিধান রয়েছে। এছাড়াও আদালত ইচ্ছা করলে শিশুর আত্মীয় নয় কিন্তু সংক্ষিপ্ত এ সময়ের জন্য শিশুকে তত্ত্বাবধান করতে ইচ্ছুক অন্য কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করতে পারেন। কিন্তু বিদ্যমান এই নীতি ও আইন থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ পথশিশুর নিরাপত্তা জীবন মান, অপরাধ জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ততা এক ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে, যার প্রামাণিক কিছু খণ্ডচিত্র এখানে তুলে ধরা হলো–

দেশে সাত লক্ষ পথশিশু যাদের টোকাই নামে ডাকা হয়, তারা জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে। যে পরিবেশে তারা বড় হচ্ছে তাতে বড় হয়ে সন্ত্রাসী হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। অধিকাংশ টোকাই মাদকদ্রব্য বহন করে। অনেকে আসক্ত হয়ে পড়ছে 'চাক্কি' নামের এক ধরনের নেশার উপকরণে। কর্মজীবী টোকাইদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে পুলিশ ও এলাকার মাস্তানরা। মেয়ে টোকাইরা যৌন হয়রানির শিকার হয় মাস্তান, পুলিশ এবং রাস্তায় বসবাস করা বড়দের দ্বারা। হরতালের আগে ও পরে পুলিশ এদের গণহারে গ্রেফতার করে জেলখানা পাঠায়। জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তারা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএম)-এর জরিপ থেকে এই তথ্য জানা যায়।[৩২]

---

৩২. গৃহহীন শিশুদের অপর এই জরিপটি চালান হয় জুলাই থেকে আগস্ট (২০০৪) মাস পর্যন্ত। জরিপে দেখা গেছে, বেশিরভাগ টোকাই বা পথশিশু এসেছে গ্রাম থেকে। মা-বাবার বিচ্ছেদে, মা অথবা বাবার পুনরায় বিবাহ, সৎ পিতা কিংবা মার অত্যাচার, অভাব-অনটন, অভিভাবকদের উদাসিনতা তাদের ঘর ছাড়তে বাধ্য করে। দিন মজুরি, ফুল বিক্রি, ময়লা-আবর্জনা ঘেটে কাগজ, লোহা, প্লাস্টিকের বোতল ও ক্যান কুড়ান, চা-সিগারেট-বাদাম বিক্রি করে এরা বেঁচে থাকে। অনেক তরুণ-কিশোরী পথশিশু পাচারকারীদের খপ্পরে পরে পাচার হয়ে যায়। অনেকে ভিক্ষা করে। এদের উপর অত্যাচার চালায় পুলিশ, মাস্তান এবং বয়সে বড় ভবঘুরেরা। 'মাদকসক্তি নিরাময় কেন্দ্র শক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রের এক কর্মকর্তা জরিপকারীদের জানিয়েছেন, যেসব পথশিশু টোকাই দিনমজুরি করে, তারা শক্তি অর্জনের জন্য 'চাক্কি' নামের এক ধরনের

www.pathagar.com

জরিপটিতে দেখা গেছে, পথশিশুরা প্রেমও করে। অপ্রাপ্তবয়স্ক এসব প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেম চিরদিন টিকিয়ে রাখার জন্য রক্তশপথ নেয়। এই রক্তশপথ হচ্ছে, হাতের আঙুল কেটে রক্ত বের করে সেই রক্ত অদল-বদল করা। তারা বিশ্বাস করে, এতে তাদের সম্পর্ক সারা জীবন টিকে থাকবে। পথশিশুদের পুনর্বাসনের জন্য নেয়া সরকারী প্রকল্পের কর্মকর্তা জরিপকারীদের জানিয়েছেন, এসব পথশিশুর কম অংশই বাড়িতে ফিরে যায়। যারা ফিরে যায়, তারা বাড়ির পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে আবার ফিরে আসে। মেয়েদের ক্ষেত্রে অবস্থাটি আরও খারাপ। সমাজের ভয়ে ফিরে যাওয়া মেয়েকে তাদের অভিভাবকরা গ্রহণ করতে চায় না, ঘরে রাখতে চায় না। কারণ সমাজ এই মেয়েদের ভালো চোখে দেখে না। ফলে তাদের পুনরায় ফিরে আসতে হয় পথের অন্ধকারময় জীবনে। জাতিসংঘের অফিস 'ফর ড্রাগ অ্যান্ড ক্রাইম'-এর টেকনিক্যাল সাইন্টিফিক কনসালটেন্ট ড. শামীম মতিন চৌধুরী জরিপটিতে তার মতামতে বলেছেন, বাংলাদেশের গৃহহীন পথশিশুদের অবস্থা খুবই খারাপ। প্রতিদিন এই অবস্থার আরও অবনতি হচ্ছে। এখন যা করা দরকার তা হচ্ছে, শিশুরা যাতে তাদের বাড়ি-ঘর না ছাড়ে তার জন্য কার্যকর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া। যারা পথশিশু হয়ে পড়েছে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা জরুরি। এদের পুনর্বাসন করতে হবে তাদের বাড়ি-ঘরে।[৩৩]

আরো একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশে প্রতিবছরই বিভিন্নভাবে শত শত শিশু হারিয়ে যায় অথবা মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। বিএসএএফ (বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম) রিসোর্স সেন্টারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০২ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ– এই তিন মাসে ২২৩ জন এবং ২০০২ এর জুলাই থেকে ২০০৩ এর আগস্ট পর্যন্ত ৯৫১ জন শিশু হারিয়েছে। এভাবেই প্রতিবছর গড়ে

মাদক সেবন করে। এই মাদকটি চোরাই পথে ভারত থেকে আসে। অনেকে ঘুমের বড়ি, ফেনসিডিল, হাসিস, হেরোইন বহন করে। এলাকার মাস্তানরা এগুলো বহন করতে তাদের বাধ্য করে। মামাদের জন্য তারা এসব নেশার সামগ্রী স্পট থেকে কিনে আনতে বাধ্য করে। অনেকে এগুলোতে আসক্ত। মাদক বহন করার বিনিময়ে দেয়া হয় ১০/১৫ টাকা, কিংবা নেশা করার জন্য 'চাক্কি'। যারা নেশা করে তারা নেশার টাকা জোগাড় করতে পকেটমার, চুরি করা, ভিক্ষা করাসহ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। অপরাজেয় বাংলা নামের একটি এনজিওর এক প্রাক্তন কর্মকর্তা জরিপকারীদের জানিয়েছেন, পথশিশুদের মধ্যে বালিকারা পুলিশ, মাস্তান, এমনকি বয়সে বড় ভবঘুরেদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বালকরাও এই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। পুলিশ এদেরকে ধরে কখনও কোন ভবঘুরে কেন্দ্রে পাঠায়। ভবঘুরে কেন্দ্রের কর্মচারীরাও মেয়েদেরকে যৌন নির্যাতন চালায়। এর প্রমাণ মিলে ধর্ষণের দ্বারা ভবঘুরে কেন্দ্রের কয়েকজন কর্মচারী উপর বরখাস্ত করার ঘটনা থেকে। এছাড়া পুলিশ পথশিশুদের নাম-ঠিকানা বদলিয়ে বিভিন্ন অপরাধমূলক মামলায় জড়িয়ে জেলে পাঠায়। –(*স্টেট অব চাইল্ড রাইটস ইন বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫-৩৬)

৩৩. রহমান, নূরুর, *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২৮ নভেম্বর, ২০০৪, পৃ. ১৫-১৬

www.pathagar.com

হাজারেরও বেশি শিশু হারিয়ে যাচ্ছে। তবে দারিদ্র্যের কারণেই মূলত এসব শিশু তাদের মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্য তাদের মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি মা-বাবার স্নেহ-ভালবাসা থেকেও বঞ্চিত করছে। সরকারী একটি জরিপে দেখা যায়, দেশে প্রায় ৪,৪৫,২০০ পথশিশু আছে, এর মধ্যে ঢাকা বিভাগেই রয়েছে ৩,৩৮,৮০৭ জন। অর্থাৎ মোট পথশিশুর ৭৫ ভাগই রয়েছে ঢাকা বিভাগে। এছাড়া, চট্টগ্রাম বিভাগে আছে ৯.৯ শতাংশ, রাজশাহী বিভাগে আছে ২.৪ শতাংশ, খুলনা বিভাগে ৮.৫ শতাংশ, বরিশাল বিভাগে আছে ২.৬ শতাংশ, সিলেট বিভাগে ১.৪ শতাংশ। এদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিপুল সংখ্যক পথশিশু দারিদ্র্যের শিকার। বেঁচে থাকার জন্য এরা শিশু বয়সে কঠোর পরিশ্রমের পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে।[৩৪] আমাদের দেশের বিভিন্ন পত্রিকার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারব যে, পথশিশুরা কীভাবে জীবনযাপন করছে। আর আমরা তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করছি।[৩৫]

---

৩৪. খান শামীম, *লাখ লাখ পথশিশু বঞ্চনার শিকার*, দৈনিক ইনকিলাব, ৩০ জুন, ২০০৪

৩৫. *দৈনিক যায়যায় দিন* পত্রিকার একটি প্রকাশিত সংবাদ : আল-আমীন নামের একজন পথশিশু সারা দিন পথে কাজ করে, রাতে ঘুমায় রাজধানীর কাওরান বাজারে অবস্থিত পদক্ষেপে দিবারাত্রি আশ্রয় কেন্দ্রে। সেখানে তার মত আরো ৩০ পথশিশু থাকে। অন্যান্য দিনের মত রবিবারও সারা দিন কাজ শেষে আশ্রয় কেন্দ্রে ফিরে যাওয়াই ছিল তার ইচ্ছা। কিন্তু রাত বেশি হয়ে যাওয়ায় ঠিক করল ফুটপাথেই ঘুমাবে। এইচআরসি ভবনের নিচে রাস্তার পাশের ফুটপাথে একটা ভ্যান-গাড়িতে সে ঘুমাচ্ছিল। ঘুমের ঘোরে ভ্যান থেকে পড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ একটি বাস এসে চলে যায় তার পায়ের ওপর দিয়ে। এতে তার বাম পা গুড়ো হয়ে যায়। এটা রাত ১১টার ঘটনা। তার চিৎকার শুনে একজন পথচারী তাকে নিয়ে যায় পঙ্গু হসপিটালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে রিলিজ করে দেয়া হয় এবং সাতদিন পর আসতে বলা হয়। আল-আমিন বলে, হাসপাতালের এক খালারে (আয়া) গিয়া কইলাম- আমি কাওরান বাজার জামু, একটা রিকশা কইরা দেন। হ্যায় রিকশায় তুইলা দিলে আমি আশ্রয় কেন্দ্রে আইসা পড়ি। সকালে সেন্টারের ইনচার্জ সামিয়া সুলতানা ঘটনা জেনে সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত অ্যারাইজ প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যদের ঘটনাটি জানান। তারা গতকাল সারা দিন চেষ্টা তদবির করে অবশেষে আল আমিনকে আবার পঙ্গু হসপিটালে ভর্তি করাতে সক্ষম হন। সামিয়া সুলতানা যায়যায়দিনকে বলেন, আল-আমীন একজন পথশিশু-এটাই তার অপরাধ। সরকারি হসপিটালগুলো এসব পথশিশুর চিকিৎসা করতে নারাজ। যার ফলে কোন মতে একটি রাত রেখেই সিট নেই অজুহাতে ওকে রিলিজ করে দেয়। তার এক্স-এর কপিটাও সঙ্গে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি তারা। তিনি জানান, ২০০৫ সালের জুলাই মাসে সুমন নামে এক পথশিশুকে চিকিৎসার জন্য এ হসপিটালে নেয়া হলে তখনো একই আচরণ করেন ডাক্তাররা। তাকে জোর করে রিলিজ করে দেয়া হয়। পরে তার আঘাতের স্থানে ইনফেকশন হয়। অভিযোগ রয়েছে, এসব সুবিধাবঞ্চিত শিশু সরকারি হসপিটালে সুচিকিৎসা পায় না। কর্তৃপক্ষ জোর করে আয়া ডেকে তাদের ট্রলিতে তুলে দিয়ে রাস্তায় ফেলে আসে। পথশিশুদের নিয়ে কাজ করে এ রকম একটি প্রতিষ্ঠান ইনসিডিট বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক মাসুম আহমেদ এবং আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার সঙ্গে চিকিৎসার জন্য প্রতিটি হসপিটালে অন্তত পাঁচটি সিট বরাদ্দ রাখার দাবি জানান। (*দৈনিক যায়যায়দিন*, ১০ মার্চ, ২০০৬)

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত এসব লাখ লাখ শিশু নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে কিছু ভাবতে পারে না। শুধু পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য ফুল, পানি, পুঁতির মালা, চকলেট প্রভৃতি বিক্রি করে। হোটেল, বাসাবাড়ি, ওয়ার্কশপে কাজ করে। কাগজ কুড়ায়, ভিক্ষা করে, মেয়ে শিশুরা রাস্তায় থাকার কারণে প্রথমে ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরে জীবিকা অর্জনের জন্য কোন উপায় না পেয়ে দেহ বিক্রির কাজে জড়িয়ে পড়ে। নিরাপত্তাহীনতা, শারীরিক ও মানসিক আঘাত, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চনা তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কঠোর পরিশ্রমের পরও এদের পেট ভরে খাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে না। এ পথশিশুদের কাজের কোন নিশ্চয়তা নেই। যখন-তখন এদের কাজ থেকে বাদ দেয়া হয়। শ্রমের বিনিময়ে এরা যে আয় করে তা দিয়ে তিন বেলা খাওয়া তো দূরের কথা, অনেক সময় একবেলাও পেটভরে খেতে পারে না। এসব পথশিশুর ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. খন্দকার মোকাদ্দেম হোসেনের মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, এরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদের সমস্ত দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। পুনর্বাসনের কর্মসূচির অধীনে এনে খাদ্য, বাসস্থান, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রভৃতির সংস্থান করতে হবে। এরপর প্রশিক্ষণমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে– যাতে তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য স্বাবলম্বী হতে পারে। প্রথম কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব শিশুর জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে। যেহেতু দারিদ্র্যের কারণে এ সমস্যা হচ্ছে, সেহেতু গ্রামে বয়স্ক দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে দরিদ্র পরিবারের শিশুরা গ্রাম ছেড়ে শহরে বা অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য না হয়। রাষ্ট্রের পাশাপাশি বেসরকারি সাহায্য সংস্থা এবং ব্যক্তি উদ্যোগেও এ হতভাগ্য শিশুদের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা ও সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তবে রাষ্ট্রের কাছে এনজিওর আর্থিক জবাবদিহিতা অবশ্য থাকতে হবে–যাতে এই শিশুদের জন্য সংগৃহিত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় হয়।

ইসলাম এসব শিশুর প্রতি সব রকম সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য সরকার ও ব্যক্তির প্রতি খুবই তাকিদ করেছে। সমাজে যাতে এসব শিশু প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে ব্যবস্থা করার জন্য ইসলাম যাকাতের একটি খাতকে নির্ধারিত করে রেখেছে। ইবনুস সাবিল বা পথশিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন ও নিরাপত্তায় তা ব্যয় করতে হবে। তাই সকলকে এই পথশিশুদের প্রতি সদয় হতে হবে এবং এদের নিরাপত্তা ও জীবিকার ব্যবস্থা করা ভরণপোষণের যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত প্রদেয় রাষ্ট্র ও সমাজের হবে।

www.pathagar.com

প্রায় দেড় কোটি মানুষের ঢাকা শহরে পথশিশুর সংখ্যাই প্রায় তিন লাখ ৯০ হাজার। প্রতি বছর পথশিশুর সংখ্যা বাড়ছে ৫০ হাজার। এ সংখ্যা উদ্বেগজনক। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে মোট পথশিশুর সংখ্যা পাঁচ লাখেরও বেশি। 'ওয়ার্ল্ডভিশন' পথশিশু প্রকল্প এবং 'অবসর প্রাপ্ত পুলিশ কল্যাণ সমিতি'র উদ্যোগে যৌথভাবে আয়োজিত 'শিশু অধিকার ও শিশু রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনারে এসব তথ্য উঠে এসেছে। বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশে দারিদ্র্য ও সামাজিক অস্থিরতা পথশিশুদের জীবন অনিশ্চিত করে তোলে। এরা অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়, শারীরিকভাবে দুর্বল, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনায় পথশিশুদের অনেকে সামাজিক অপকর্ম ও অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। শিশু অধিকার রক্ষায় দেশে আইন থাকলেও তা সর্বতোভাবে কার্যকর হচ্ছে না। অভিযোগ রয়েছে, পথশিশুরা পুলিশি হেফাজতে সবচেয়ে বেশি হয়রানির শিকার হয়। অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বয়সী শিশুদের জামিন প্রদানের ক্ষমতা দেয়া আছে পুলিশের হাতে; কিন্তু পুলিশ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জামিন না দিয়ে তাদের আদালতে সোপর্দ করে। এ বিষয়ে পুলিশ সদস্যদের দায়িত্ব সচেতন করার বিকল্প নেই। অভিভাবকহীন এই শিশুদের বিনা মূল্যে আইনি সেবা পাওয়ার কথা। কিন্তু তার প্রয়োগ নেই বললেই চলে। সম্প্রতি শিশু অধিকারের বিষয়টি পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিশুদের প্রতি পুলিশ সদস্যদের আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। পুলিশ সদস্যদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে তারা শিশুদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার সময় সতর্ক থাকে।

বাংলাদেশের আরো একটি জাতীয় দৈনিকে পথশিশুদের উদ্বেগজনক অবস্থা তুলে ধরে বলা হয়, ওরা পথশিশু, ছিন্নমূল, টোকাই ইত্যাদি অভিধায় চিহ্নিত। অভিভাবকহীন এসব শিশু, কিশোররা শহর, নগর বন্দরে ছড়িয়ে আছে। চালচুলোহীন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এ অংশটি অকালে ঝরে যাচ্ছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন তো দূরের কথা, এক মুঠো অন্নের যোগান করতেই তাদের ২৪ ঘন্টা কেটে যায়। অমানুষিক কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ওরা কোনমতে দিন গুজরান করছে। যে মুহূর্তে এসব শিশুর বই খাতা নিয়ে স্কুলে যাবার কথা, সেই বয়সে তাদেরকে পেটের তাগিদে শ্রম বিক্রি করতে হচ্ছে। ২০০১ সালের সমাজসেবা অধিদফতরের জরিপে বলা হয়, দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরে পথশিশু রয়েছে ৪লাখ ৪৫হাজার ২২৬টি। এর মধ্যে রাজধানী শহরেই ৭৫ শতাংশের অবস্থান। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউশন অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)-এর ২০০৫ সালের এক গবেষণায় বলা হয়, বর্তমানে দেশে ৫ লাখ ২৫ হাজার পথশিশু রয়েছে। দেশের মোট শিশুর এ বিরাট অংশ নানা বৈষম্যের শিকার। পেটে ভাত নেই, পরনে বস্ত্র নেই, বাসস্থানের ঠিকানা নেই, জীবনের নিরাপত্তা নেই, আগামীকালের কোন সম্পদ নেই তাদের। নিঃস্ব, অসহায়,

www.pathagar.com

হতদরিদ্র অবস্থায় নানা প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করে তাদের বেঁচে থাকতে হচ্ছে। আদিকালের মানুষের মত প্রতি পদে পদে তাদের বিপদ। আতঙ্কের মধ্যে তাদের দিন কাটে, রাত কাটে। তারা নানাবিধ ঝুঁকিপূর্ণ পরিশ্রমে নিয়োজিত আছে। ইউনিসেফের এক জরিপে দেখা গেছে, দেশে ৪৩৮ ধরনের অর্থনৈতিক খাতে শিশুরা শ্রম দেয়। বাস ট্রাক টেম্পোর হেলপার, রিক্সা-ভ্যান চালক, ইট-পাথর ভাঙ্গা, ঠোঙা বানানো, ফুল, সবিজ, খেলনা বিক্রি, গৃহপরিচারিকা, ওয়েল্ডিং ও ট্যানারি শিল্প, ভাঙারির দোকান, কাগজ কুড়ানো, হোটেল রেঁস্তোরার বয়, কুলি প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত শিশুরা। ইউনিসেফ-এর ২০০১ সালের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, দেশের ৬১ ভাগ শিশু শ্রমিকের মধ্যে ৩২ ভাগ মেয়েশিশু পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত। কেউ স্বেচ্ছায়, কেউ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ ঘৃণিত পথ বেছে নিয়েছে।[৩৬]

মানুষকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মক্ষম জনশক্তি তৈরি, আত্মনির্ভরশীল জাতি গড়ার কর্তব্য শুধু সরকারের একার নয়। সরকারের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দায়ভার এড়ানো সম্ভব নয়। প্রতিটি সচেতন নাগরিকেরই উচিত এসব মহৎ কাজে অংশগ্রহণ করা। তবে বিত্তশালীদের উপর এর দায়দায়িত্ব বেশি বর্তায়। সম্প্রতি বিশ্বের দুই নম্বর ধনকুবের ওয়ারেন বাফেট তাঁর মোট সম্পদের ৮০-৮৫ শতাংশ মানব কল্যাণে দান করার ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর মোট সম্পদের আর্থিক মূল্য ৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এক্ষেত্রে তার দানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৭ বিলিয়ন ডলার। তিনি এ অর্থ দান করবেন বিল গেটস ও তাঁর স্ত্রী মেলিন্ড গেটস প্রতিষ্ঠিত বিল এন্ড মেলিন্ড গেটস ফাউন্ডেশনকে। বিশ্বের এক নম্বর ধনী মার্কিন নাগরিক মাইক্রোসফট শিল্পের জনক বিল গেটস বিশ্ব মানবতার কল্যাণে এ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছেন। তিনি নিজেই এ ফাউন্ডেশনকে দান করেছেন ৩১ বিলিয়ন ডলার।[৩৭]

পথশিশুরা আমাদের সভ্য সমাজেরই একটি অংশ। লাখ লাখ শিশু, বালক, বালিকা, কিশোর , কিশোরী, তরুণ, তরুণী চোখের সামনে অন্ধকার অধ্যায়ে নিমজ্জিত হচ্ছে। এটা খুবই দুঃখজনক এবং ভবিষ্যৎ জাতির জন্য হতাশাজনক। শুধু সরকারের উপর নির্ভরশীলতা নয়, এনজিও ও ধনী ব্যক্তিরা একটু এগিয়ে আসলেই এর সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব। দেশের অর্থনীতির একটি প্রধান অংশের নিয়ন্ত্রক এনজিও শ্রেণী। অথচ এনজিও'র নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টির আওতাবহির্ভূতই থেকে যাচ্ছে ছিন্নমূল জনগোষ্ঠী। দেশের সাংবাদিক, লেখক, চিন্তাশীল ও বিত্তবান সমাজেরও এক্ষেত্রে দায়িত্ব অনেক। সর্বোপরি সচেতন নাগরিকদের সকলকেই পথশিশুদের জনশক্তিতে রূপান্তরের পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে হবে।

---

৩৬. *দৈনিক সংগ্রাম*, ১১ জানুয়ারি, ২০০৭
৩৭. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

গবেষণায় দেখা গেছে, পথশিশুরাও মেধাহীন নয়। অন্যদের মত তাদেরও আছে স্বপ্ন। সুযোগ পেলে তারাও নিজেদের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য মহৎ কিছু করার যোগ্যতা রাখে। উদাহরণস্বরূপ পথশিশুদের ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং পথশিশুদের দ্বারা বিস্ময়করভাবে এর কর্মকাণ্ড পরিচালনার বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। ২০০৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'শিশু উন্নয়ন ব্যাংক' নামে এ প্রতিষ্ঠানের পথ চলা। মূলত পথশিশুদের উদ্যোগেই এর যাত্রা শুরু। 'অপরাজেয় বাংলাদেশ' নামের বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতায় এটি প্রতিষ্ঠিত হলেও এর প্রকৃত মালিক পথশিশুরা। ব্যাংক নাম দেয়া হলেও মূলত এটি সঞ্চয় প্রকল্প। এখন এ সঞ্চয় প্রকল্পের মোট ১১টি শাখা চালু আছে। এদের ১০টি ঢাকায় এবং ১টি চট্টগ্রামে। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো, পথশিশুরাই তাদের ব্যাংক চালায়। ব্যাংকের গ্রাহক, ম্যানেজার, ডিএম, এডিএম, ক্যাশিয়ার সবাই পথশিশু। তাদের অধিকাংশের বয়স ১১ থেকে ১৫ বছর হলেও তারা সফলতার সাথে তাদের প্রকল্প চালাতে সক্ষম। তা তারা নিজেরাই প্রমাণ করেছে। এতে বুঝা যায়, সুযোগের যথাযথ ব্যবহার তাদের দ্বারাও সম্ভব। তাই এই ব্যাংকের মূল্যবোধ রাখা হয়েছে–

১. প্রত্যেক পথশিশুরই কর্মজীবী শিশুর মর্যাদা আছে। তাকে ঈমান রাখতে হবে।
২. ব্যাংক বিশ্বাস করে জন্মগতভাবেই শিশুর মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে।
৩. ব্যাংক শিশুদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করে।
৪. ব্যাংক শিশুর অংশগ্রহণের অধিকারে বিশ্বাস করে।

পথশিশুদের এ ব্যাংক নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছেন দেশের একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। তিনি মনে করেন, ব্যাংক শিশুদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নে একটি ভাল অর্থনৈতিক বিশ্ব তৈরিতে কাজ করবে।[৩৮]

ঢাকার মত খুলনা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে পথশিশুদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং অপরাধ জগৎ থেকে পথশিশুদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সরকারের পাশাপাশি কয়েকটি এনজিও কাজ করছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, খুলনা এলাকায় পথশিশুর সংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছে। পাঁচ বছর আগে খুলনা মহানগরী ও জেলার অন্য এলাকায় পথশিশুর সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। বর্তমানে (২০০৮) তাদের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। সেখানে ইউনিসেফের সহায়তায় এরাইজ প্রকল্পের নামে স্থানীয় একটি এনজিও তাদের নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে। আমরা আশাবাদী আরও বহু প্রতিষ্ঠান তাদের উন্নয়নে এগিয়ে আসবে। পথশিশু একদিন পথশিশু থাকবে না তারাও একদিন দেশের সম্পদে পরিনত হবে। পরিচয়হীন হলেও ওরা অসহায় নয়।

---

৩৮. ইসলাম, তাওহিদুল, *পথশিশুদের ব্যাংক, দৈনিক নয়া দিগন্ত*, সাপ্তাহিক প্রকাশনা, অবকাশ, ঢাকা : ৩০ মার্চ, ২০০৮, পৃ. ৫-৮

www.pathagar.com

মসজিদ কাউন্সিল নামের একটি প্রতিষ্ঠানও অসহায় শিশুদের জন্য কাজ করছে। তাদের রয়েছে 'চিলড্রেন ওয়েল ফেয়ার প্রোগ্রাম সংক্ষেপে (CWP) কার্যক্রম। আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীতে যাদের আর কেউ নেই এমন অসহায়, অনাথ, নাম-পরিচয়হীন এসব শিশুর সার্বক্ষণিক দেখাশোনার জন্য মসজিদ কাউন্সিল দু'জন সুপারিনটেনডেন্ট এবং পাঁচজন বিকল্প মা সহ ১০ জন লোক নিয়োগ করেছে। মসজিদ কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে রয়েছে একটি শক্তিশালী পরিচালনা পরিষদ। সমাজের বিত্তবানদের সহযোগিতায় পরিত্যক্ত-পরিচয়হীন শিশুদের জন্য নেয়া এ উদ্যোগের ফলে অসহায় শিশুরা পাচ্ছে বেড়ে ওঠার সব সুযোগ-সুবিধা। খেলাধূলা ও চিত্তবিনোদনের পর্যাপ্ত সুযোগের পাশাপাশি পাচ্ছে উন্নত নৈতিক শিক্ষাও। পিতা-মাতার পরিচয়ই যাদের নেই, তাদের আবার মামাবাড়ি? হ্যাঁ, এই গ্রীষ্মকালেও তারা হোস্টেল ছেড়ে দল বেঁধে মামাবাড়ি (কমিটির কর্মকর্তাদের বাড়ি) গিয়েছিলেন আম-কাঁঠালের মজা পেতে।[৩৯]

ইসলামী আইনে এই কুড়িয়ে পাওয়া শিশুকে (لقيط) 'লাকীত' বলা হয়।[৪০] শিশুকে কুড়িয়ে নেয়া মুস্তাহাব। কেননা এতে তার প্রাণ রক্ষা করা হয়। আর যদি তার প্রাণহানির প্রবল আশংকা থাকে তাহলে পথ শিশুকে কুড়িয়ে নিয়ে আশ্রয় দেয়া ওয়াজিব । ইমাম কুদূরী বলেন, কুড়িয়ে পাওয়া শিশু স্বাধীন। আর তার ভরণপোষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের তথা বাইতুল মাল থেকে করতে হবে। কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর ব্যাপারে যদি কেউ দাবি করে, এটা তার সন্তান তা হলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য। কেননা, এতে শিশু বংশ পরিচয়ের মর্যাদা পায় এবং শিশুর জন্য এটা কল্যাণকর। তবে দু'ব্যক্তি দাবিদার হলে যে নিজের সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের জোড়ালো নিদর্শন বলতে পারবে সেই হবে শিশুর হকদার।[৪১]

শিশু মাত্রই সমান অধিকার ও মর্যাদার দাবিদার। আজকের শিশুই আগামী জাতির কর্ণধার। তাদের মনোবিকাশের সাথে জড়িত আছে সমাজ, দেশ ও জাতির ভবিষ্যত। শিশুদের বিরাট অংশকে অন্ধকারে রেখে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভারসাম্য আনয়ন সম্ভব নয়। আমাদের সমাজেরই একটা অংশ এরা। তাদেরও সুন্দরভাবে বাঁচার অধিকার রয়েছে। অথচ তারা প্রতিনিয়ত নিগৃহীত, অপমানিত, লাঞ্ছিত হচ্ছে?

পরিবার প্রথা ধীরে ধীরে শিথিল ও ভেঙে যাচ্ছে। অনৈতিকভাবে যৌনক্ষুধা নিবারণের দিকে আজকের সভ্যতা ধাবমান। ফলে লক্ষ লক্ষ শিশু পিতৃমাতৃ পরিচয় বিহীন অবস্থায় পরতে বাধ্য হচ্ছে। পথে ঘাটে এবং শিশু আশ্রমে আশ্রয় খুঁজতে হচ্ছে।

---

৩৯. *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ১৫ জুন, ২০০৮

৪০. হক, ড. মুহাম্মদ আব্দুল, *জনসংখ্যা বিজ্ঞান (নিবন্ধ), হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৩৫১-৩৫৫

৪১. বুরহান উদ্দীন, আলমারগিনানী, (অনূদিত) আবু তাহেদ মেছবাহ, *আল-হিদায়া*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮, খ. ২, পৃ ৪১৮

www.pathagar.com

সভ্যতা ও সমাজের এ পঁচন ঠেকাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিশ্ব বিবেক। গঠিত হচ্ছে নানা সংস্থা এবং প্রণীত হচ্ছে নানা অধিকার সনদ, আইন ও নীতিমালা। কিন্তু এই পতন ঠেকানো সম্ভব হচ্ছে না। এ থেকে রেহাই পেতে হলে অবশ্যই আসতে হবে ধর্মীয় অনুশাসনের দিকে, বিশেষত ইসলামের দিকে। তাহলেই পথশিশুদের বাচানো সম্ভব হবে।

২. ইয়াতীম শিশুর নিরাপত্তা

প্রত্যেক মানব শিশু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে পিতামাতা এবং মানব জাতির জন্য নিআমত ও পবিত্র আমানত। পৃথিবীতে মানবজাতির বংশধারা সুরক্ষার জন্য মানব-মানবীর বৈধ দাম্পত্য জীবনের ফসল হচ্ছে মানব শিশু। এই শিশুরাই মানব সভ্যতার রক্ষাকবচ, মানব প্রজন্মের ভবিষ্যৎ এবং পিতামাতা ও উম্মাহর সমৃদ্ধ জীবনের আশার আলো। শিশুসন্তান হচ্ছে পার্থিব জীবনের শোভা।[৪২] এই মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব থেকেই কতিপয় মৌলিক অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করে। ইসলাম শিশুর সেই সব অধিকার সুরক্ষায় নিশ্চয়তা প্রদান করে। শিশুর অধিকার প্রদান ও সংরক্ষণে ইসলামী জীবন-বিধান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে তথা ইসলামী জীবন-দর্শনে মানব শিশুর জন্মের পবিত্রতা, শিশুর নিরাপত্তা, প্রতিপালন, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং আদর্শ মানবরূপে গড়ে তোলার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে।

* ইয়াতীম শিশুকে স্নেহ করা : আল্ কুরআনের যে আয়াতগুলোতে ইয়াতীম শিশুর প্রতি সদয় হওয়া কর্তব্যকর্ম বলে নির্দেশিত এবং তাদের ওপর অত্যাচার-উৎপীড়ন-নির্যাতন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সে সকল অংশ দীর্ঘকাল ধরে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন– "না, কখনও নয়; বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না।"[৪৩]

বিশেষ করে সৎকর্মপরায়ণ লোকের শিশুর প্রতি সদাচরণ করার জন্যও দৃষ্টান্ত রয়েছে, মূসা আ.-এর সময়কার খিজির আ. এর ব্যবহার থেকে আমরা পাই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

"আর ঐ প্রাচীরটি, ইহা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, এর নিম্নদেশে আছে তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার প্রতিপালক দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তাদের ধনভান্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজ হতে কিছু করিনি আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলেন, এটাই তার ব্যাখ্যা।"[৪৪]

---

৪২. আল-কুরআন, ১৮ : ৪৬, اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

৪৩. আল-কুরআন, ৮৯ : ১৭, كلا بَل لا تَكرِمُونَ اَليَتِيمَ

৪৪. আল-কুরআন, ১৮ : ৮২, وَامَّا الجِدَارُ فكانَ لِغُلامَيْن يَتِيمَيْن فِي المَدِينَةِ وَكانَ تحتَهُ كنزٌ لهُمَا

www.pathagar.com

ইয়াতীমদের সম্মান না করার অর্থ তাদের প্রাপ্য আদায় না করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন না করা। যারা পার্থিব জীবনে ইয়াতীম, নিঃস্ব ও বন্দিদের উপকার করে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আখিরাতে জান্নাত ও জান্নাতের বহু নিআমত দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। ইয়াতীম ও নিঃস্বদের প্রতি সহায়তাদান জান্নাতী মানুষের স্বভাব। বস্তুত পিতৃহীনতা বা অনাথ নিঃস্ব হওয়া শিশুদের জন্য বড় বিপদ। পিতার অভাবে শিশুর জীবন ভয়ানক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। অনাথ শিশুর জীবন, নিরাপত্তা, প্রতিপালন, স্বাস্থ্য, সেবা-যত্ন, পরিচর্যা, শিক্ষা, নৈতিকতা ও মানবীয় চারিত্রিক গুণ বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলা সবকিছুতেই অনিশ্চয়তা নেমে আসে। তাই এসব থেকে সুরক্ষার জন্য ইসলাম অনাথ শিশুর অধিকার আদায় ও নিরাপত্তার জন্য সব কিছুর ব্যবস্থা করেছে।

* ইয়াতীম শিশুর সাথে উত্তম ব্যবহার করা : প্রত্যেক শিশুর প্রতি আমাদের উত্তম ব্যবহার করা অপরিহার্য। বিশেষ করে ইয়াতীম শিশুদের প্রতি। কেননা এটি আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত একটি বিধান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

"স্মরণ কর, যখন ইসরাঈল-সন্তানদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সহিত সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দিবে, কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।"[৪৫]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেন– "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তার শরীক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।"[৪৬]

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের পাশাপাশি রসূল স.-এর হাদীসও এবিষয়ে অনুসরণযোগ্য। রসূল স. ছিলেন অনাথ ইয়াতীমদের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিভাবক। তিনি

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا .

৪৫. আল কুরআন, ২ : ৮৩, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ .

৪৬. আল-কুরআন, ৪ : ৩৬, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

www.pathagar.com

নিজে যেমন এদের প্রতি সদয় ছিলেন, তেমনি তাঁর সাহাবীদেরও সব সময় অনাথ অসহায়দের তত্ত্বাবধানে দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য উপদেশ দিতেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসের অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়, আবু উসমান রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন– "কেউ যদি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোন ইয়াতীম শিশুর মাথায় হাত বুলায়, যে পরিমাণ চুল হাতে লাগবে সে ঐ পরিমাণ সওয়াব পাবে। যে ব্যক্তি তার নিকট প্রতিপালিত কোন ইয়াতীম ছেলে বা মেয়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, আমি ও সে জান্নাতে এভাবে থাকব। এই বলে তিনি তাঁর তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীকে ফাঁক করে দেখান।"[৪৭] অপর এক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট নিজ অন্তরের কঠোরতার বিষয়ে আলোচনা করেন। তখন রসূলুল্লাহ স. বলেন– "তুমি ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকীনকে খাবার দাও।"[৪৮]

* ইয়াতীমের খাদ্য ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা : ইয়াতীম শিশুকে খাদ্য দান ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা ইসলামী আইনের একটি অপরিহার্য বিধান। তাদের ধন-সম্পদের প্রতি আসক্ত হওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আর যারা তাদের সহযোগিতা করবে তারাই সত্যপরায়ণ ও মুত্তাকী।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেন–

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ-প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থিগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।"[৪৯]

যদি রাষ্ট্রে এমন কোন দুগ্ধ পোষ্য শিশু থাকে যাদের তত্ত্বাবধানের কেউ নেই, তবে সে ক্ষেত্রে তাদের সার্বিক দেখাশুনার দায়িত্ব সরকারি কোষাগার বা বাইতুল মালের ওপর

---

৪৭. আত-তাবারানী, সুলায়মান ইব্ন আহমদ, *আল-মু'জামুল কাবীর*, মওসুল : মাকতাবাতুল 'উলূম, ১৪০৪, খ. ৭, পৃ. ২২৫ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن أبي أمامة قال: من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وقرن بين إصبعيه.

৪৮. আহমদ, *আল-মুসনাদ*, আল-কাহেরা : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, তা.বি. খ. ২, পৃ. ৩৮৭

৪৯. আল-কুরআন, ২ : ১৭৭, وَلَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ و أقام الصلوة و آتى الزكوة و الموفون بعهدهم إذا عاهدوا و الصابرين في البأساء و الضراء و حين البأس أولئك الذين صدقوا و أولئك هم المتقون

www.pathagar.com

বর্তাবে।[৫০] উমর ফারুক রা. তাঁর খিলাফতকালে প্রত্যেক দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য দশ দিরহাম ভাতা প্রদান করতেন, তারা একটু বড় হলে দুইশত দিরহাম ভাতা দিতেন। এ সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন– "রসূলুল্লাহ স. বলতেন, কেউ যদি সম্পদ রেখে মারা যায় তবে তা তার উত্তরাধিকারীর।"

রসূলুল্লাহ স.-ই সর্বপ্রথম অসহায় ইয়াতীমের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ইয়াতীম অসহায় শিশুদের প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে তিনি মানবতাবোধকে কত উচ্চে তুলে ধরেছিলেন তা আজো পৃথিবী বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করে। একথা সকলেই স্বীকার করেন, একমাত্র মুহাম্মদ স.-ই মানবতার কথা মুখে বলে তা বাস্তবে রূপ দান করে দেখিয়েছেন।

* ইয়াতীম শিশুর সম্পদ ভক্ষণ থেকে বিরত থাকা : ইয়াতীম শিশু সমাজে অসহায় অবস্থায় থাকে। অভিভাবক না থাকায় অনেকেই তাদের উপর নির্যাতন করে সম্পদ দখল করে মারাত্মক গুনাহর কাজ করে। আল্লাহ্ তাআলা এ ব্যাপারে কঠিন আজাবের কথা ঘোষণা দিয়ে বলেন–

"সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদেরকে তা হতে কিছু দিবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে। তারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পিছনে ছেড়ে গেলে তারাও তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হতো। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে। যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে; তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।"[৫১]

হাদীসের এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম স. বলেছেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে বিরত থাক। লোকেরা বললো, সেগুলো কি হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন– ১. আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, ২. যাদু করা, ৩. অহেতুক আল্লাহর নিষিদ্ধ জীবকে হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. ইয়াতীমদের মাল খাওয়া, ৬. জিহাদ থেকে পালিয়ে যাওয়া, ৭. সতী সাধ্বী মুসলিম রমনীর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়া।[৫২]

---

৫০. রহমান, গাজী শাসছুর, ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খ. ৩, পৃ ৪৭০, ধারা ১০৫৭

৫১. আল-কুরআন, ৪ : ৮-১০, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا.

৫২. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ওয়াসাআ, অনুচ্ছেদ : কওলুল্লাহি তাআলা ইন্নাল্লাযীনা, প্রাগুক্ত পৃ. ২২৩ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

www.pathagar.com

ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এপ্রসঙ্গে জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার তত্ত্বাবধানে যে ইয়াতীম রয়েছে আমি কোন কোন অবস্থায় তাকে মারতে পারব ? তিনি বললেন, যে সব কারণে তোমার সন্তানকে মেরে থাকো সে সব কারণে তাকেও মারতে পার। সাবধান, তোমার সম্পদ বাঁচানোর জন্য তার সম্পদ নষ্ট করো না এবং তার সম্পদ দিয়ে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করো না।[৫৩]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে– "এক লোক রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে নিবেদন করল, আমি একজন নিঃস্ব দরিদ্র লোক, আমার কোন সহায় সম্পদ নেই। আমার অধীনে একজন সম্পদশালী ইয়াতীম আছে, আমি কি তার সম্পদ থেকে কিছু পেতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার অধীনস্থ ইয়াতীমের মাল এ শর্তে খরচ করতে পার যে, অপব্যয় করবে না, তাড়াহুড়া করবে না এবং আত্মসাত করার চিন্তা করবে না।"[৫৪]

* ইয়াতীমদের মধ্যে গণীমতের মাল বন্টন করা : ইয়াতীমদের ভরণ-পোষণের প্রতি নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ তাদেরকে যুদ্ধলব্ধ মাল প্রদান করার বিধান দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেন–

"আরো জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর রসূলের, রসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের।"[৫৫]

এ সব আয়াতে আমরা ইয়াতীম শিশুর অধিকার সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিবরণী পাই। আরো বলা হয়েছে, ইয়াতীম শিশুদেরকে তাদের ধন-সম্পদ প্রদান কর এবং ভালর সঙ্গে মন্দের বিনিময় করো না এবং তোমাদের ধন-সম্পত্তির সঙ্গে যোগ করে তাদের ধন-সম্পত্তি ভোগ করো না; নিশ্চয় এটা গুরুতর অপরাধ।

* ইয়াতীম মেয়েদেরকে সম্পদের লোভে বিবাহ না করা : ইয়াতীমরা সব সময় সমাজে অসহায় ও নিরূপায় থাকে। স্বার্থান্বেষী মহল সর্বদা চায় তাদের সম্পদ গ্রাস করতে। এ ঘৃণ্যতম কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ্ তাআলা মানুষদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

---

৫৩. আত-তাবারানি, সুলাইমান ইবনে আহমদ, *আলমু'জামুল কাবীর*, বৈরুত : মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫, খ.১, পৃ. ১৫৭ عن جابر قال قال رجل يا رسول الله مما اضرب منه يتيمي قال مما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل من ماله مالا

৫৪. আশশাওকানী, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ, *নাইলুল আওতার*, বৈরুত : দারুল জাইল, ১৯৭৩, খ.৫, পৃ ৩৭৪ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل

৫৫. আল-কুরআন, ৮ : ৪১, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

www.pathagar.com

"তারা নারীগণ সম্পর্কে তোমার কাছে ব্যবস্থা জিজ্ঞেস করছে; বল, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করছেন; আর অনাথিনী সম্পর্কে তোমাদের প্রতি কুরআন হতে পাঠ করা হয়েছে; তাদেরকে তোমরা তাদের নির্ধারিত প্রাপ্য দাও না অথচ তাদেরকে বিয়ে করতে বাসনা কর। অসহায় শিশুদের এবং ইয়াতীম শিশুদের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর এবং যে কোন সৎকাজ তোমরা কর আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত।" [৫৬]

এ আয়াতটি অনাথ বালিকাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এতে তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হবার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিদ্যমান।

* উত্তরাধিকারী হওয়ার বিধান : ফিকহী মতে ইয়াতীম তার দাদার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না যদি দাদার অন্য পুত্র বিদ্যমান থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে কুরআনের অসিয়তের আয়াত প্রণিধানযোগ্য–

"তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যুকাল যখন ঘনিয়ে আসে আর যদি তার পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পদ থাকে তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে তার পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করার বিধান দেয়া হলো। ধর্মনিষ্ঠদের জন্য এটা কর্তব্য।"[৫৭]

হাদীস অনুযায়ী সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়ত করা যায়। এ আয়াত অনুযায়ী সেই এক তৃতীয়াংশ হতে নিকট আত্মীয়দের যারা নিজেদেরও স্বত্ব অংশ হতে বঞ্চিত হয়েছে যথা– পিতৃহীন নাতী, তাদের জন্য অসিয়ত করার অবকাশ রয়েছে। এ ছাড়াও কুরআনের এ আয়াতটির প্রণিধানযোগ্য–

"সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম এবং নিঃস্ব ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে তা হতে তাদেরকে কিছু দাও এবং তাদের সঙ্গে ভাল কথা বল।"[৫৮]

* ইয়াতীম শিশুর প্রতি যত্নবান হওয়ার মাধ্যমে দীনের ঘাঁটিতে প্রবেশ : ইয়াতিম শিশু যাতে পিতৃ হারানোর পর নিজ আত্মীয়দের মধ্যে তার প্রতি পিতার মত দয়ালু অভিভাবকের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে, সে যেন অন্য সন্তানদেরকে নিজ বাপের সাথে চলতে দেখে সংকীর্ণবোধ না করে, কিংবা দুঃখ-বেদনা অনুভব না করে। সেও যেন অভিভাবককে পিতার মত মনে করে তার স্নেহ ও মমতায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। আমরা কুরআন ও হাদীসের উপর বিশেষভাবে মনোযোগ দিলে দেখতে পাবো, একজন ইয়াতীমের প্রতি ইসলাম যদি এত বেশি সম্মান, শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও আদর যত্নের নির্দেশ দেয়, তা হলে নিকটাত্মীয় ইয়াতীমের আরও কত বেশি? এ মর্মে আল্লাহ বলেন–

---

৫৬. আল-কুরআন, ৪ : ১২৭, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

৫৭. আল-কুরআন, ২ : ১৮০, كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

৫৮. আল-কুরআন, ৪ : ৪-৮, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

www.pathagar.com

"সে দীনের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। আপনি জানেন, সে ঘাঁটি কি? তা হচ্ছে, দাসমুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান, ইয়াতীম আত্মীয়কে অথবা ধূলি-ধূসরিত মিসকীনকে।"[৫৯]

হাদীসের এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, সাহলে ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন– "আমি এবং ইয়াতীমের যত্নকারী জান্নাতে এভাবে থাকব– এ বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যাঙ্গুলের প্রতি ইঙ্গিত দেন এবং ঐ দু'আঙ্গুলকে ফাঁক করেন।"[৬০]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন– "যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্য থেকে কোন ইয়াতীম শিশুকে নিজ খাবার ও পানীয়ের প্রতি টেনে আনে, আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যদি না সে ক্ষমার অযোগ্য কোন গুণাহ্ করে।"[৬১] অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন ইয়াতীমকে খাওয়ায় ও পান করায় আল্লাহ্ তাকে অব্যশই জান্নাত দেবেন, যদি না সে মুশরিক হয়।

* ইয়াতীম শিশুর অবস্থানরত ঘরকে উত্তম বলে ঘোষণা : নানা প্রতিকূল অবস্থা, দুঃসহ দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের মধ্যে মহানবী স.-এর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। আল্লাহ্ তাআলা যাঁকে মানব জাতির সর্বোত্তম মানুষ করে দুনিয়ায় নবুওয়তের শ্রেষ্ঠমত আসন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তিনি ইচ্ছা করলেই তাঁকে সচ্ছল অবস্থায় প্রতিপত্তিশালী করে দুনিয়ায় পাঠিয়ে তাঁর দীন প্রচারের কাজ সহজ করে দিতে পারতেন। কিন্তু তাতে মানবিক আদর্শ হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে অনেকের মনেই দ্বিধার সঞ্চার হতে পারতো। তাই যিনি মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম আদর্শ এবং সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত, আল্লাহ্ তাঁকে সৃষ্টি করেন ইয়াতীম ও দরিদ্র করে। যাতে তিনি দুনিয়ার সকল শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত, দুঃখী মানুষের উপকার করতে সক্ষম হন এবং তাদের মুক্তির অগ্রদূত হিসেবে কাজ করতে পারেন। নিপীড়িত, অধিকার বঞ্চিত ইয়াতীম অসহায় মানুষকে তিনি দেখিয়েছেন মুক্তির উজ্জ্বল দিগন্ত। তিনি বলেছেন–

---

৫৯. আল-কুরআন, ৯০ : ১১-১৬, فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ . فَكُّ رَقَبَةٍ . أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ . يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ . أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ.

৬০. বুখারী, ইমাম, *আস্-সহীহ্*, অধ্যায় : আততালাক, অনুচ্ছেদ : লি'আনি ওয়া কউলিল্লাহি তা'আলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮ عن سهلبن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا

৬১. তিরমিযী, ইমাম, *আস্-সুনান*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস্ সিলাতি 'আন রসূলিল্লাহি স., অনুচ্ছেদ : মা জা'আ ফি রহমাতিল ইয়তিমি ওয়া কিফালাতিহি عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قبض يتيما بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له

www.pathagar.com

"সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে সে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি।"[৬২]

* বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে অসহায় শিশুর নিরাপত্তা অধিকার : বাংলাদেশে ধর্মীয় ঐতিহ্যের মানবতাবাদী ভাবধারায় শিশুদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিভিন্নভাবে গুরুত্ব পেয়ে আসছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও পরিবর্তনশীল সমাজের বাস্তবতায় শিশুদের অধিকার বিভিন্ন দিক দিয়ে উপেক্ষিত হবার প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ শাসনামল থেকে বিভিন্ন আইনগত ব্যবস্থায় শিশু অধিকার সংরক্ষণের উদ্যোগ গৃহীত হতে থাকে। ব্রিটিশ শাসনামল ও পাকিস্তান আমলে প্রণীত শিশু স্বার্থবিষয়ক আইনসমূহ মূখ্যত শিশুশ্রমরোধ, বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং শিশুদের ভরণপোষণ ও নিরাপত্তা ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। সামগ্রিকভাবে স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতাত্তোরকালে বিশেষভাবে অসহায় শিশুর স্বার্থ রক্ষা ও কল্যাণের ক্ষেত্রে গৃহীত উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ হলো–

* জাতিসংঘ ঘোষিত অসহায় শিশুর নিরাপত্তা অধিকার প্রসঙ্গ : জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের ১০ তম ধারায় এই প্রকার শিশুদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যে শিশু স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী ভিত্তিতে তার পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত অথবা যে শিশুকে তার সর্বোত্তম স্বার্থে ঐ পরিবেশে থাকতে দেয়া যাবে না; সেই শিশু রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ সুরক্ষা ও সহায়তার অধিকারী। শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের জাতীয় আইনানুসারে এ ধরনের শিশুর জন্য বিকল্প তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করবে। এ ধরনের পরিচর্যায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে পালিত সন্তান হিসেবে অর্পণ, ইসলামী আইনের কাফালা, দত্তক প্রদান কিংবা প্রয়োজনবোধে কোন উপযুক্ত সংস্থার কাছে শিশুকে লালন-পালন করতে দেয়া। এ ক্ষেত্রে সমাধানের কথায় আসার

---

৬২. আল-হায়সামী, আলী ইবনে আবি বকর, *মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়াইদ*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল আরাবি, ১৪০৭, খ. ৮, পৃ. ১৯১ عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله رواه أبو يعلي والبزار. উক্ত হাদীসটি কিছু শব্দের পরিবর্তনে বিষয়টি এভাবে এসেছে–

عن أحمد بن إبراهيم الموصلي قال كنا عند المأمون فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحب العباد إلى الله أنفعهم لعياله –

আল-বাইহাকী, *শুআবুল ঈমান*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত : ১৪১০; খ. ৬, পৃ. ৪২; হাদীসের অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়–

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه –

"আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : মুসলমানদের ঘর উত্তম যে ঘরে একজন ইয়াতীম আছে এবং তার সাথে ভাল ব্যবহার করা হয়। আর মুসলমানদের সে ঘর নিকৃষ্ট যে ঘরে একজন ইয়াতীম আছে এবং তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়।"

(ইবনে মাজাহ, ইমাম, *আস্-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১২১৩; *আত-তাবারানি* : আল-কাহেরা : দারুল হারামাইন, ১৪১৫. খ. ৫, পৃ. ৯৯)

www.pathagar.com

সময় শিশু প্রতিপালন অব্যাহত রাখার বাধ্যনিয়তা এবং শিশুর জাতিগোষ্ঠী, ধর্ম-সংস্কৃতি ও ভাষাগত পটভূমির প্রতি যথাযথ সম্মান দিতে হবে।[৬৩] জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের আলোকে সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ তার নিজস্ব জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন করে।[৬৪]

উপসংহার : নবুওয়ত লাভের পূর্বেই আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ স.-এর মধ্যে অসহায়দের প্রতি ভালবাসা ও সহমর্মিতার অনুভূতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নবুওয়ত লাভের পর সে অনুভূতি আরো তীব্র ও পরিপূর্ণ করেছেন। তিনি অসহায়দের আদর করতেন আপন শৈশব উপলব্ধির মাধ্যমে। তিনি কৈশোরে গঠন করেন 'হিলফুল ফুযুল' নামক সংস্থা, যার প্রথম কাজ ছিল ইয়াতীম ও অসহায় শিশুদের সেবাদান। তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে এ ধরনের উন্নত প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে বিশ্বের সকলের প্রশংসা অর্জন করে। মহানবী স. সর্বদা আল-কুরআনের উক্ত নির্দেশাবলি মেনে চলতেন এবং মানবজাতিকে তা মেনে চলার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। মহানবী স.-এর ঘরে এক বেলার খাবার থাকলেও কোন ইয়াতীম ও অসহায় শিশু তাঁর কাছে খাদ্যাভাবে আসলে তিনি নিজের সবটুকু খাবারই তাকে তুলে দিতেন। নিজে না খেয়েও তিনি ইয়াতীম শিশুকে খাবার দিয়েছেন। ইয়াতীম শিশুদের দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে মহানবী স.-এর কোন তুলনা নেই। মহানবী স.-এর জীবনের ৬৩ বছরে তাঁর কাছে কোন ইয়াতীম হতাশা নিয়ে ফিরেছে বলে কোন প্রমাণ নেই। শত ব্যস্ততার মাঝেও কোন ইয়াতীম শিশু বিপদগ্রস্ত হতে দেখলে তার উপকার না করা পর্যন্ত তিনি শান্তি পেতেন না। আরবে তখন দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। মহানবী স. যখনই কোন ইয়াতীম বালককে ক্রীতদাস রূপে দেখতেন তখনই তিনি তার মালিককে উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করে ঐ শিশুটিকে মুক্ত করে দিতেন। তিনি ইয়াতীম শিশুদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে মানবজাতির কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। মানুষের দ্বারা সংঘটিত যত খারাপ কাজ মহানবী স.-কে কষ্ট দিতো ইয়াতীম শিশুদের উপর যুলুম নির্যাতন করাই তার মধ্যে বেশি কষ্টদায়ক ছিল। মহানবী স. তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইয়াতীম শিশুদের প্রতি অনাবিল ভালবাসা দেখিয়েছেন এবং এটা তাঁর জীবনের এক অনবদ্য আদর্শ। রসূল স.-এর উম্মত হিসেবে আমাদেও উচিত পরিচয়হীন, পথশিশু ও ইয়াতীম অসহায় শিশুদের প্রতি সদয় হওয়া এবং তাদের সুন্দরভাবে বেড়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

---

৬৩ . *শিশু অধিকার সনদ*, জাতিসংঘ, ধারা-২০, *শিশু বিশ্বকোষ*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ.-১৬৮; *নিবন্ধ-শিশু অধিকার*, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, ঢাকা : রাইটস ক্লাস্টার, ইউনিসেফ, ১৯৯৮, পৃ.২৭

৬৪. *শিশু বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৭

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৬
এপ্রিল-জুন : ২০১১

ইসলামে ন্যায়বিচারের গুরুত্ব ও পদ্ধতি

ড. মোঃ শামছুল আলম*

[সারসংক্ষেপ : আদল বা ন্যায়বিচার ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ন্যায়বিচারের উপর মানবজীবনের অনেক কিছু নির্ভর করে। ইসলামের সাথে ন্যায়বিচার কথাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলাম যে সব কারণে অন্য সব মতাদর্শের তুলনায় স্বমহিমায় ভাস্বর তার অন্যতম হচ্ছে সুবিচার বা ন্যায়বিচার। ইসলামের খলীফাগণ ছিলেন এক এক জন ন্যায়বিচারের মূর্ত প্রতীক। ইসলামের সর্বত্র ন্যায়বিচার বিদ্যমান। যে কোন দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা অনেকটা নির্ভর করে সে দেশের ন্যায়বিচারের অবস্থা তথা আইনের শাসনের উপর। এ জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। অত্র প্রবন্ধে ন্যায় বিচারের গুরুত্ব ও পদ্ধতি সম্পর্কে. আলোচনা করা হয়েছে।]

ন্যায়বিচারের পরিচয় : সুবিচার বা ন্যায়বিচার শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ আদল' (عدل) যার অন্য অর্থ- যথাস্থানে রাখা, যথাযথ করা, সঠিক করা, বাস্তবসম্মত করা, সমান সমান করা, সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, সমতা নিরূপণ করা, ন্যায়বিচার করা, কম বেশি না করা, কোন কিছুকে দাবিদারদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া, যে যেখানে যতটুকু পাবে তাকে সেখানে ততটুকু দেয়া ইত্যাদি। এ জন্যই বিচারালয়কে আরবীতে আদালত' বলা হয়। ইমাম রাগিব ইসফাহানী র. বলেন, 'আদল' অর্থ বিচারের ক্ষেত্রে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব না করে সমান সমান করা। অর্থাৎ দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন' এই নীতিতে বিচার কার্য সম্পাদন করা। সুবিচারের আরেকটি প্রতিশব্দ 'ইনসাফ' যার অর্থ সমান ভাবে বন্টন করা। সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আদলের চেয়ে যথোপযুক্ত শব্দ আর দ্বিতীয়টি হতে পারে না। 'আদল' শব্দের বিপরীত শব্দ 'যুলম'। যার অর্থ– কোন বস্তুকে তার নির্দিষ্ট স্থানে না রাখা, সুবিচার না করা, অবিচার করা ইত্যাদি। শায়খ আবূল বাকা র.-এর মতে 'আদল' শব্দটি যুলমের বিপরীত। এর অর্থ– যার যা প্রাপ্য যথাযথভাবে তাকে তা দেয়া।[১] সৃষ্টির সর্বত্র আদল পরিলক্ষিত হয়। মহান আল্লাহ্ যেটাকে যেখানে যেভাবে সৃষ্টি ও স্থাপন করা দরকার তা-ই

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১. মান্নান, অধ্যাপক মাওলানা আবদুল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ. ৫৬৯

www.pathagar.com

করেছেন। ইসলাম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য 'আদল' শব্দটিকে বাছাই করে ন্যায়বিচারের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ এ শব্দটির মধ্যেই ন্যায়বিচার লুকিয়ে আছে। 'আদল' শব্দের আবেদন সর্বজনীন।

ন্যায়বিচারের পরিধি : অনেকে মনে করেন ন্যায়বিচারের জায়গা শুধু বিচারালয় বা আদালত। আসলে ইসলামে ব্যাপারটি খুবই ব্যাপক। ইসলামে 'আদল' বা ন্যায়বিচার একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর দ্বারা সর্বত্র ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা বুঝায়। ইসলামের আদল শুধু কাঠগড়ায়ই সীমিত নয় বরং জীবনের সর্বত্র আদল প্রতিষ্ঠা করতে হয়। জীবন-যাত্রায়ও আদল প্রতিষ্ঠা করতে হয়। যেমন- সন্তানদের মধ্যে আচরণে, একাধিক স্ত্রীর মধ্যে আচরণে, লেখক হিসেবে প্রতিটি লেখা ও লেখকের প্রতি আচরণে, শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদের সাথে আচরণে ও মূল্যায়নে, জনপ্রতিনিধিদের প্রতিটি মানুষকে সুযোগ-সুবিধা প্রদানে, প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে অধীনস্থদের সাথে আচার-আচরণে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। বিচারপতি নিয়োগেও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপার রয়েছে। বিচারপতি যোগ্য না কি অযোগ্য তা তার নিয়োগকর্তাকে ভেবে দেখতে হবে। নচেৎ অযোগ্য বিচারপতি যত ভুল বা অন্যায় রায় দিবে তার দায়ভার নিয়োগকর্তাকেও ভোগ করতে হবে। তাছাড়া সময়কে যথাযথ কাজে লাগানো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সঠিকভাবে ব্যবহারও ন্যায়বিচার। যোগ্য লোককে ভোট দেয়াও সুবিচারের শামিল। এক কথায় ইসলামে কোন কিছু ন্যায়বিচারের বাইরে নয়।

ইসলামের ইতিহাসে ন্যায়বিচার : ইসলামের সোনালী ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, তখন সমাজের সর্বত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। বলা যায়, সে সময়টি ছিল ন্যায়বিচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিশেষত রসূলুল্লাহ্ স., খুলাফায়ে রাশিদীন, উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় শাসনামলে ন্যায়বিচার পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন তাঁদের শাসন ন্যায়বিচারের কারণেই বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষত ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমর রা.-এর কথা উল্লেখ করা যায়। এখানে তাঁর শাসন থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো–

নিম্নের ঘটনা প্রমাণ করে যে, বিচারের ক্ষেত্রে ইসলামে বিচারপ্রার্থী কোন ধর্মের অনুসারী তা বিবেচ্য বিষয় নয়। মিসরের অমুসলিম অধিবাসীদের এক ব্যক্তি মদীনায় এসে উমর রা.-এর কাছে মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এবং উমর রা. তার সন্তোষজনক প্রতীকার করেন। ফরিয়াদী অভিযোগ করল, আপনার গভর্নরের ছেলে আমার ছেলেকে অন্যায় ভাবে লাঠিপেটা করেছে। উমর রা. এ অভিযোগ শোনামাত্র গভর্নর ও তার ছেলেকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন এবং যথাযথা বিচারের পর ফরিয়াদীর ছেলেকে দিয়ে প্রকাশ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করালেন এবং সতর্ক বাণী উচ্চারণ করলেন, "তুমি কবে থেকে মানুষকে গোলাম বানাতে শুরু

www.pathagar.com

করলে? অথচ তারা তাদের মায়ের পেট থেকে স্বাধীনভাবে জন্ম গ্রহণ করেছিল।" উল্লেখ্য, মিসরের তৎকালীন গভর্নর আমর ইবনুল আস মিসরের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী শাসক ছিলেন। কিন্তু ন্যায়বিচারের সর্বজনীনতার কারণে তিনি টু শব্দটিও করেননি। এ জন্য দেখা যায় উমর রা. সে সব সমস্যায় পড়েননি, যে সব সমস্যায় পরবর্তী শাসকগণ পড়েছিলেন। এর কারণ একটিই ছিল। আর তা হলো ন্যায়বিচার বা সুশাসন।

নিজ পুত্র বা স্বজন বলে বেশি সুবিধা নিয়ে নিবে তখনকার যুগে তা চিন্তাও করা যেত না। কেউ তখন এসব নিয়ে চিন্তা করার সময়ও পেত না। হযরত উমর রা.-এর খিলাফতকালে খলীফা জুময়ার খুতবা দিতে মিম্বরে দাঁড়ানোর সাথে সাথে এক মুসল্লী জানতে চাইলেন খলীফার জামা অত লম্বা হলো কিভাবে? কারণ বায়তুল মাল থেকে সকলকে যে কাপড় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা দিয়ে অত লম্বা জামা বানানো যায় না। প্রশ্নকর্তা যখন জানলেন, খলীফার ছেলের ভাগে যে কাপড় পাওয়া গেছে সেটা খলীফাকে দেয়ার ফলেই তাঁর পক্ষে লম্বা জামা বানানো সম্ভব হয়েছে তখন প্রশ্নকর্তা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, হ্যাঁ এখন খুতবা শুরু করুন। আমরা শুনবো। খলীফা বললেন, যদি সন্তোষজনক জবাব না পেতে তাহলে কি করতে? তখন প্রশ্নকর্তা বললেন, তখন আমার এই তলোয়ার এর সমাধান দিতো। একথা শুনে খুশী হয়ে খলীফা বললেন, হে আল্লাহ! যতদিন পর্যন্ত এরূপ সাচ্চা ঈমানদার বান্দা জীবিত থাকবে ততদিন ইসলাম ও মুসলমানের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।"[২]

উমর রা.-এর পুত্র আবূ শামাহ্ অপরাধ করার পর তিনি তাকে ক্ষমা করে দেননি। বরং তিনি নিজ হাতে শাস্তি কার্যকর করেছেন।[৩] যা তিনি নিজ হাতে না করলেও পারতেন। আসলে তিনি ন্যায়বিচারকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করতেন বলে অন্য কিছু তাঁর উপর প্রভাব ফেলত না। তাঁর ব্যাপারে বলা হয়, "আল্লাহ্র দীনের ব্যাপারে উমর রা. বজ্রকঠোর ছিলেন।"[৪]

তিনি মৃত্যুর পূর্বে ঝামেলা এড়ানোর জন্য ৬ সদস্যের খলীফা প্যানেল গঠন করে যান। তাঁরা হলেন, উসমান রা., আলী রা. আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা., সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা., তালহা রা. এবং জুবাইর ইবনুল আউয়াম রা.। যাতে যোগ্যতা সত্ত্বেও নিজ পুত্র ও বিশিষ্ট সাহাবী এবং মুহাদ্দিস আবদুল্লাহর নাম বাদ দিয়ে যান। এ নামটি লোকদের পক্ষ থেকেই প্রস্তাব করা হয়েছিল। তখন তিনি বলে

---

২. রহমান, অধ্যাপক মতিউর, *ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: বর্ষ: ৪২, সংখ্যা: ৪, এপ্রিল-জুন ২০০৩, পৃ. ৩৬

৩. মান্নান, অধ্যাপক মাওলানা আবদুল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০

৪. ইবনে মাজা, ইমাম, *আস-সুনান,* অধ্যায়: মুকাদ্দামা, দেওবন্দ: আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫

www.pathagar.com

উঠলেন, "আল্লাহ্ তোমার অমঙ্গল করুন। কসম আল্লাহর, আমি আল্লাহর কাছে এমনটি চাই না। ... খিলাফতের এ দায়িত্বের মধ্যে যদি ভালো কিছু থাকে, আমার বংশের থেকে আমি তো লাভ করেছি। আর যদি তা মন্দ হয় তাও আমরা পেয়েছি। উমরের বংশের এক ব্যক্তির হিসাব নিকাশই এজন্য যথেষ্ট। আমি আমার নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি, আমার পরিবারবর্গকে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত করেছি। কোন পুরস্কারও নয় এবং কোন তিরস্কারও নয় এমনভাবে যদি আমি কোন মতে রেহাই পাই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবো।"[৫]

উপরোক্ত ঘটনাবলী ও ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে ইসলামে ন্যায়বিচারের গুরুত্ব সবার উপর। এর উপর নির্ভর করে অনেক কিছু। উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে ন্যায়বিচারের পরিধি ও সীমা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। অন্যভাবে বলা যায়, ইসলামী শাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ন্যায়বিচার বা সুশাসন। ন্যায়বিচার ইসলামের অহংকার এবং সবচেয়ে বড় সম্পদ। পৃথিবীতে ন্যায়বিচার কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তা ইসলামই প্রথম দেখিয়েছে।

ইসলামে ন্যায়বিচারের গুরুত্ব : ইসলামে সুবিচারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। জনগণের মধ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামী বিচার ব্যবস্থার লক্ষ্য। আল-কুরআন ও হাদীসে বার বার সুবিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। বিশেষত মহান আল্লাহর প্রতিটি বাণী, সৃষ্টি ও সিদ্ধান্তে অপরূপ সুবিচার পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য তাঁর কোন কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়নি এবং হবেও না। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "সত্য ও সুবিচারের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই।"[৬] তাছাড়া ন্যায়বিচারের গুরুত্ব অনেক। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

আল্লাহর নির্দেশ : সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য স্বয়ং মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, "আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন।"[৭] অন্যত্র বলা হয়েছে, "তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।"[৮] আল্লাহর নির্দেশমালার মধ্যে ন্যায়বিচারের স্থান সবার উপরে। সর্বত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ঐচ্ছিক ধরনের কর্মসূচি নয়। এটি অপরিহার্য তথা ফরয একটি বিধান।

---

৫. মাবুদ, ড. মুহাম্মদ আবদুল, *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৯, পৃ. ৪৩, ৪৪

৬. আল-কুরআন, ৬:১১৫, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدقًا وَّ عَدلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِه

৭. আল-কুরআন, ১৬:৯০, اِنَّ اللهَ يَاْمُرُ بِالعَدلِ وَالاِحسَانِ وَاِيتَائِ ذِى القُربىَ

৮. আল-কুরআন, ৪:৫৮, واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার উপায় : বিভিন্নভাবে মহান আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন হওয়া যায়। তার মধ্যে একটি সুবিচার। অন্যদিকে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সুবিচার প্রতিষ্ঠা না করলে মহান আল্লাহর বিরাগভাজন হতে হবে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।"[৯] ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র খুবই প্রিয়। সে ব্যক্তি যদি উচ্চ পদস্থ কেউ হয় তাহলে তো কথাই নেই। পক্ষান্তরে যালিম ব্যক্তি আল্লাহর নিকট খুবই ঘৃণিত। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ স. বলেন– "ন্যায়পরায়ণ খলীফা কিয়ামতের দিন আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় এবং সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত হবেন। আর যালিম রাষ্ট্রপ্রধান কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত ও সর্বাধিক শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। অধিকন্তু সে আল্লাহর দরবার থেকেও বহুদূরে অবস্থান করবে।"[১০]

অপর একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, তিনি বলেছেন– "সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ সেদিন ছায়া দিবেন যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। (তারা হলো) ন্যায়পরায়ণ শাসক ...।[১১] অন্য একটি হাদীস থেকে জানা যায়, মহানবী স. বলেছেন, "ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ আল্লাহর ডান পার্শ্বে নূরের তৈরি একটি মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। তারা যখন দায়িত্বে ছিল তখন তারা তাদের শাসনে এবং পরিবারে ইনসাফ কায়েম করেছিল।"[১২]

সুবিচারের নিমিত্তে তাকওয়া : ইসলামে অধিকাংশ ইবাদত করার কথা বলে বলা হয়েছে যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, "সুবিচার করবে, এটি তাকওয়ার নিকটতর।"[১৩] অর্থাৎ, সুবিচার প্রতিষ্ঠায় তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

সুবিচারের জন্য সাক্ষ্যদান : আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়ের সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে।"[১৪] সর্বত্র সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা কোন ঐচ্ছিক বিষয় নয় বরং এটি অন্যতম ফরয। অতএব বিচারের

---

৯. আল-কুরআন, ৪৯:৯, انَّ اللهَ يُحِبُّ المُقسطِينَ
১০. আহমদ, ইবনে হাম্বল, ইমাম, *আল-মুসনাদ,* কায়রো : মাতবাআ আল্‌শারকিল ইসলামিয়া, ১৮৯৫, তা. বি. পৃ. ৩, পৃ. ২২
১১. মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ্,* অধ্যায় : আয-যাকাত, হাদীসঃ ৯১, দিল্লীঃ আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬
১২. মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ্,* অধ্যায়ঃ ইমারাত, হাদীসঃ ১৮, প্রাগুক্ত
১৩. আল-কুরআন, ৫:৮, اعدلوا هُوَ اقرَبُ للتقوى
১৪. আল-কুরআন, ৫:৮, يَا ايُّهَا الذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لله شُهَدَاءَ بِالقِسطِ وَلا يَجرِمَنكم شنانُ قوم على الا تعدلوا

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ আসলেই ন্যায়বিচারের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, "তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে করবে।"[১৫] অতএব অন্যান্য ফরযকে যেভাবে গ্রহণ করা হয় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকেও সেভাবেই গ্রহণ করা উচিত।

আল্লাহর সৃষ্টিতে ন্যায়বিচার দৃশ্যমান : মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে সুষম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর দ্বারা পরোক্ষভাবে মানুষকেও তাদের কর্মকাণ্ডে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মহান আল্লাহ্র একটি সৃষ্টিও এমন নেই যাতে সামান্যতম অবিচার ও অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন বলা হয়েছে, "যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসমঞ্জস করেছেন।"[১৬]

আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া : ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার নামান্তর। আর এসবই পরকালে পরিত্রাণের মাধ্যম হবে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ্ তো তার সম্যক খবর রাখেন।"[১৭]

মহানবী স. সর্বদা সুবিচার করতেন : বিশ্বনবী স. স্বয়ং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছেন। এতেও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্বই ফুটে ওঠে। কুরআনের ভাষায় তিনি বলেন, "আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে।"[১৮] অর্থাৎ পক্ষপাতমুক্ত সুবিচার-নীতি অবলম্বন করার জন্য আমি আদিষ্ট ও নিয়োজিত। পক্ষপাতিত্বের নীতি অবলম্বন করে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে যাওয়া আমার কাজ নয়। সকল মানুষের সাথে আমার সমান সম্পর্ক- আর তা হচ্ছে আদল ও সুবিচারের সম্পর্ক। সত্য যার পক্ষে, আমি তার সাথী; সত্য যার বিরুদ্ধে, আমি তার বিরোধী। আমার দীনে কারও জন্য কোন পার্থক্যমূলক ব্যবহারের অবকাশ নেই। আপন-পর, ছোট-বড়, উচ্চ-নীচের জন্য পৃথক পৃথক অধিকার সংরক্ষিত নেই।

---

১৫. আল-কুরআন, ৪:৫৮, وَاِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

১৬. আল-কুরআন, ৮২:৭, الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

১৭. আল-কুরআন, ৪ : ১৩৫, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

১৮. আল-কুরআন, ৪২:১৫, وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمُ

www.pathagar.com

যা সত্য তা সকলের জন্যই সত্য; যা গুনাহ তা সকলের জন্যই গুনাহ; যা হারাম তা সবার জন্যই হারাম, যা হালাল তা সবার জন্যই হালাল; যা ফরয, তা সকলের জন্যই ফরয। ইসলামের এই ন্যায়বিচারের সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে আমার নিজের সত্তাও মুক্ত নয়।

রসূলুল্লাহ্ স. আল্লাহর কাছে অবিচার থেকে পানাহ চাইতেন : ইসলামে সুবিচার এতটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, মহানবী স. সর্বদা আল্লাহর পানাহ চাইতেন যাতে কখনো তাঁর দ্বারা অবিচার না হয়ে যায়। হাদীসে আছে, জনৈক সাহাবী রা. বলেন, "মহানবী স. ভুল বিচার করা হতে পানাহ চাইতেন।"[১৯]

ঈমানের পরিচায়ক হিসেবে গুরুত্ব : মানুষের কর্মকাণ্ডে তার ঈমানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিচারের মাধ্যমেও মানুষের ঈমানের পরীক্ষা হয়ে যায়। মুখে বললেই হবে না যে, 'আমিও মুসলমানের সন্তান।' ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে তার প্রমাণ দিতে হবে। আম্মার ইবন ইয়াসার রা. বলেন, মহানবী স. বলেছেন, "যে ব্যক্তি তিনটি কাজ এক সঙ্গে সম্পন্ন করল, সে যেন ঈমানকে সুসংবদ্ধ করে নিল। (তা হচ্ছে) নিজের নফসের সাথে ইনসাফ করা, সকলকে সালাম করা এবং দরিদ্র অবস্থায় অর্থ ব্যয় করা।"[২০] 'নিজের নফসের সাথে ইনসাফ করা' অর্থ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সুবিচারনীতি ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করা এবং এ ব্যাপারে এতদূর দৃঢ়চেতা হওয়া যে, ব্যক্তি নিজে নিজেকেও ক্ষমা করবে না।

ইনসাফ ও ন্যায়বিচারপরায়ণতার ফলে সৎকর্মশীল সকল লোকের পক্ষে সুষ্ঠু জীবন যাপন অত্যন্ত সহজ হয় এবং অশ্লীলতা, ফাসেকী, নাফরমানী, আল্লাহর আইন লংঘন এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত কাজ ইত্যাদি পরিহার করার পথে কোন বাধা প্রতিবন্ধকতা থাকে না। বস্তুত মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের সাথে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন না করে, ততক্ষণ অপর লোকের প্রতি কোন সুবিচার করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় সে অপরের কাজের সঠিক ও নির্ভুল যাচাই কি করে করতে পারে? সুতরাং সর্বপ্রথম নিজেকে দেখা, যাচাই করা ও নিজের প্রতি সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। এটি করলে অতঃপর অপরের অন্যায়ের যাচাই ও পরীক্ষা করা তার পক্ষে সহজ হতে পারে।[২১] উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন– "আম্মার রা. বর্ণিত এই হাদীসে সমস্ত কল্যাণ একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা তুমি যখন তোমার নিজের প্রতি ইনসাফ

---

১৯. নাসায়ী, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায়: ইস্তিআযাহ, অনুচ্ছেদ: ৩৪

২০. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: ঈমান, অনুচ্ছেদ: ২০, দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৪৫

২১. আবদুর রহীম, মওলানা মুহাম্মাদ, *হাদীস শরীফ*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৬৪, খ.১, পৃ.৬২

www.pathagar.com

করবে, তখন তুমি তোমার স্রষ্টার এবং তোমার ও অন্যান্য মানুষের প্রতি পারস্পরিক চূড়ান্ত কল্যাণই লাভ করতে পারবে। সমস্ত মানুষকে যখন তুমি সালাম দিবে, তখন তোমার চরিত্রও উন্নত হবে, মানুষের মন জয় করতে পারবে।"[২২]

সর্বোত্তম মানুষের : ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী সবচেয়ে ভাল মানুষ। মহানবী স. বলেছেন– "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে বিচার করার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম।"[২৩] আরো একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সে ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালায় সর্বোত্তম।"[২৪]

ফয়সালা ও মীমাংসায় সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে : বিশেষত একাধিক দলের মধ্যে বিরোধ মীমাংসায় সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর এ সুবিচারের মূল উদ্দেশ্য হবে যাতে বিবদমান দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা হয়ে যায় এবং তারা সংশোধিত হয়ে যায়। মহান আল্লাহ্ বলেন, "বিবদমান দলগুলোর মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে।"[২৫]

ওজনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : ইসলাম প্রতিটি পর্যায়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে। বিশেষত মাপ ও ওজনে যাতে কেউ অবিচার না করে সে জন্য ইসলাম মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছে। পাশাপাশি ওজনে সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "পরিমাপ ও ওজন ন্যায্যভাবে করবে।"[২৬]

সুবিচারের সাথে ঋণের বিবরণ লিখে রাখা : প্রাত্যহিক জীবনে লেনদেন করতে গিয়ে অনেক সময় ঋণ করতে হয়। তখন ঠিকমত লিখে না রাখলে পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য করযের কারবার কর তখন তা লিখে রাখ; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখে দেয়।"[২৭] অতএব যে কোন লেনদেনের প্রতিটি পর্যায়ে সুবিচারের দিকটি খেয়াল করতে হবে।

ন্যায় বিচার নিশ্চিত কল্পে সাক্ষীর নিরপেক্ষতা : সাক্ষ্য প্রদানেও সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার গুরুত্ব সমধিক। ইসলাম সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্য ন্যায়পরায়ণ লোককে নির্ধারণের কথা বলেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমাদের কারো যখন

---

২২. আবদুর রহীম, মওলানা মুহাম্মাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
২৩. মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: মুসাকাত, প্রাগুক্ত, হাদীস : ১১৮-১২০, ১২১ خياركم محاسنكم قضاء
২৪. মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: মুসাকাত, হাদীস: ১১৯, প্রাগুক্ত, فانّ خير عباد الله احسنهم قضاء
২৫. আল-কুরআন, ৪৯:৯, فاصلِحُوا بَينَهُمَا بالعَدل وَاقسطوا
২৬. আল-কুরআন, ৬:১৫২, وَاَوفُوا الكيلِ وَالميزَانَ بالقِسط
২৭. আল-কুরআন, ২:২৮২, يا اَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اِذَا تَدَايَنتم بِدَينِ اِلى اجل مُسَمّى فاكتُبُوهُ وليَكتُبَ بَينكم كاتِب بِالعَدلِ

www.pathagar.com

মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে।"[২৮] সাক্ষী নির্ধারণে ন্যায়পরায়ণতার উপর জোর প্রদান করে অন্যত্র বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে; আর তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দেবে।"[২৯]

মর্যাদাগত পার্থক্য : সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। বিধায় যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে আর যারা করে না তাদের মর্যাদায় বিস্তর পার্থক্য। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ আরও উপমা দিচ্ছেন দু ব্যক্তির : তাদের একজন মূক, কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তার প্রভুর বোঝাস্বরূপ; তাকে যেখানেই পাঠান হোক না কেন সে ভাল কিছুই করে আসতে পারে না; সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে?"[৩০]

ন্যায়বিচারক আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হয় : বিচারের মত একটি জায়গায় দায়িত্ব পালনের জন্য মহান আল্লাহর সাহায্য দরকার। কারণ যে কোন সময় যে কোন ভুল রায় সব ওলট পালট করে দিতে পারে। আর মহান আল্লাহ্ তাদেরকেই সাহায্য করেন যারা সুবিচারের নীতি গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "বিচারক অন্যায় না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন। যখন সে যুলুম করে তখন আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন না এবং শয়তান তার সঙ্গী হয়ে যায়।"[৩১]

পরকালীন কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ভরশীল : বিচার এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয় যে, এর উপর নির্ভর করে মহান আল্লাহ্ পরকালে জান্নাত বা জাহান্নাম দিবেন। ন্যায়বিচারের প্রতিদান এবং অন্যায় বিচারের মন্দ পরিণাম প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "বিচারক তিন প্রকার। এক প্রকার বিচারক জান্নাতী হবে। আর দুই প্রকার বিচারক জাহান্নামী হবে। জান্নাতী বিচারক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে হক্ (সত্য) জেনে সে মুতাবিক ফয়সালা করেছে। যে ব্যক্তি হক্ জানা সত্ত্বেও আদেশ দানের ক্ষেত্রে অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে সে হবে জাহান্নামী। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা সত্ত্বেও বিচারকার্য সম্পাদন করে সেও জাহান্নামী হবে।"[৩২]

---

২৮. আল-কুরআন, ৫:১০৬, يَا اَيُّهَا الذِينَ امَنُوا شَهَادَةُ بَينِكُم اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ المَوتُ حِينَ الوَصِيَّةِ اثنَانِ ذَوَا عَدلٍ منكم

২৯. আল-কুরআন, ৬৫:২, وَاَشهِدُوا ذَوَى عَدلٍ مِنكُم وَاَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

৩০. আল-কুরআন, ১৬:৭৬, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَينِ اَحَدُهُمَا اَبكَم لَا يَقدِرُ عَلَى شَيءٍ وَهُوَ كَلٌ عَلَى مَولَاهُ اَينَمَا يُوَجِّههُ لَا يَاتِ بِخَيرٍ هَل يَستَوِي هُوَ وَمَن يَاَمُرُ بِالعَدلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ

৩১. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০

৩২. আবু দাউদ, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল আকযিয়া, অনুচ্ছেদ: ফীল কাযী ইয়াখতী, হাদীস নং- ৩১০২, প্রাগুক্ত عَنِ ابنِ بُرَيدَةَ عَن اَبِيهِ عَنِ النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ وَاثنَانِ فِي النَارِ فَاَمَّا الذِي فِي الجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَجَارَ فِي الحُكمِ فَهُوَ فِي النَارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَاسِ عَلَى جَهلٍ فَهُوَ فِي النَارِ

www.pathagar.com

সাদকা স্বরূপ : ন্যায়বিচার-প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ইসলামে এত বেশি যে, এটিকে সাদাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "তুমি সুবিচার কর। দু' পক্ষের মধ্যে সুবিচার করে দেয়া সাদাকা স্বরূপ।"[৩৩]

শান্তি ও স্থিতিশীলতা আসে : কোন স্থানে ন্যায়বিচার অব্যাহত থাকলে সেখানে স্বভাবতই শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সে স্থানে অশান্তি ও অস্থিরতা থাকে না। সবাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায় করণীয় : বিচার যেন সহজলভ্য হয় ও ন্যায় বিচারের সুফল যাতে জনগণের নিকট পৌঁছে এর জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালার প্রতি ইসলাম খুব জোর প্রদান করেছে–

১. বিচারকের নিকট পৌঁছতে কোন রকমের প্রতিবন্ধকতা যেন না থাকে। কেননা ইসলাম গরীব, অসহায় ও মাযলুম মানুষের জন্য আদালতের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কাজেই মোকাদ্দমা রজুকারীর নিকট থেকে অতিরিক্ত কোন ফি ইত্যাদি আদায় করা উচিত নয়। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "আল্লাহ্ তাঁর কোন বান্দাকে যদি মুসলমানদের কোন বিষয়ে শাসন ও দায়িত্ব ভার অর্পণ করেন, তারপর সে ব্যক্তি যদি অভাবগ্রস্ত ও অসহায় লোকদের তার নিকট পৌঁছার ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি করে রাখে, তাহলে আল্লাহ্ও তার প্রয়োজন পূরণ ও অভাব মোচনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে রাখবেন।"[৩৪]

২. বাদী-বিবাদী উভয়ের ছোট-বড় প্রত্যেক বিষয়ে সমান ব্যবহার করা। বিশ্বখ্যাত 'শামী' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে,
   ক. কাযী (বিচারক) মসজিদে বাড়িতে বা আদালতে এমন স্থানে বসে বিচার করবেন যেখানে প্রবেশ করার ব্যাপারে সকলের জন্য অনুমতি রয়েছে।
   খ. তিনি কারো হাদিয়া (উপহার) গ্রহণ করবেন না।
   গ. কারো বিশেষ দাওয়াতে অংশ গ্রহণ করবেন না।
   ঘ. বাদী-বিবাদীদেরকে বসানো, তাদের প্রতি মনোযোগ প্রদান, ইশারা কিংবা সংকেত দান অথবা দৃষ্টি দানের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের প্রতি সমতা বজায় রাখবেন।
   ঙ. কোন এক পক্ষের সাথে গোপন আলাপ, উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা বলা, মুখোমুখি হাসা, তাদের সম্মানার্থে দাঁড়ানো, এ জাতীয় কোন আচরণ করবেন না।
   চ. বিচার মঞ্চে বসে ঠাট্টা-মশকরা করবেন না।
   ছ. সাক্ষী কেমন করে সাক্ষ্য বাক্য উচ্চারণ করবে তা শিখাবেন না।
   জ. কোন পক্ষ এমন কথা বলবে না যা অপর পক্ষ বুঝতে সক্ষম নয়।

---

৩৩. মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: যাকাত, হাদীস: ৫৬, প্রাগুক্ত تعدل ، ان يعدل بين الاثنين صدقة।

৩৪. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭১ من ولاّه الله شيئا من امر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلّتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلّته وفقره

www.pathagar.com

৩. ক. বাদী ব্যক্তি প্রমাণ পেশ করবে।

খ. যদি সে প্রমাণ পেশ করতে না পারে তাহলে বিবাদীর নিকট থেকে শপথ গ্রহণ করা হবে। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "প্রমাণ পেশ করা বাদীর উপর কর্তব্য। আর অস্বীকারকারী (বিবাদী)-এর উপর শপথ করা বাধ্যতামূলক।"[৩৫]

গ. শরিয়াত বিরোধী না হওয়া পর্যন্ত বাদী-বিবাদী সর্বাবস্থায় সন্ধি করতে পারে।

ঘ. বিচারক তার বিবেচনা মতে ফয়সালা প্রদানের পর এ ব্যাপারে পুনঃ বিবেচনা করার ইখতিয়ার তার রয়েছে।

ঙ. মোকাদ্দমা পেশ করার একটি নির্দিষ্ট দিন থাকা বাঞ্ছনীয়।

চ. ভিনদেশী বা দূরদেশী লোকদের শুনানী আগে হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনুরূপভাবে মোকাদ্দমায় এক পক্ষ গরীব ও এক পক্ষ ধনী হলে আচরণের ক্ষেত্রে গরীবের প্রতি সহায়তার নজর প্রদান করা আবশ্যক।

ছ. মুসলমান মাত্রই সাক্ষ্য দানের উপযুক্ত। তবে যদি কোন ব্যক্তি সাজাপ্রাপ্ত হয় কিংবা কখনো মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়েছে বলে প্রমাণিত হয়, তবে এ জাতীয় ব্যক্তি আদালতে সাক্ষ্য দিতে পারবে না।

৪. রায় প্রদানের সময় বিচারককে মানসিক ভারসাম্য হারালে চলবে না। বিশেষত ক্রোধাবস্থায় বিচার করা যাবে না। বিচারকের জন্য ক্রোধান্বিত হওয়া বা খিটখিটে মেজাজের হওয়া অনুচিত। এ অবস্থায় বিচারকার্য সম্পাদন করতে রসূলুল্লাহ্ স. নিষেধ করেছেন। তাহলে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত রায় হয়ে যেতে পারে। মানুষ সুবিচার নাও পেতে পারে। তিনি বলেছেন, "কোন হাকিম (বিচারক) ক্রোধান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে ফয়সালা করবে না।"[৩৬] অনুরূপ আরো কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো- মহানবী স. বলেছেন, "এমতাবস্থায় তুমি দু' পক্ষের মধ্যে রায় দিও না যে, তখন তুমি ক্রোধান্বিত।"[৩৭] বিচারকালিন সময়ে মেজাজের ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "ক্রোধাবস্থায় দু' পক্ষের মধ্যে বিচার করা বিচারক বা কাযীর জন্য শোভনীয় নয়।"[৩৮]

৫. আদালত কক্ষে এমন কোন কথাবার্তা না হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে কোন পক্ষের প্রতি জোর-জবরদস্তি প্রমাণিত হয়।

৬. মহিলা ও পুরুষের সাক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শ্রবণ করা উচিত।

---

৩৫. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২, البيّنة على المدّعى واليمين على من انكر

৩৬. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২, لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان

৩৭. মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আকযিয়া, হাদীস: ১৬, প্রাগুক্ত لا تحكم بين اثنين وانت غضبان

৩৮. মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আকযিয়া, হাদীস: ৯, প্রাগুক্ত, لا ينبغى للقاضى، للحاكم ان يحكم بين اثنين وهو غضبان

www.pathagar.com

৭. কোন বিষয় পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত রায় ঘোষণা না করা। প্রয়োজনে সময় বৃদ্ধি করে নেয়া উত্তম। কোন মোকদ্দমা ব্যাপারে রায় দিতে হাকিম অপারগ হলে তা উচ্চ আদালতে স্থানান্তরিত করা উচিত।

৮. বিচারের আসনে বসে উপদেষ্টাদের থেকে মতামত গ্রহণ না করা উচিত। মতামত নেয়া আবশ্যক হলে তা ভিন্ন ভাবে নেয়া উচিত।

৯. বিচারক রায় শুনানির সময় বলবে, আমি এই আদালতের বিচারক হিসেবে এই রায় ঘোষণা করছি। ঘোষণা মার্জিত ভাষায় হওয়া উত্তম। যাতে বাদী-বিবাদী ভয়ে আতংকিত না হয়ে পড়ে।

১০. বিচারকের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে, সর্বকাজে আল্লাহর হুকুম ও রসূলুল্লাহ্ স.-এর আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখা। তবেই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

১১. অনেক সময় সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও ভুলের আওতা হতে রেহাই পাওয়া যায় না। কাজেই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য কায়মনোবাক্যে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করবে; যেন তিনি বিবাদ-মীমাংসায় সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে রায় দেয়ার তাওফীক দেন।[৩৯]

উপরের সব নিয়ম-কানূন ন্যায়বিচারকে নিশ্চিত করার জন্য। যা ইসলাম ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ন্যায়বিচারের বাধাসমূহ অপসারণ : ইসলাম শুধু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বুদ্ধই করেনি বরং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে যে সব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলোর অপসারণ ঘটিয়েছে। যে সব অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্য মানব মনে জাগরিত হলে ন্যায়বিচারে ব্যাঘাত ঘটতে পারে তার প্রত্যেকটিকে ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করেছে। যেমন–

ক. চারিত্রিক দুর্বলতা : যারা চারিত্রিক দিক থেকে দুর্বল ইসলামে এমন লোকেরা বিচারক হওয়ার অযোগ্য। এদের ব্যাপারেই মহানবী স. বলেছেন, "অনেক জাতি পার্থিব সম্পদের বিনিময়ে তাদের চরিত্র বিক্রি করে দেয়।"[৪০] মুআয ইবন জাবালকে মহানবী স. ইয়ামানে বিচারক হিসেবে পাঠনোর সময় এ কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হে মুআয! তুমি মানুষের জন্য তোমার চরিত্রকে সুন্দর কর।"[৪১] চরিত্রের ব্যাপকতা অনেক। যেমন– সঠিক রায় দেয়া, প্রভাবান্বিত না হওয়া, কাউকে হয়রানি না করা, দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধে অবস্থান করা, রাগান্বিত অবস্থায় রায় না দেয়া ইত্যাদি।

---

৩৯. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩

৪০. ইবনে হাম্বল, ইমাম আহমদ ইবন, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৭৩, يبيع اقوام اخلاقهم بعرض من الدنيا

৪১. মালিক, ইমাম, *মু'আত্তা*, অধ্যায়: হুসনুল খুলক, হাদীস: ১, কায়রো : ১৯৫১, احسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل

www.pathagar.com

খ. ভেদাভেদ, বিভেদ, বৈষম্য : বিচারকের দৃষ্টিতে মানুষকে যখন সমান নজরে দেখা না হয় তখনি বিচারে বিপত্তি ঘটে। আর এ ব্যাধির নাম বিভেদ-বৈষম্য, যা ইসলামে অত্যন্ত ঘৃণিত। এ জন্যই ইসলাম সমতার কথা ও সাম্যের কথা বলেছে।

গ. অবৈধ আয়ের জন্য সঠিক বিচার না করা : অনেক সময় ঘুষ নিয়ে বিচারকগণ রায় পাল্টে দেন। যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। ইসলামে ঘুষ অত্যন্ত খারাপ একটি বিষয়। এ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "বিচারে ঘুষখোর ও ঘুষদাতাকে আল্লাহ্ লানত করেছেন।"[৪২]

ঘ. অযোগ্যতা ও অনভিজ্ঞতা : আজকাল স্বজনপ্রীতি ও দলপ্রীতির কারণে অনেক সময় বিচারক নিয়োগে অন্যায়ের আশ্রয় নেয়া হয়। অপেক্ষাকৃত যোগ্য ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে অযোগ্য ব্যক্তিকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এতে সুবিচার বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বিচারালয়ে নৈরাজ্য দেখা দেয়। বিচারক নিয়োগে অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা উচিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "অভিজ্ঞতা ছাড়া কেউ বিচারক হতে পারে না।"[৪৩]

তাছাড়া সুবিচারের পথে বাধা সৃষ্টি করে এমন সব মানবীয় দুর্বলতা ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। সর্বোপরি সুবিচারের পথকে সুগম করার জন্য যা যা দরকার ইসলাম তার সব ব্যবস্থা করে রেখেছে।

ন্যায়বিচারের অভাবে যা হয়

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার বিদ্যমান না থাকলে নানাবিধ বিপত্তি দেখা দেয়। যেমন- অবিচার ও যুলুম ছড়িয়ে পড়ে।

ধ্বংস অনিবার্য : পূর্ববর্তী অনেক জাতি তাদের অবিচারের ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে। বিশেষত বনী ইসরাঈলের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ন্যায়বিচারের অভাব। সে সমাজে বিভিন্ন লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিচার ছিল। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "বনী ইসরাঈলের পতনের অন্যতম একটি কারণ এই ছিল যে, তাদের সম্ভ্রান্ত কেউ চুরি করলে ছেড়ে দেয়া হতো আর নীচু বংশের কেউ চুরি করলে তার হাত কাটা হতো। সে সত্তার শপথ! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করতো তাহলে মুহাম্মদ স. তার হাত কেটে দিত।"[৪৪] এ জন্য

---

৪২. ইবনে হাম্বল, ইমাম আহমদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৮৭-৩৮৮, لعن الراشى والمرتشى فى الحكم

৪৩. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আদব, অনুচ্ছেদ: ৮৩, لاحكيم الا ذو تجربة

৪৪. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: হুদূদ, অনুচ্ছেদ: ১২, রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০০

www.pathagar.com

দেখা যায় বনী ইসরাঈলরা ছিল দুনিয়ায় লাঞ্ছিত, অভিশপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি জাতি। অন্যদিকে মহানবী স. প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সর্বকালের সেরা একটি সমাজ ও রাষ্ট্র। কারণ তিনি আইনে হস্তক্ষেপ করেননি। বরং পুরো মাত্রায় আইনের শাসন কায়েম করেছিলেন।

খিয়ানতের নামান্তর : বিচারকের অন্যায় রায় যেমনি খিয়ানত হিসেবে গণ্য; তেমনি অযোগ্য বিচারক নিয়োগও খিয়ানত হিসেবে পরিগণিত। বিচারক নিয়োগের সময় বিচারকের তাকওয়া, নৈতিক মান ও যোগ্যতা ইত্যাদি যাচাই করে দেখা আবশ্যক। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "যদি কোন ব্যক্তির উপর মুসলমানদের কোন বিষয়ের দায়িত্ব ও শাসন ভার অর্পণ করা হয় আর উক্ত ব্যক্তি যদি কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে এমন কোন ব্যক্তিকে নির্বাচন করে যার থেকে যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং কুরআন-সুন্নাহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী মানুষ তাদের সমাজে আছে বলে তার জানা থাকে, তবে সে ব্যক্তি আল্লাহ্, রসূল ও মুসলিম সমাজের (স্বার্থের) সাথে খিয়ানত করলো।"[৪৫] ইসলাম সমাজে ন্যায়বিচার নিশ্চিত ও নির্বিঘ্ন করার জন্য অত্যন্ত দুরদৃষ্টিসম্পন্ন সামগ্রিক নীতিমালা দিয়েছে উপরোক্ত হাদীস তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যা বেড়ে যায় : সমাজে যখন সুবিচার কমে যায় তখন অপরাধীরা তাদের অপরাধের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। কারণ তারা বুঝে নেয় যে, অপরাধ করলে কিছুই হয় না। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যখন কোন হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি তখনি তার প্রেক্ষিতে আরো অনেক হত্যাকান্ড ঘটতে দেখা গেছে।

রক্তপাত ছড়িয়ে পড়ে : সমাজে যে সব কারণে রক্তপাত সংঘটিত হয় তার মধ্যে একটি হলো সুবিচার অনুপস্থিত থাকা। কেউ সুবিচার না পেলে দিকবিদিক জ্ঞানশুন্য হয়ে যে কোন কিছু ঘটিয়ে দিতে পারে। এ জন্য যে কোন মূল্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। এ দিকে ইংগিত করে মহানবী স. বলেছেন, "যদি কোন জাতির মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত না থাকে তখন তাদের মধ্যে রক্তপাত ছড়িয়ে পড়ে।"[৪৬] সর্বোপরি এর ফলে চিকিৎসক ও চিকিৎসালয়ের উপর চাপ পড়ে। মানুষের জীবন যাত্রায় খরচ বেড়ে যায়। অনেকে পঙ্গুত্ব বরণ করে।

মানবিক মূল্যবোধে ধ্বস নামে : আইনের সঠিক ব্যবহার ও বাস্তবায়নের অভাবে মানুষের মূল্যবোধগুলো হারিয়ে যেতে থাকে। মানুষের মৌলিক মানবীয় গুণাবলি

---

৪৫. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭১ من تولّى من امر المسلمين شيئا فاستعمل منه بكتاب الله وسنة رسوله عليهم رجلا وهو يعلم انّ بينهم من هو اولى بذالك واعلم فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين

৪৬. মালিক, ইমাম, *মুআত্তা*, অধ্যায় : জিহাদ, হাদীস: ২৬, প্রাগুক্ত, ولا حكم قوم بغير الحق فشا فيهم الدم

www.pathagar.com

তখন শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়ায়। যেমন– সততা, ন্যায়পরায়ণতা; সত্যবাদিতা, ধৈর্য, দয়া-মায়া, ভালবাসা, কল্যাণ কামনা, সরলতা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, নিষ্ঠা, সদ্ব্যবহার, অনুগ্রহ, সাহায্য-সহযোগিতা, ক্ষমা, দায়িত্বানুভূতি, কর্তব্যপরায়ণতা, সাম্য-মৈত্রী, আমানত রক্ষা, কৃতজ্ঞতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি।

মানুষ বাঁকা পথ খুঁজতে শুরু করে : ন্যায়বিচার হলো স্বাভাবিক পথ। মানুষ যখন এ পথে অগ্রসর হতে না পারে; তখন সে বিকল্প পথে অগ্রসর হয়। আর সে পথ কখনো সরল পথ হয় না। যে সব কিশোর, যুবক ও নারী যখন দেখে তাদের চোখের সামনে তাদের কাছের লোককে অন্যায়ভাবে আহত বা নিহত করা হয়েছে এবং তারা বিচার চেয়ে পায়নি। তখন তারা চরম পন্থা বেছে নেয়। খুন, গুম হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধির পেছনে যে, ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি দায়ী নয় তা কেউ হলফ করে বলতে পারবে না।

আইন অমান্য করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় : মানুষ যখন সুবিচার বঞ্চিত হয় তখন তার মনে হতাশা আসে এবং আইনের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধও নষ্ট হয়ে যায়। সে তখন আইন অমান্য করতে প্রলুব্ধ হয়। আইন অমান্য করা এক সময় তার কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

বিচারালয় ও বিচারপতিদের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস পায় : সুষ্ঠু বিচারের অভাব পরিশেষে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, মানুষ বিচারালয়, বিচারপতি ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সব কিছুকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করে।

আইন মানায় অনীহার সৃষ্টি হয় : মানুষ সুবিচার না পেলে আইনের প্রতি আনুগত্যে অনীহার সৃষ্টি হয়।

পেশীশক্তির উপর নির্ভরতা বেড়ে যায় : সমাজ বা রাষ্ট্রে সুবিচার হারিয়ে গেলে স্বভাবতই মানুষ শক্তির প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তখন সব মোকাবেলা সে শক্তি দিয়ে করতে চায়, যা কোন সমাজের জন্য খুবই খারাপ নিদর্শন।

হতাশা আসে : ন্যায়বিচার বঞ্চিত ব্যক্তিদের মধ্যে একটি সময় চরম হতাশা নেমে আসে। তারা মনে করে যে, না এখানে কিছু হবে না। তখন ভুক্তভোগী তার স্বাভাবিক কর্মকান্ডও চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে না।

দুবৃত্তরা আইন লঙ্ঘনে প্ররোচিত হয় : ন্যায়বিচারের অভাবে দেশের আইন-কানুনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে দুবৃত্তশ্রেণীর লোকেরা আইন লঙ্ঘনে প্ররোচনা বোধ করে। কিছু লোকের কাছে এটি তখন মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে : আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটার কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি। তখন ঘরে ঘরে পুলিশ দিয়েও আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি সাধন করা যায় না।

পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয় : মানুষ যখন সুবিচার থেকে বঞ্চিত হয় তখন সংশ্লিষ্ট সবার মধ্যে সম্পর্কেরও অবনতি ঘটে। পারস্পরিক সম্পর্কের স্থানে জায়গা করে নেয় মিথ্যা, প্রতারণা, স্বেচ্ছাচারিতা, শক্তি প্রদর্শন ইত্যাদি।

অমানবিকতা বেড়ে যায় : মিথ্যা, নিষ্ঠুরতা, গর্ব-অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, ঝগড়া-বিবাদ, তিরস্কার, শত্রুতা, লোভ-লালসা, তোষামোদ-চাটুকারিতা, ক্ষতি করার মানসিকতা, কপটতা, যুলুম, বিভেদ, খিয়ানত, নির্লজ্জতা, বেপরোয়া ভাব, প্রতারণা, স্বজনপ্রীতি, সীমালঙ্ঘ ইত্যাদি বেড়ে যায়।

সমাজ বিরোধী বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পায় : যেমন– চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, অপহরণ, নিষ্ঠুরতা, ব্যভিচার, দুর্নীতি, হত্যা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, অরাজকতা, চরমপন্থা, ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়।

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সুবিচারের অভাবে কোন জনপদে যে পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয় তা অন্য বড় কোন দুর্যোগেও হয় না। কারণ দুর্যোগ একবার আসে আর অবিচারের খেসারত মানুষকে যুগের পর যুগ দিতে হয়। এ জন্যই ইসলামে সুবিচার প্রতিষ্ঠা অনেক কিছুর উপর গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য ইসলাম জোর দিয়েছে একাধারে সুষম আইন, সৎ বিচারক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের আন্ত রিকতার প্রতি।

উপসংহার : যে কোন সমাজ ও রাষ্ট্রে সুবিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি এই যে, সর্বক্ষেত্রে সুবিচার নেই। এ জন্য যে কোন মূল্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বিচারালয়ের সম্মান অটুট রাখতে হবে। বিচারালয়কে সর্বশেষ আশ্রয়ের স্থান বানাতে হবে। তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্রে যেমন শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হবে তেমনি পারলৌকিক জীবন হবে সুখের। মনের দিক থেকেও মানুষ হবে সুখী ও সমৃদ্ধ।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৬
এপ্রিল-জুন ঃ ২০১১

ইসলামী ব্যাংকে অনুসৃত বায়' মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতি : একটি সমীক্ষা

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান*

[সারসংক্ষেপ : ইসলামী ব্যাংক প্রতিটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও বিনিয়োগের ধরন অনুযায়ী শরীয়তের সীমার মধ্যে নানা বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো শরীয়াহ্ অনুমোদিত যেসব বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করে তন্মধ্যে বায়' মুরাবাহা (অগ্রিম লাভে-বিক্রয়) অন্যতম। চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, কম্পিউটার প্রযুক্তি শিল্প, যে কোন ক্ষুদ্রশিল্পসহ বৃহৎশিল্প ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমদানি ও রপ্তানিমুখী শিল্পে চলতি মূলধন হিসেবে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, কাঁচামাল ক্রয় ও অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের যাবতীয় বৈধ সামগ্রীর মূলধনের যোগানের জন্য এ পদ্ধতি খুবই কার্যকরি। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দিনদিন লেনদেনের পরিধিও বিস্তৃত হচ্ছে। তাই ব্যাংকের স্বীয় বিনিয়োগ কার্যক্রমের উপর দৃষ্টি দেয়া এবং এক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সমস্যা-সম্ভাবনার বাস্তব-সম্মত পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে ইসলামী শরী'য়তের আলোকে বায়' মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে একটি সমীক্ষার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এ গবেষণায় ব্যাংকার ও গ্রাহকগণের বায়' মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতি বিষয়ক জ্ঞান ও সচেতনতা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা এবং এ পদ্ধতির প্রায়োগিক সমস্যা সম্পর্কে তথ্য লাভের চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের পথে বিরাজিত সমস্যার সমাধান অন্বেষণ করা হয়েছে।]

বায়' মুরাবাহা এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ : বায়' মুরাবাহা ক্রয়-বিক্রয়ের এক বিশেষ প্রকার। বায়' মুরাবাহা আরবি بيع এবং ربح শব্দ থেকে এসেছে। بيـــع অর্থ- ক্রয়-বিক্রয়[১] আর ربـــح অর্থ মুনাফা।[২] مرابحة (মুরাবাহ) শব্দটি বাবে মুফাআলাহ্ (مفاعله) এর ক্রিয়ামূল। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– লাভ করা,[৩] ফায়দা দেয়া বা উপকার করা।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১. ইসলামে ক্রয়-বিক্রয়ের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, "মূল্যবান জিনিসকে মূল্যবান জিনিসের-ই বিনিময়ে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে আদান প্রদান করা।" (তাকী উসমানী, মুফতী মুহাম্মাদ, অনুঃ মুফতী মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি : সমস্যা ও সমাধান*, ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, বাংলাবাজার, ২০০৫, পৃ. ৯২)

২. Shariah Board (ed.), *Manual for Investment Under Bai Murabaha Mode*, Dhaka: Islami Bank Bangladesh Ltd., p. 1

৩. Murabaha (Isl. Law) reale with specification of gain, resale with an advance. Hanse Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, NewYork : Spoken

www.pathagar.com

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, "তাদের ব্যবসা মোটেও লাভজনক হয়নি।"[৪] সুতরাং বায়' মুরাবাহা অর্থ হচ্ছে লাভের ভিত্তিতে বিক্রয় (Sale for an agreed upon profit)।[৫] যদি কোন বিক্রেতা তার ক্রেতার সাথে চুক্তি করে যে, সে তার নির্দিষ্ট পণ্য নির্দিষ্ট মুনাফার ভিত্তিতে প্রদান করবে, তাহলে এই ক্রয়-বিক্রয়কে বলা হবে "মুরাবাহা"।[৬] সুতরাং মুরাবাহা ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে বিক্রেতা বিক্রিত পণ্যের ব্যয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে তার উপর কিছু মুনাফা সংযোজন করে অন্যের নিকট বিক্রয় করবে। কোন পণ্য ক্রয় করার পর কিছু লাভ করে অর্থাৎ ক্রয় মূল্যের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভের অংক যোগ করে তা পুনরায় অন্য কোন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করাকে বায়' মুরাবাহা (بيع مرابحة) বলে।[৭] ইংরেজিতে বায়' মুরাবাহা (Bai Murabaha) কে বলা হয়- "To Sale at cost plus profit" অর্থাৎ, চুক্তির ভিত্তিতে লাভে বিক্রয় করা।[৮] এক কথায় মুরাবাহা বলতে ক্রয় মূল্যের সাথে ঘোষিত মুনাফাভিত্তিক বিক্রয়কে বুঝায়। বাহরাইনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

> Murabaha is selling a commodity as per the purchasing price with a defined and agreed profit mark-up. This mark-up may be a percentage of the selling price or a lump sum. This transaction may be concluded either without a prior promise to buy, in which case it is called an ordinary Murabaha, or with a prior promise to buy submitted by a person interested in acquiring goods through the

---

Language Services, Nov. 1960, p. 321; মাদকুর, ইবরাহিম, *আল-মুজামুল ওয়াসীত*, দেওবন্দ: কুতুবখানা হুসাইনিয়্যাহ, ১৯৯৭, পৃ. ৩২২

৪. আল-কুরআন, ২:১৬ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

৫. Board of Editors, *Test Book On Islamic Banking*, Dhaka: Islamic Economics Research Bureau, 2003, p. 123

৬. তাকী উসমানী, মুফতী মুহাম্মাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৭. Nicholas Dylan Ray, *Arab Islamic Banking and the Renewal of Islamic Law* London Graham and Trotman, 1995, p. 35; ড. ওয়াহবা. আয-যুহাইলী বলেন, هو البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, পাকিস্তান: মাকতাবাতুল হাক্কানিয়্যাহ, তা. বি., খ. ৪, পৃ. ৭০৩; মুফতী মুহাম্মাদ তকী উসমানী মুরাবাহার সংজ্ঞায় বলেন, "If a Saller agrees with his purchaser to his cost. It is called a "Murabaha" transaction." cf. Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* Karachi: Idaratul Maarif, 1999, p. 95; আস-সায়্যিদ সাবিক বলেন, هو البيع بالثمن الذى اشتريت به السعلة مع ربح معلوم *ফিকহুস সুন্নাহ*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-'আরাবি, ১৯৮৭, খ. ৩, পৃ. ১৩৩

৮. আশরাফী, মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংক কি কেন কিভাবে ?* ঢাকা: মাহিন পাবলিকেশন্স ১৯৯৮, পৃ. ১১৪

www.pathagar.com

institution, in which case it is called a "Banking Murabaha" i.e. Murabaha to the purchase order. This transaction is one of the trust-based contracts that depends on transparency as to the actual purchasing price or cost price in addition to common expenses.[৯]

এ পদ্ধতিতে মালামালের ক্রয়মূল্যের সাথে পরিবহণ খরচ, গুদাম ভাড়া, পাহারাদারের মজুরী, শুল্ক ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচ যোগ করা যাবে। তবে এ পদ্ধতিতে আনুসঙ্গিক খরচ যোগ করার পর পণ্যের যে মূল্য দাঁড়াবে তাকে মালের ক্রয় মূল্য বলে উল্লেখ করা যাবে না; বরং পণ্যের ক্রয়মূল্য, অন্যান্য খরচ আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং ক্রেতা পণ্যের ক্রয়মূল্য জানতে চাইলে বিক্রেতা তাকে জানাতে বাধ্য থাকবে।[১০]

ইসলামী ব্যাংকিং-এর পরিভাষায় মুরাবাহা পদ্ধতি বলতে আমরা এমন একটি বিনিয়োগ পদ্ধতিকে বুঝি যেখানে ব্যাংক চুক্তি মোতাবিক গ্রাহকের অনুরোধে ইসলামী শরীয়ার আলোকে কোন হালাল দ্রব্য গ্রাহকের চাহিদা ও নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী তৃতীয় কোন পক্ষ হতে ক্রয় করে ক্রয়মূল্যের সাথে পূর্ব স্বীকৃত লাভ বা মার্ক আপ ধার্য করে ভবিষ্যতের কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এককালীন বা কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ শর্তে বিক্রয় করে।[১১]

বায়' মুরাবাহা পদ্ধতিকে একটি উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরা যেতে পারে। ধরা যাক, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর কাছে *মাল্টিমিডিয়া* পিসি (ক্রেতা) আইসিবি কোম্পানির নিকট হতে (তৃতীয় পক্ষ বিক্রেতা) ১০০টি কম্পিউটার ক্রয় করে দেয়ার জন্য আবেদন করলো। আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড দরপত্রটি নিয়ে বাজার দর যাচাই করে *মাল্টিমিডিয়া* পিসির দরপত্র অনুমোদন করে প্রতিটি কম্পিউটারের মূল্য ৩০,০৭৭.৫০ টাকা হারে আইসিবি কোম্পানির কাছ থেকে ব্যাংক ক্রয় করার পর তা ৩৬,০৭৭.৫০ টাকা করে নেয়ার জন্য *মাল্টিমিডিয়* পিসি সম্মত হলো এবং এক বছরের মধ্যে টাকা দিয়ে সমুদয় ডেলিভারি নেবে বলে ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হল, এই বিনিয়োগে ব্যাংক প্রতিটি কম্পিউটারে ৬,০০০ টাকা লাভে মাল্টিমিডিয় পিসি-এর নিকট বিক্রয় করলো। এ ধরনের বিক্রয়কে মূলত ইসলামী ব্যাংকগুলোর অনুসৃত পরিভাষায় বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি বলে।

---

৯. Sharia Standards No. 8 Murabaha to purchase order, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2004-5, Appendix D: Basis for the Sharia ruling, p.127

১০. আশরাফী, মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান, *ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং এর রূপরেখা* ঢাকা : আরআইএস পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬, পৃ. ৮২

১১. হুসাইন, অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ, *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১৯৯৬, পৃ. ১৪৩-৪৪; Mohammed Haider Ali Miah, *A Hand Book of Islamic Banking and Foreign Exchange operatio*, Dhaka : Sahera Haider, 2000, p. 16

www.pathagar.com

বায়' মুরাবাহা পদ্ধতিতে নিম্নোক্তভাবে বিক্রয়মূল্য নির্ধারিত হয়

ক. ১০০টি কম্পিউটারের মূল্য ৩০,০০০০০/-
লেন্ডেড কস্ট : যোগ হবে+

খ. কম্পিউটার ক্রয়ের সাথে জড়িত যাতায়াত গুদামজাত করাসহ অন্যান্য যাবতীয় খরচাদি।

১. যাতায়াত খরচ-টিএ / ডিএ (যদি থাকে)	১০০০/-
২. এজেন্টের কমিশন (যদি থাকে)	১০০০/-
৩. পুঁজি / ফান্ড পাঠানো বাবদ খরচ	৫০০/-
৪. ব্যাংকের গুদামে পৌঁছান পর্যন্ত পরিবহণ ভাড়া (যদি পণ্য সাথে সাথে বিক্রয় করা না হয়)	২,৫০০/-
৫. ট্রানজিট ইনস্যুরেন্স / প্রাসঙ্গিক খরচ	১৫০০/-
৬. অন্যান্য খরচ	২০০/-
৭. গুদাম ভাড়া	৭৫০/-
৮. গুদাম প্রহরীর বেতন	৩০০/-
	৭,৭৫০/-

গ. মোট ক্রয়মূল্য : (ক+খ) (টাকা ৩০,০০০০০+৭,৭৫০) = ৩০,০৭৭৫০/-

ঘ. ব্যাংকের মুনাফা ৬,০০০০০(--%)

ঙ. বিক্রয়মূল্য : টাকা (গ+ঘ) (টাকা ৩০,০৭৭৫০+৬,০০০০০) =৩৬,০৭৭৫০/-
(উল্লেখ্য, এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কালে দরপত্র আহবান করতে হয়।)

বায়' মুরাবাহার প্রকারভেদ

মূল্য পরিশোধের দিক থেকে বায়' মুরাবাহা দু'প্রকার।[১২] যথা–

১. বায়' মুরাবাহা বিন্-নক্দ : যে সমস্ত বায়' মুরাবাহার স্থিরকৃত বা সম্মত মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধিত হয় তাকে বায়' মুরাবাহা বিন্ নক্দ বলা হয়।

২. বায়' মুরাবাহা বিল-আজল : যে সমস্ত বায়' মুরাবাহার স্থিরকৃত বা সম্মত মূল্য পরিশোধ বিলম্বিত হয় তাকে বায়' মুরাবাহা বিল আজল বলা হয়।

লেনদেনকারী পক্ষের দিক থেকে বায়' মুরাবাহা দু'প্রকার।[১৩] যথা–

১. সাধারণ বায়' মুরাবাহা (Ordinary Bai-Murabaha) : যে বায়' মুরাবাহা লেনদেনে শুধু বিক্রেতা ও ক্রেতা দু'টি পক্ষ থাকে, যেখানে বিক্রেতা কোন ক্রেতার অনুরোধ ছাড়াই একজন সাধারণ ব্যবসায়ী হিসেবে বাজার থেকে মালামাল ক্রয় করে নিজ মালিকানা ও দখলে রেখে আগত ক্রেতাদের নিকট আনুসঙ্গিক খরচ ও ক্রয়মূল্যের সাথে সম্মত মুনাফা যোগ করে মূল্য

---

১২. রকীব, আবদুর ও মোহম্মদ, শেখ, *ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব প্রয়োগ পদ্ধতি*, ঢাকা : আল-আমিন প্রকাশন, ২০০৪, পৃ. ৫৬

১৩. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

নির্ধারণপূর্বক বিক্রয় করে তাকে সাধারণ বায়' মুরাবাহা বলে।[১৪] এক্ষেত্রে বিক্রেতা পণ্য ক্রয়ে তার বিনিয়োজিত সমুদয় মূলধনের ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। সাধারণ বায়' মুরাবাহা প্রসঙ্গে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ম্যানুয়েল-এ উল্লেখ করা হয়েছে, "If there are only two parties, the seller and the buyer, where the seller as an ordinary trader purchases the goods from the market without depending on any order and promise to buy the same from him and sells those to a buyer for cost plus profit, then the sell is called Ordinary Bai-Murabaha."[১৫]

২. আদেশ ও প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতে বায়' মুরাবাহা (Bai-Murabaha on ordar and Promise) : আদেশ ও প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতে বায়' মুরাবাহা পদ্ধতিতে সাধারণত ক্রেতা, বিক্রেতা এবং মধ্যস্থতাকারী তিনটি পক্ষ থাকে। ক্রেতা যখন কোন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয়ের জন্য যায় কিন্তু তখন তার কাছে যদি ঐ পণ্য মজুদ না থাকে তবে তিনি অন্য কোন ব্যবসায়ী বা বিক্রেতার কাছ থেকে ঐ পণ্য সংগ্রহ / ক্রয় করে আগত ক্রেতার নিকট আনুসঙ্গিক খরচ ও ক্রয় মূল্যের সাথে সম্মত মুনাফা যোগ করে বিক্রয় করার প্রস্তাব দিতে পারে অথবা ঐ ক্রেতা ঐ নির্দিষ্ট পণ্য অন্য কোন ব্যবসায়ী বা বিক্রেতার কাছ থেকে সংগ্রহ/ক্রয় করে উপরোক্ত শর্তে তার কাছে বিক্রয় করার প্রস্তাবসহ ক্রয়ের অঙ্গীকার করে। যে বিক্রেতার কাছে উক্ত বর্ণনা অনুযায়ী মালের মজুদ থাকে না এবং অন্যের কাছ থেকে ক্রয় বা সংগ্রহ করে বিক্রয় করে সে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে।[১৬] বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সাধারণত বায়' মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে বায়' মুরাবাহা

ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে বায়' মুরাবাহা একটি সর্বজনগ্রাহ্য বহুল প্রচলিত বিনিয়োগ পদ্ধতি। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি সম্পূর্ণ বৈধ।[১৭] মূলত এ

---

১৪. রকীব, আবদুর ও মোহম্মদ, শেখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬; Test Book on Islamic Banking গ্রন্থে সাধারণ বায়' মুরাবাহার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "Ordinary Bai-Murabaha is a direct transanction between a buyer and seller. Here, the seller is an ordinary trader who purchases goods from the market in the hopes of selling these goods to another party for a profit." p.124

১৫. Manual for Investment under Bai Murabaha Mode, p.1

১৬. রকীব, আবদুর ও মোহম্মদ, শেখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭

১৭. Saad Al-Harran & Abdul Sattar, *Islamic Finance: Partnership Financing* Malaysia: Pelanduk Publication, 1996, p. 98; শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ*, রাজশাহী : ২০০৫, পৃ. ৮০

www.pathagar.com

পদ্ধতিকে "আমান" বা ন্যায়সঙ্গত বিক্রয় পদ্ধতিও বলা হয়।[১৮] কুরআন ও হাদীসে এ পদ্ধতির বৈধতার স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে শরীয়তের বিভিন্ন দলিলের ভাষ্য নিম্নরূপ–

আল-কিতাব

কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন– "হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না, তবে তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা করা বৈধ।"[১৯] অন্যত্র বলা হয়েছে– "তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে তোমাদের কোন পাপ নেই।"[২০] এ ছাড়া আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা সম্পর্কে বলেছেন– "আল্লাহ বেচা-কেনাকে হালাল করেছেন।"[২১] এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করাকে হালাল করেছেন। আর ক্রয় মূল্যের চেয়ে কিছু বেশি মূল্যে বিক্রয় করলে তখনই মুনাফা অর্জিত হবে। সুতরাং পারস্পরিক সম্মতিতে কিছু লাভের বিনিময়ে এ ধরনের কেনা-বেচা বৈধতারই প্রমাণ বহন করে।

আস-সুন্নাহ্

বায়' মুরাবাহা বৈধ হবার ব্যাপারে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মহানবী স. এ ধরনের বেচাকেনাকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। উরওয়া আল বারিকী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. আমাকে একটি বকরী খরিদ করার জন্য একটি দীনার প্রদান করেন। আমি দিনারটি দিয়ে তাঁর জন্য দুটো বকরী খরিদ করি এবং একটি এক দীনারে বিক্রি করে দেই, একটি বকরী ও একটি দীনার নিয়ে রসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট ফিরে আসি। অতঃপর উরওয়া আল-বারিকী রসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ স. তাকে বলেন, আল্লাহ তোমার ব্যবসায় বরকত দিন। বর্ণনাকারী আল-হাই বলেন, তিনি মাটি ক্রয় করলেও বরকত লাভ করতেন।[২২] অপর এক হাদীসে এসেছে, হাকীম ইবনে হিযাম রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ স. একটি কুরবানীর পশু খরিদ করার জন্য তাকে এক দীনার দিয়ে বাজারে পাঠালেন। তিনি এক দীনার দিয়ে একটি দুম্বা ক্রয় করলেন এবং সেটি দুই দীনারে বিক্রি করে গৃহে প্রত্যাবর্তন

---

১৮. আয-যুহাইলী ড. ওহাবা, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, প্রাগুক্ত, খ. ৪ পৃ. ৭০৩

১৯. আল-কুরআন, ৪ : ২৯ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

২০. আল-কুরআন, ২ : ১৯৮, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

২১. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

২২. আবূ দাউদ, ইমাম, *আস-সুনান*, অনু. ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : ফিল মুযারিবি ইউখালিফু, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭, খ. ৪, হাদীস নং-৩৩৫১, পৃ. ৩৬৯ عَنْ عُرْوَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيَّ قَالَ أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ كَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ

www.pathagar.com

করলেন। আবার গিয়ে এক দীনার দিয়ে একটি কুরবানীর পশু ক্রয় করলেন। অতঃপর পশু ও অতিরিক্ত এক দীনার রসূলুল্লাহ্ স.-কে এনে দিলেন। রসূলুল্লাহ্ স. ঐ দীনার দান করে দিলেন এবং তার ব্যবসায় বরকত হওয়ার জন্য দুআ করলেন।[২৩] উপরিউক্ত হাদীসদ্বয় থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি সম্পূর্ণ বৈধ। এছাড়া মুসলিম ফকীহ্ ও আলিমগণ এ ধরনের বেচাকেনাকে বৈধ বলে ফত্ওয়া দিয়েছেন। আল-কাসানী বলেছেন, মুরাবাহাসহ অপরাপর ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতি যুগ যুগ ধরে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোন মতানৈক্য ছাড়াই চলে আসছে।

বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি বৈধ হওয়ার শর্তাবলি

তবে এ পদ্ধতি বৈধ হওয়ার জন্য শরীয়তে কতগুলো শর্তারোপ করা হয়েছে- যার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ–[২৪]

১. ক্রয়-বিক্রয়ের জিনিস পণ্য হতে হবে। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য মুদ্রার অংকে না হয়ে পণ্যের অংকে (Commodity) হতে হবে। হাদীসে এসেছে, হুসাইন ইবনে আলী রা. বলেন, আলী রা. বলেছেন– (বদর যুদ্ধের) গণীমতের মাল থেকে আমার অংশের একটি উটনী ছিল এবং নবী স. তাঁর খুমুস্ থেকে একটি উটনী আমাকে দান করলেন। যখন আমি রসূলুল্লাহ্ স.-এর কন্যা ফাতিমা রা.-এর সঙ্গে ঘর বাঁধার ইচ্ছা করলাম, সে সময় আমি বনু কায়নুকা গোত্রের একজন স্বর্ণকারের সাথে এই চুক্তি করেছিলাম যে, ইযখির ঘাস আনতে যাবে সে আমার সঙ্গে (জংগলে) এবং তা অন্য স্বর্ণকারদের নিকট বিক্রয় করে উপার্জিত অর্থের সাহায্যে আমার বিবাহউত্তর ওলিমার অনুষ্ঠানের আয়োজন করব।[২৫]

---

২৩. তিরমিযী, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : আশ-শিরাউ ওয়াল বাইউল মাওকুফাইন, দিল্লী : মুখতার এ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮৫, খ. ১, পৃ. ২৩৮ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَأَرْبَحَ فِيهَا دِينَارًا فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا فَجَاءَ بِالْأُضْحِيَّةِ وَالدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ بِالشَّاةِ وَتَصَدَّقْ بِالدِّينَارِ

২৪. আশরাফী, মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯-২০০; খান, মাওঃ মোহাম্মদ ইসমাঈল, *ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ ও ব্যবসা*, ঢাকা : মীর পাবলিকেশন্স, ২০০১, পৃ. ৪৮-৪৯; Taqi Usmani, Ibid., pp. 105-7; Nicholas Dylan Ray, *Arab Islamic Banking and the Renewal of Islamic Law*, p. 41

২৫. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : মাকীলা ফিস-সাওয়াগ, আল কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১৬৩ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنْ الْمَغْنَمِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنْ

www.pathagar.com

২. বিক্রিত মালের মূল্য মুদ্রার অংকে অথবা অন্য কোন বস্তুর বিনিময়ে নির্ধারিত হবে। হাদীসে এসেছে, জাবির রা. বলেন, নবী স. উপযোগী হওয়ার আগে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এবং এও বলেছেন, এর কিছুই দীনার বা দিরহাম এর বিনিময় ব্যতীত বিক্রয় করা যাবে না। তবে 'আরায়্যার[২৬] হুকুম ব্যতিক্রম।[২৭]

৩. পণ্যের প্রকার ও তার পরিমাণ, গুণাগুণ, বিক্রয়মূল্য (Sale price) মুনাফা ইত্যাদি নির্দিষ্ট হতে হবে এবং ক্রেতাকে আলাদা আলাদাভাবে সব জানাতে হবে, নতুবা অস্পষ্টতা ও প্রতারণার সম্ভাবনা থাকবে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের বাণী, "হে আমার জাতি! তোমরা (মালামালের পরিমাণ, গুণাগুণ) পুরোপুরি ও ন্যায় সঙ্গতভাবে পরিমাপ কর এবং ওজন কর। তোমরা অপর কোন ব্যক্তির কোন জিনিসের ক্ষতি সাধন করো না এবং (ক্ষতি সাধন ও কম দেওয়ার মধ্য দিয়ে) দুনিয়ায় ফেৎনা-ফ্যাসাদ ফেরী করো না।"[২৮]

৪. কোন প্রকার টাকায়/ মুদ্রায় বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করবে তা চুক্তি পত্রে উল্লেখ থাকতে হবে। কেননা আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন– "যদি তারা ব্যবসায়িক কোন ব্যাপারে চুক্তি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে আপনিও সেদিকে আগ্রহী হন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করুন, নিঃসন্দেহে তিনি শ্রবণকারী ও সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত।"[২৯] এছাড়া হাদীসে এসেছে, হযরত ইবনে উমর রা. বলেন, "আমি বাকী' নামক স্থানে উট বিক্রয় করতাম। তখন আমি দীনারের হিসেবে বিক্রয় করে মূল্য গ্রহণের সময় দিরহাম নিতাম। এরূপে

الْخُمُسِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي

২৬. "আরায়্যা-এর অর্থ হল- কোন ব্যক্তি কাউকে কোন বৃক্ষ প্রদান করে, অথবা কোন ব্যক্তি তার বাগানের এক বা দু'টি গাছের ফল খাওয়ার জন্য আলাদাভাবে রেখে দেয়। এরপর তা শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করে। আবূ দাউদ, ইমাম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৬২-৬৩ الْعَرِيَّةُ الرَّجُلُ يُعْرِي النَّخْلَةَ أَوْ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ أَوْ الِاثْنَتَيْنِ يَأْكُلُهَا فَيَبِيعُهَا بِتَمْرٍ

২৭. বুখারী, ইমাম, আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬৯ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا

২৮. আল-কুরআন, ১১ : ৮৫, وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

২৯. আল-কুরআন, ৮ : ৬১, وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

www.pathagar.com

দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে মূল্য গ্রহণের সময় দীনার গ্রহণ করতাম। এরপর আমি রসূলাল্লাহ্ স.-এর নিকট উপস্থিত হই, তখন তিনি হাফসার ঘরে ছিলেন। আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! মেহেরবাণী করে বাইরে আসুন, আমি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আমি বাকী' নামক স্থানে বেচা-কেনা করি। আমি দীনারের বিনিময়ে পণ্য বিক্রয় করে মূল্য গ্রহণের সময় দিরহাম নেই, আবার কোন সময় দিরহামে বিক্রয় করে মূল্য গ্রহণের সময় দীনার গ্রহণ করি-এরূপ লেন-দেন বৈধ কি? তখন রসূলুল্লাহ্ স. বললেন, এতে কোন দোষ নেই, তবে শর্ত হলো বাজার দর অনুসারে লেন-দেন করবে এবং তোমরা দু'জন বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই ব্যাপারটি সম্পন্ন করবে।"[৩০]

৫. ক্রয়-বিক্রয়ের মাল অবশ্যই হালাল হতে হবে যা ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ নয়। যেমন আল-কুরআনের বাণী– "দরবেশ 'আলিমগণ কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে ও হারাম মাল ভক্ষণ করতে নিষেধ করেনা? অবশ্যই তারা খুবই মন্দ কাজ করছে।"[৩১] আল্লাহর বাণী– "আপনি বলে দিন পবিত্র এবং অপবিত্র (মাল) কখনই সমান হতে পারে না, যদিও অপবিত্র (মালের) প্রাচুর্য আপনাকে বিস্মিত করে। হে বুদ্ধিমানগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে করে তোমরা মুক্তি পেতে পার।"[৩২] অন্যত্র এসেছে– "তারা মিথ্যা কথা বলার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করে হারাম মাল ভক্ষণ করে সুতরাং যারা গুপ্তচরবৃত্তি করে ও হারাম মাল ভক্ষণ করে তারা যদি কোন বিষয়ে ফয়সালার জন্য আপনার কাছে আসে তাহলে আপনি তাদের সমাধানও করতে পারেন আবার নির্লিপ্তও থাকতে পারেন, এতে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"[৩৩] হাদীসে এসেছে, আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স.

---

৩০. আবূ দাউদ, ইমাম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৫৮-৫৯ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

৩১. আল-কুরআন, ৫ : ৬৩, لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

৩২. আল-কুরআন, ৫ : ১০০ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

৩৩. আল-কুরআন, ৫ : ৪২, سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

www.pathagar.com

বলেছেন– "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা মদ ও এর মূল্য গ্রহণকে হারাম করেছেন, মৃত জীব জন্তু ও এর মূল্য গ্রহণকে হারাম করেছেন এবং শুকর ও এর মূল্য গ্রহণকে হারাম করেছেন।"[৩৪]

৬. ক্রেতা-বিক্রেতার ইজাব ও কবুল দ্বারা চুক্তি সম্পাদিত হতে হবে। কারণ কোন ব্যক্তির কোন জিনিস বিক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ ব্যতীত এবং ক্রেতার ক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না। তবে ক্রেতা-বিক্রেতা একই মজলিশে উপস্থিত না হয়ে ইশারা বা কোন কাজের মাধ্যমেও ক্রয়-বিক্রয় এর সম্মতি জ্ঞাপন করতে পারে। হাদীসে এসেছে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আয়ুব বলেন, আবু যুর'আ রা. যখন কারো সাথে ক্রয়-বিক্রয় করতেন তখন তিনি তাকে ইখ্তিয়ার দিয়ে বলতেন, তুমিও আমাকে ইখ্তিয়ার প্রদান কর (যা ইজাব ও কবুল)। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রাকে বলতে শুনেছি যে, রসূলাল্লাহ্ স. বলেছেন– "ক্রেতা-বিক্রেতা রাজি হওয়ার আগে পৃথক হওয়া উচিত নয়।"[৩৫]

৭. বিক্রয়ের মালামাল (মা'কুদ 'আলাইহি) প্রয়োজনীয় ও উপকারী হওয়া আবশ্যক। হাদীসে এসেছে, "ইবনে উমরকে তেলের মধ্যে ইদুর পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তোমরা তা দিয়ে বাতি জ্বালাও এবং শরীরে মাখ। রসূলুল্লাহ্ স. মাইমুনার একটি মৃত নিক্ষিপ্ত বকরির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি বললেন, তোমরা কেন এর চামড়া খুলে নাওনি, অতপর তোমরা সেটাকে প্রক্রিয়াজাত করে তার দ্বারা উপকৃত হতে পারতে? তখন তারা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ্ এটাতো মৃত! তখন রসূলুল্লাহ্ স. বললেন, এটা খাওয়া হারাম (কিন্তু চামড়া, হাড় বেচা-কেনা ও ব্যবহার জায়েজ আছে)।"[৩৬]

৮. যে পণ্য বিক্রয় করা হবে তার বাস্তব উপস্থিতি থাকতে হবে (বায়' সালামের ক্ষেত্রে পৃথক মাসআলা)। হাদীসে এসেছে, হাকীম ইবনে হিযাম রা. বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ স.! যদি কেউ আমার কাছে উপস্থিত হয়ে এমন কোন কিছু ক্রয় করতে চায়, যা আমার কাছে নেই, তবে কি আমি তাকে সে জিনিস বাজার থেকে ক্রয় করে দিতে পারি? তখন তিনি বলেন, তোমার কাছে যা নেই তা তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে না।"[৩৭] সুতরাং বুঝা যায় পণ্যের বাস্তব উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

---

৩৪. আবূ দাউদ, ইমাম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪০৮ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮

৩৬. সাবিক, আস-সায়্যিদ, *ফিকহুস সুন্নাহ*, বায়ানুল বায়', বৈরুত: দারুল কুতুব আল-আরাবী, ১৯৮৭, খ. ৩, পৃ. ৯২

৩৭. আবূ দাউদ, ইমাম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪১৪ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

www.pathagar.com

৯. বিক্রয়ের মাল হস্তান্তর যোগ্য এবং ক্রেতার নিকট পরিচিত হতে হবে। যেমন হাদীসে এসেছে, ইবনে মাসউদ রা. বলেন, "তোমরা পানিতে বিচরণরত মাছ বেচা-কেনা করো না, কেননা এটা তোমাদের কাছে পুরোপুরি পরিচিত নয় ও তোমাদের হিসেবে নেই।[৩৮]

১০. বিক্রয়ের মাল অস্থাবর সম্পত্তি হলে এর উপর বিক্রেতার পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। কারণ অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে তা দখল করার পূর্বে বিক্রয় করা বৈধ নয়। যে মালে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি হয়েছে সে মালের উপর অন্য কারো মালিকানা থাকতে পারবে না। হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন– "যখন তোমাদের কেউ খাদ্য শস্য ক্রয় করে তখন সে যেন তার অধিকারে আনার পূর্বে বিক্রয় না করে। সুলাইমান ইবনে হারব রা. বলেন, পূর্ণভাবে গ্রহণ না করা পর্যন্ত। মুসাদ্দাদ আরো বাড়িয়ে বলেন, ইবনে আব্বাস রা. বলেন, প্রত্যেক জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম খাদ্য শস্য ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুমের মত।"[৩৯] অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের পর তা নিজের মালিকানায় আনার পূর্বে বিক্রয় করা উচিত নয়।

১১. ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি কোন নির্দিষ্ট সময়ের সীমার মধ্যে হতে পারবে না। একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে হলে তা শুদ্ধ হবে না। হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন– "নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ স. গর্ভস্থিত বাচ্চা প্রসবের মেয়াদের ওপর বিক্রয় নিষেধ করেছেন। এ এক ধরনের বিক্রয় যা জাহিলিয়াতের যুগে প্রচলিত ছিল। কেউ এই শর্তে উটনী ক্রয় করত যে, এই উটনীটি প্রসব করবে পরে ঐ শাবক আবার প্রসব করার পর তার মূল্য দেয়া হবে।"[৪০]

১২. ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতার নিকট মূল্য পরিশোধ এবং বিক্রেতা কর্তৃক মালামাল ক্রেতার মালিকানায় হস্তান্তরের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি কার্যকর করা যায়। আবু হুরায়রা রা. বলেন– "নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি না দেখে কোন কিছু ক্রয় করে তাহলে সেই মালামাল নেয়া ও না নেয়ার ব্যাপারে তার ইখ্তিয়ার থাকবে।"[৪১]

---

৩৮. সাবিক, আস-সায়্যিদ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৪

৩৯. আবূ দাউদ, ইমাম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪১২ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ زَادَ مُسَدَّدٌ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلُ الطَّعَامِ

৪০. বুখারী, ইমাম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫২ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

৪১. দারাকুতনি ও বায়হাকি, উদ্ধৃত, সাবিক, আস-সায়্যিদ, *ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯৭

www.pathagar.com

১১. ক্রয় বিক্রয় চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতাকে অবশ্যই বোধজ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের পরিণতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। তবে বালেগ হওয়া শর্ত নয়। হাদীসে এসেছে, আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন– "রসূলুল্লাহ্ স.-এর সময় জনৈক ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করত। কিন্তু তার জ্ঞান বুদ্ধি কম ছিল। তখন সে ব্যক্তির পরিবারের সদস্য রসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি অমুক ব্যক্তিকে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করে দেন। কেননা এ ব্যাপারে তার বুদ্ধি কম। তখন নবী স. সে ব্যক্তিকে ডেকে এনে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করে দেন।"[৪২] এছাড়া আল-কুরআনের বাণী, "অতপর ঋণ গ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় অর্থাৎ যদি বুদ্ধিমান না হয় এবং দুর্বল হয় অথবা নিজে শর্ত লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয় তাহলে তার পক্ষে একজন অভিভাবক প্রদান করবে যিনি ন্যায় সঙ্গতভাবে শর্তসমূহ লিখে দিবে।"[৪৩]

১২. এ পদ্ধতিতে মালের প্রকৃতি, পরিমাণ, গুণাগুণ, বিক্রয়মূল্য ইত্যাদি পরিশোধের সময়সীমা সুনির্দিষ্ট হতে হবে। "হাকীম ইবনে হিযাম রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের ইখ্‌তিয়ার থাকে। যদি তারা সততার সাথে তা সম্পন্ন করে এবং বিক্রিত মালের দোষ-গুণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে, তবে এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ে তাদের উপর বরকত হবে। পক্ষান্তরে যদি তারা তা গোপন করে এবং মিথ্যা বলে, তবে তাদের বেচা-কেনার বরকত দূর হয়ে যাবে।"[৪৪] অন্য হাদীসে এসেছে, ইবনে আব্বাস রা. বলেন– "নবী করিম স. (মদীনায়) আসেন এবং বলেন, নির্দিষ্ট মাপে, নির্দিষ্ট ওজনে ও নির্দিষ্ট মেয়াদে (সলম) কর।"[৪৫]

১৩. প্রথম বেচাকেনাটি অর্থাৎ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং সরবরাহকারীর (Supplier) সাথে ক্রয়-বিক্রয়টি বিশুদ্ধ হতে হবে। এক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের সকল শর্তাবলি পালন করতে হবে। এটি বাতিল বা ফাসিদ হতে পারবে না।

---

৪২. আবূ দাউদ, ইমাম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪১৩ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَتَاعُ وَفِي عَقْدَتِه ضَعْفٌ فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِيَّ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّه احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ فَإِنَّهُ يُبَتَاعُ وَفِي عَقْدَتِه ضَعْفٌ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْ الْبَيْعِ

৪৩. আল-কুরআন, ২ : ২৮২, فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

৪৪. আবূ দাউদ, ইমাম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৯৮-৯৯ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا

৪৫. বুখারী, ইমাম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৯৮ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

www.pathagar.com

১৪. বায়' মুরাবাহা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষ (ব্যাংক) এবং পণ্য বিক্রেতার (যার নিকট থেকে ব্যাংক মাল ক্রয় করে) সাথে ক্রয়-বিক্রয়টি নগদ মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে সম্পন্ন হতে হবে।

১৫. প্রথম বেচাকেনাটি সুদ হয় এমন সমজাতীয় বস্তুর বিনিময়ে হতে পারবে না। হাদীসে এসেছে, "ওবাদাহ ইবনে সামিত রা. বলেন রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ লেনদেন করা হলে সেক্ষেত্রে পরিমাণে সমান সমান এবং হাতে হাতে আদান প্রদান করতে হবে। তবে ভিন্ন জাতীয় বস্তুর পরস্পরের সাথে বিনিময়ের ক্ষেত্রে পরিমাণে যেরূপ ইচ্ছে করতে পার কিন্তু হাতে হাতে বিনিময় হতে হবে।"[৪৬] অন্য হাদীসে এসেছে, "আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ লেনদেন করা হলে সেক্ষেত্রে পরিমাণে সমান সমান এবং হাতে হাতে আদান প্রদান করতে হবে। যে ব্যক্তি বেশি দিবে বা বেশি গ্রহণ করবে সে সুদী লেনদেনকারী সাব্যস্ত হবে। এক্ষেত্রে সুদ গ্রহীতা ও দাতা উভয়েই সমান অপরাধী সাব্যস্ত হবে।"[৪৭]

ইসলামী ব্যাংকিং-এ বায়' মুরাবাহা বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ[৪৮]

১. এ পদ্ধতিতে তিনটি পক্ষ থাকে- ব্যাংক, পণ্য বিক্রেতা (যার পক্ষ থেকে ব্যাংক মাল ক্রয় করে) এবং পণ্য ক্রেতা বা বিনিয়োগ গ্রাহক (যার নিকট ব্যাংক মাল বিক্রয় করে)।

২. বিনিয়োগ গ্রাহক ব্যাংকের নিকট থেকে তার চাহিদানুযায়ী মাল ক্রয়ের অঙ্গীকারসহ উক্ত নির্ধারিত মাল ক্রয়পূর্বক তার নিকট বিক্রয় করার জন্য ব্যাংককে অনুরোধ করে।

---

৪৬. মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ, অধ্যায় :* আল-মুসাকাত, অনুচ্ছেদ : আস-সারফ ওয়া বাইউয-যাহাবি বিল ওয়ারিকি নাকদান, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ৯৫৩; عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

৪৭. মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৯৭১ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

৪৮. মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ১৪৪-১৪৫; রকীব, আবদুর ও মোহম্মদ, শেখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮; এ.এ.এম. হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : প্রকাশিকা, হেলেনা পারভীন, ২০০৪, পৃ. ১৬৬-৬৭; ইকবাল কবীর মোহন, *আধুনিক ব্যাংকিং*, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৩, পৃ. ১২৫-২৬; আশরাফী, মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংক কি কেন কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

www.pathagar.com

৩. এই পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের অনুরোধের ভিত্তিতে কৃষি ও শিল্পসহ বিভিন্ন উপকরণ, ভোগ্যপণ্য ও মালামাল ক্রয় করে গ্রাহকের নিকট তা লাভে বিক্রয় করে।

৪. বিনিয়োগ গ্রাহককে অঙ্গীকার অনুযায়ী ব্যাংকের নিকট থেকে মাল ক্রয় করে নিতে হয়; অন্যথায় ব্যাংককে ক্ষতিপূরণ দিতে বিনিয়োগ গ্রাহক বাধ্য থাকে।

৫. বায়' মুরাবাহা অর্থাৎ লাভে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতা (ব্যাংক) অঙ্গীকার পালনে বাধ্য করার অথবা অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে নগদ/সহায়ক জামানতসহ যে কোন ধরনের জামানত (Mortagage) নিতে পারবে।

৬. বিক্রেতা বন্ধকী জিনিস ব্যবহার করতে পারবে না এবং ব্যবহার করার শর্তও করতে পারবে না, শুধু দেনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত নিজের দখলে রাখতে পারবে।

৭. বন্ধকী জিনিস বিক্রেতার (বন্ধক গ্রহীতার) নিকট সম্পূর্ণ বা আংশিক নষ্ট হলে এর দায় দায়িত্ব বিক্রেতাকে (বন্ধক গ্রহীতাকে) বহন করতে হবে।

৮. বন্ধকী মাল স্থাবর সম্পত্তি হলে এবং তা চুক্তি মোতাবেক ক্রেতার (বন্ধকদাতার) তত্ত্বাবধানে থাকলে, ক্রেতা (বন্ধকদাতা) বন্ধক গ্রহীতার অনুমতি সাপেক্ষে চুক্তি মোতাবেক বন্ধকী জিনিস নিয়ে মুনাফা অর্জন করতে পারে এবং ক্ষতি সাধিত হলে এর দায় দায়িত্ব ক্রেতাকে (বন্ধকদাতাকে) বহন করতে হবে। তবে ক্রেতা (বন্ধকদাতা) বন্ধকী জিনিস বিক্রয় করতে পারবে না, করলে তা অবৈধ হবে।

৯. বিক্রয় মূল্য পরিশোধের পূর্বে বন্ধকদাতার মৃত্যু হলে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকলব্ধ মাল পাওয়ার অধিক হকদার বলে বিবেচিত হবে। তবে বন্ধকলব্ধ মালের মূল্য যদি পাওনা টাকার চেয়েও বেশি হয় তাহলে অতিরিক্ত অর্থ বন্ধকগ্রহীতা মৃতের উত্তরাধিকারীগণের নিকট ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। আর যদি বন্ধক লব্ধ মালের মূল্য পাওনা টাকার চেয়ে কম হয় তাহলে যত টাকা কম হবে তা মৃতের উত্তরাধিকারীগণ মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। কারণ তা মৃতের ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।

১০. মৃতের উত্তরাধিকারীগণ বন্ধক গ্রহীতার (ব্যাংক) পাওনা টাকা পরিশোধ করে বন্ধককৃত জিনিস ছাড় করিয়ে নিতে পারবে এবং বন্ধকগ্রহীতা ও তা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে।

১১. বিনিয়োগ গ্রাহকের প্রস্তাব বিবেচনার আগে তার ব্যবসায়িক যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিশ্বস্ততা, সুনাম ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যাংক খোঁজ-খবর নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে।

১২. বিনিয়োগ গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী মালামাল ক্রয়ের পূর্বে বাজারে মালের কাটতি, মূল্য, সম্ভাব্য মুনাফা ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যাংক খোঁজ-খবর নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে।

১৩. বায়' মুরাবাহা চুক্তি সম্পাদনের সময় মালের অস্তিত্ব থাকতে হবে এবং ক্রয়যোগ্য হতে হবে।

www.pathagar.com

১৪. বায়' মুরাবাহা চুক্তিতে ক্রয় মূল্যের সাথে লাভ যুক্ত করে পণ্য বিক্রয় করা হয় বিধায় চুক্তি সম্পাদনের পর পণ্য হস্তান্তরের আগে মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলে তার ক্রয় মূল্যের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন করা যাবে না।

১৫. বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট মালামাল বিক্রয় এবং সরবরাহের পূর্ব পর্যন্ত মালামালের যাবতীয় ঝুঁকি ব্যাংক বহন করে। বিক্রয় এবং সরবরাহ সম্পন্ন হওয়ার পর যাবতীয় ঝুঁকি বিনিয়োগ গ্রাহকের।

১৬. চুক্তি অনুযায়ী মালামাল বিনিয়োগ গ্রাহক কিংবা তার প্রতিনিধিকে নির্দিষ্ট তারিখে এবং নির্ধারিত স্থানে সরবরাহ করতে হয়।

১৭. ব্যাংক ক্রয়মূল্যের সাথে লাভ যোগ করে মালামাল বিক্রয় করে। ক্রয়মূল্য এবং লাভ স্পষ্টভাবে চুক্তিপত্রে উল্লেখ করতে হয়।

১৮. পণ্যের ক্রয়-মূল্যের সাথে পরিবহণ ও আনুসঙ্গিক খরচ যোগ করে মোট ক্রয়-মূল্য নির্ধারণ করা হয়। ব্যাংক এই ক্রয়-মূল্যের উপর চুক্তিকৃত লাভ যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের কাছে পণ্যের ক্রয়মূল্য, লাভের পরিমাণ এবং আনুসঙ্গিক খরচ ক্রেতাকে জানাতে কিংবা চুক্তিপত্রে উল্লেখ করতে বাধ্য।

১৯. চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি করা যায় না।

২০. ব্যাংক ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে মালামাল ক্রয় করতে পারে।

২১. গ্রাহক চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে মালের নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করে।

২২. এ পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পাওনা টাকার তাগাদা করতে পারে না।

২৩. গ্রাহকের আর্থিক অভাবের কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে এবং বিক্রেতা ক্রেতাকে পরিশোধের সময়সীমা বাড়িয়ে দিলে তা বৈধ হবে।

২৪. মূল্য পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হলে অতিরিক্ত সময়ের জন্যে বিক্রিত মালের উপর অতিরিক্ত কোন মুনাফা ধার্য করা কিংবা বিক্রয় মূল্য বাড়িয়ে দেয়া যাবে না। বায়' মুরাবাহা পদ্ধতিতে একবার বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হলে তা আর বৃদ্ধি করা যাবে না। কারণ ক্রেতার নিকট মালের মূল্য ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। আর ঋণের উপর অতিরিক্ত কিছু আদায় করার অর্থ হচ্ছে সুদ আদায় করা।

২৫. ক্রেতা যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিক্রেতার পাওনা টাকা (বিক্রয় মূল্য) পরিশোধ না করে কিংবা পাওনা পরিশোধে টালবাহানা করে তাহলে বিক্রেতা (ব্যাংক) ক্রেতার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করতে পারবে।

২৬. ব্যাংক নির্ধারিত পণ্য সামগ্রী বায়' মুরাবাহা চুক্তির অধীনে অবশ্যই ব্যাংকের নামে ক্রয় করে তার উপর পূর্ণ মালিকানা নিশ্চিত করার পর বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে এবং সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে গ্রাহককে উক্ত পণ্য সরবরাহ করে।

২৭. চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংক মালামাল সংরক্ষণের জন্য গুদাম ভাড়া, গোডাউন গার্ডদের বেতন, বীমার প্রিমিয়াম ইত্যাতি খরচ আনুপাতিক হারে বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে আদায় করতে পারে।

www.pathagar.com

২৮. তবে এ পদ্ধতিতে জমি কিংবা অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করার পর তা দখল করার পূর্বেই বিক্রয় করা যাবে।
২৯. বিনিয়োগ গ্রাহক সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে সব মালামাল এক সাথে সরবরাহ নিতে পারে, আবার কিস্তিতে আনুপাতিক মূল্য পরিশোধ করে আংশিক মালামালও নিতে পারে।
৩০. চুক্তির নিয়ম অনুসারে গ্রাহক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মালামালের সরবরাহ নিতে ও মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে।
৩১. চুক্তিপত্রে বায়' মুরাবাহা নীতিমালার পরিপন্থী কোন শর্তারোপ করা যাবে না।
৩২. বিক্রয় চুক্তির শর্তাবলি কার্যকর হয়ে যাবার পর আর কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন অনুমোদযোগ্য নয়।

ইসলামী ব্যাংকিং-এ বায়' মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতির প্রায়োগিক সমস্যা-সমাধানে ব্যাংকার ও গ্রাহকগণের দৃষ্টিভঙ্গি

ঢাকায় অবস্থিত ৬টি ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২৫টি শাখা, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর ১৩টি শাখা, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড(সাবেক দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড)-এর ১১টি শাখা, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর ১০টি শাখা, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড-এর ৯টি শাখা ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর ৩টি শাখা সর্বমোট ৭১টি শাখা এবং ব্যাংকগুলোর সর্বমোট ৫৭ জন গ্রাহকের ওপর জরিপ চালিয়ে এ তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল হিসেবে সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং আবদ্ধ ও উন্মুক্ত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় সম্পাদনার পর সাংকেতীকরণের (Coding) মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত যথাযথভাবে সারণীবদ্ধ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

সারণী-১ : বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকারের বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণ সংক্রান্ত তথ্যের সারণী

গৃহীত বিনিয়োগ পদ্ধতি	গণসংখ্যা (N=৭১) *	শতকরা (%) হার
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকার বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণ করে	৬৪	৯০.১৪
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকার বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণ করে না	৭	৯.৮৬

* N= গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যা।

আলোচিত সারণী বিশ্লেষণের মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায়, ৭১টি শাখার মধ্যে ৬৪টি শাখা অর্থাৎ ৯০.১৪ শতাংশ শাখা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং ৯.৮৬ শতাংশ শাখা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুসরণ করে না।

www.pathagar.com

সারণী-২ : বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় কিনা সে সংক্রান্ত তথ্যের বিবরণী

উত্তরের ধরন	গণসংখ্যা (N=৬৪)	শতকরা (%) হার
বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়	৬০	৯৩.৭৫
বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয় না	৪	৬.২৫

উল্লিখিত সারণীতে (সারণী-২) পরিলক্ষিত হয়, ব্যাংকারদের শতকরা ৯৩.৭৫ জনের মতে বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তারা কোন না কোন সমস্যা লক্ষ্য করেছেন। ব্যাংকারদের শতকরা ৬.২৫ জন এ পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সারণী-৩ : বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় সে সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

সমস্যার ধরন	গণসংখ্যা (N=৬৪)	শতকরা (%) হার
শাখার জনবল কম এবং শাখায় পৃথক কোন ক্রয় বিভাগ না থাকায় অফিসারদের পক্ষে সরাসরি সরবরাহকারীর নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করতে সমস্যা হয়	৫২	৮১.২৫
বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রাহকের অস্বচ্ছ ধারণা	৫২	৮১.২৫
ব্যাংকার সরাসরি ব্যবসায়ী না হওয়ায় ক্ষেত্র বিশেষ গ্রাহকের কাঙ্ক্ষিত পণ্যের গুণগতমান ও প্রকৃত বাজার দর যাচাই করা সম্ভব হয় না	৪৫	৭০.৩১
মুরাবাহার মালমাল ব্যাংকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় বিধায় এ পদ্ধতিতে শরয়ী শর্তাবলি পালন সাপেক্ষে বিনিয়োগ ও তত্ত্বাবধান করা সহজ হয় না	৩৭	৫৭.৮১
মালামাল মজুদের জন্য পর্যাপ্ত, সুনিয়ন্ত্রিত ও উপযুক্ত গুদাম (Godown) সংকট	৪২	৬৫.৬৩
গ্রাহকের নামে বারবার Delivery Order ইস্যু করতে হয় এবং একই দিনে একাধিকবার পণ্য সরবরাহ/ বিতরণ করতে হয়	৪৫	৭০.৩১
গ্রাহক বায়' মুরাবাহা চুক্তির নিয়ম পালনে অনাগ্রহী	৪৫	৭০.৩১
সরবরাহকারী (Supplier) নগদ ব্যতীত পেমেন্ট অর্ডার / ড্রাফট গ্রহণ করতে চায় না	৪১	৬৪.০৬

www.pathagar.com

গুদাম ও পণ্যের যথাযথ Monitoring বা তদারকি কষ্টকর	৩৬	৫৬.২৫
Godown Guard ও Keeper-এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কষ্টকর	৩৮	৫৯.৩৮
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ ও নিবেদিত ইসলামী ব্যাংকারের অভাব	৩৫	৫৪.৬৯
Classified A/C বা Overdue A/C-এর ক্ষেত্রে ব্যাংক লাভবান হচ্ছে না (Compensation লাভ হিসেবে গ্রহণ করতে না পারায়)	৩৩	৫১.৫৬
Classified A/C Holdar-বা ঋণ খেলাফীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতা ও এ ক্ষেত্রে পুনরায় অর্থ ব্যয়	৩১	৪৮.৪৪
উন্নত দেশসমূহের তুলনায় আমাদের দেশে ব্যবসায়িক পরিবেশ (Business Environment) ও গ্রাহকের ব্যাংকিং লেনদেনে প্রতিশ্রুতি (Commitment in banking transaction) রক্ষা করার মানসিকতার অভাব	৩২	৫০.০০
উপযুক্ত, পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং আইনের অভাবে ব্যাংক সরাসরি পণ্য আমদানি (Import) করতে পারে না	৪৬	৭১.৮৮
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং উইং ও এর Monitoring বা তদারকির অভাব	৩৮	৫৯.৩৮
শক্তিশালী, যথোপযুক্ত ক্ষমতা প্রয়োগকারী সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের অভাব	২৭	৪২.১৯
অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) **	১৩	২০.৩১

* গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যা কর্তৃক একাধিক উত্তর প্রদানের কারণে মোট শতকরা হার ১০০ এর বেশি ।

** গ্রাহক কর্তৃক পণ্যের মূল্য বেশি দেখান, অসততার মাধ্যমে একই চালানে দামি পণ্যের মধ্যে কম মূল্যের পণ্য ঢুকিয়ে দেয়া, নিম্নমানের পণ্য গুদামজাত করা, একই সাথে ব্যাংকারের দ্বৈত (ব্যাংকার ও ব্যবসায়ী) ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া কষ্টকর এবং জটিলতা এড়ানোর জন্য গ্রাহক ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে পণ্য মজুদ / সংরক্ষণে অনাগ্রহী।

উপরের সারণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শতকরা ৪০-৬০ জন ব্যাংকার, শক্তিশালী, যথোপযুক্ত ক্ষমতা প্রয়োগকারী স্বাধীন সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের অভাব, Classified A/C Holdar-বা ঋণ খেলাফীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা ও এ ক্ষেত্রে পুনরায় অর্থ ব্যয়, উন্নত দেশসমূহের তুলনায় আমাদের দেশে ব্যবসায়িক পরিবেশ (Business Environment) ও গ্রাহকের ব্যাংকিং লেনদেনে প্রতিশ্রুতি (Commitment in banking transaction) রক্ষা করার মানসিকতার অভাব, Classified A/C বা Overdue A/C-এর ক্ষেত্রে ব্যাংক লাভবান হচ্ছে না (Compensation লাভ হিসেবে গ্রহণ করতে না পারায়), প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ

www.pathagar.com

ও নিবেদিত ইসলামী ব্যাংকারের অভাব, গুদাম ও পণ্যের যথাযথ Monitoring বা তদারকি কষ্টকর, Godown Guard ও Keeper-এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কষ্টকর, মুরাবাহার মালমাল ব্যাংকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় বিধায় এ পদ্ধতিতে শারয়ী শর্তাবলী পালন সাপেক্ষে বিনিয়োগ ও তত্ত্বাবধান করা সহজ হয় না এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং উইং ও এর Monitoring বা তদারকির অভাবকে সর্বনিম্নমাত্রার সমস্যা হিসেবে সনাক্ত করেছেন। অন্যদিকে শতকরা ৬০-৮০ জন ব্যাংকার, সরবরাহকারী (Supplier) নগদ ব্যতীত পেমেন্ট অর্ডার / ড্রাফট গ্রহণ করতে চায় না, মালামাল মজুদের জন্য পর্যাপ্ত, সুনিয়ন্ত্রিত ও উপযুক্ত গুদাম (Godown) সংকট, দায়িত্বশীল, ব্যাংকার সরাসরি ব্যবসায়ী না হওয়ায় ক্ষেত্রে বিশেষ গ্রাহকের কাঙ্ক্ষিত পণ্যের গুণগতমান ও প্রকৃত বাজার দর যাচাই করা সম্ভব হয় না, গ্রাহক বায়' মুরাবাহা চুক্তির নিয়ম পালনে অনাগ্রহী, উপযুক্ত ও পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং আইনের অভাবে ব্যাংক সরাসরি পণ্য আমদানি (Import) করতে না পারাকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চমাত্রার সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া সর্বোচ্চ শতকরা ৮১.২৫ জন ব্যাংকার, শাখার জনবলের স্বল্পতা হেতু পৃথক কোন ক্রয় বিভাগ না থাকায় ব্যাংকের পক্ষে পণ্য সরবরাহকারীর নিকট থেকে সরাসরি পণ্য ক্রয় করা যায় না এবং বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রাহকের অস্বচ্ছ ধারণাকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

সারণী-৪ : বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার সম্ভাব্য সমাধান সংক্রান্ত মতামত

সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়	গণসংখ্যা (N=৬৪)	শতকরা (%) হার
শাখায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল বৃদ্ধি করা এবং পৃথক ক্রয় বিভাগ (Purchase Cell) গঠন করে সরাসরি মাল ক্রয় করে বিনিয়োগ গ্রহীতার নিকট বিক্রয় নিশ্চিত করা	৫১	৭৯.৬৯
গ্রাহক সমাবেশ, ব্যক্তিগত আলাপচারিতা ইত্যাদির মাধ্যমে বায়' মুরাবাহা সম্পর্কে গ্রাহককে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করা	৫১	৭৯.৬৯
কোটেশন কিংবা টেলিফোনের মাধ্যমে যথাসম্ভব গ্রাহকের কাঙ্ক্ষিত পণ্যের গুণগতমান ও প্রকৃত বাজার দর যাচাই করা	৫১	৭৯.৬৯
এ পদ্ধতিতে যেহেতু পণ্য ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে থাকবে সেহেতু ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট তত্ত্বাবধানের (Monitoring) ব্যবস্থা করা	৪৪	৬৮.৭৫
মালামাল মজুদের জন্য পর্যাপ্ত, সুনিয়ন্ত্রিত ও উপযুক্ত গুদামের (Godown) ব্যবস্থা করা	৪৫	৭০.৩১

www.pathagar.com

ব্যাংক ও গ্রাহকের সমঝোতার ভিত্তিতে মাল ডেলিভারীর জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা	৪৫	৭০.৩১
উদ্বুদ্ধকরণের (Motivation) মাধ্যমে গ্রাহককে বায়' মুরাবাহা চুক্তির নিয়ম পালনে আগ্রহী করা	৫০	৭৮.১৩
নগদ টাকার পরিবর্তে উন্নত দেশসমূহের মত ডেবিট কার্ড / ক্রেডিট কার্ড / ক্যাশ কার্ড ইত্যাদি ব্যবহারের মানসিকতার অনুরূপ কালচার এদেশে উন্নয়ন করা	৪১	৬৪.০৬
ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও নিবেদিত ইসলামী ব্যাংকার তৈরি করা	৪৫	৭০.৩১
ব্যাংকের Central Godown-এর ব্যবস্থা করা	৩৯	৬০.৯৪
সৎ ও দক্ষ Godown Guard ও Keeper-এর নিয়োগ, চাকুরী স্থায়ীকরণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা	৩৮	৫৯.৩৮
Overdue Account-নিয়মিতকরণে দেশের সরকারসহ সকলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো	৩০	৪৬.৮৮
ঋণ খেলাফীদের বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালতের বিচার ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল ও সংক্ষিপ্তকরণের মাধ্যমে Defaulted fund এর Recovery তরান্বিত করা ও এ ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় হ্রাস করা	৩০	৪৬.৮৮
উন্নত দেশসমূহের ন্যায় আমাদের দেশে ব্যবসায়িক পরিবেশ (Business Environment) ও গ্রাহকের ব্যাংকিং লেনদেনে প্রতিশ্রুতি (Commitment in banking transaction) রক্ষা করার মানসিকতা উন্নয়ন করা	৩২	৫০.০০
উপযুক্ত, পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং আইন প্রণয়ন করা	৪৭	৭৩.৪৪
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং উইং ও এর মাধ্যমে তদারকি (Monitoring) নিশ্চিত করা	৪০	৬২.৫০
শক্তিশালী, যথোপযুক্ত ক্ষমতা প্রয়োগকারী সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের তত্ত্বাবধান (Suppervision) নিশ্চিত করা	২৯	৪৫.৩১
অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) **	৫	৭.৮১

* গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যা কর্তৃক একাধিক উত্তর প্রদানের কারণে মোট শতকরা হার ১০০ এর বেশি ।

** সৎ গ্রাহক নির্বাচন করা, কর্মকর্তাদের শরীয়াহ্ বিষয়ে আরো সচেতন হওয়া।

www.pathagar.com

উপরিউক্ত সারণী বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যায়, বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় তার সম্ভাব্য সমাধানে শতকরা ৪০-৬০ জন ব্যাংকার, শক্তিশালী, যথোপযুক্ত ক্ষমতা প্রয়োগকারী সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের তত্ত্বাবধান (Suppervision) নিশ্চিত করা, Overdue Account-নিয়মিতকরণে দেশের সরকারসহ সকলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো, ঋণ খেলাফীদের বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালতে বিচার ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল ও সংক্ষিপ্তকরণের মাধ্যমে Defaulted fund এর Recovery ত্বরান্বিত করা ও এ ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় হ্রাস করা এবং সৎ ও দক্ষ Godown Guard ও Keeper-এর নিয়োগ, চাকুরী স্থায়ীকরণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে সুপারিশ করেছেন। অন্যদিকে শতকরা ৬০-৭৫ জন ব্যাংকার, যথাক্রমে ব্যাংকের Central Godown-এর ব্যবস্থা করা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং উইং ও এর মাধ্যমে তদারকি (Monitoring) নিশ্চিত করা, নগদ টাকার পরিবর্তে উন্নত দেশসমূহের মত ডেবিট কার্ড / ক্রেডিট কার্ড / ক্যাশ কার্ড ইত্যাদি ব্যবহারের মানসিকতার অনুরূপ কালচার এদেশে উন্নয়ন করা, এ পদ্ধতিতে যেহেতু পণ্য ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে থাকবে সেহেতু ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট তত্ত্বাবধায়নের (Monitoring) ব্যবস্থা করা, মালামাল মজুদের জন্য পর্যাপ্ত, সুনিয়ন্ত্রিত ও উপযুক্ত গুদামের (Godown) ব্যবস্থা করা, ব্যাংক ও গ্রাহকের সমঝোতার ভিত্তিতে মাল ডেলিভারির জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা, ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও নিবেদিত ইসলামী ব্যাংকার তৈরি করা এবং উপযুক্ত, পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং আইন প্রণয়ন করার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। শতকরা ৭৮.১৩ জন ব্যাংকার, উদ্বুদ্ধকরণের (Motivation) মাধ্যমে গ্রাহককে বায়' মুরাবাহা চুক্তির নিয়ম পালনে আগ্রহী করার কথা বলেছেন। এছাড়া সর্বোচ্চ শতকরা ৭৯.৬৯ জন ব্যাংকার, প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল বৃদ্ধি করে শাখায় পৃথক ক্রয় বিভাগ (Purchase Cell) গঠন করত সরাসরি মাল ক্রয় করে বিনিয়োগ গ্রহীতার নিকট বিক্রয় নিশ্চিত করা ও কোটেশন কিংবা টেলিফোনের মাধ্যমে যথাসম্ভব গ্রাহকের কাঙ্ক্ষিত পণ্যের গুণগতমান ও প্রকৃত বাজার দর যাচাই করার জন্য তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সারণী-৫ : বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণ সংক্রান্ত তথ্যের সারণী

গৃহীত বিনিয়োগ পদ্ধতি	গণসংখ্যা (N=৫৭)*	শতকরা %) হার
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহক বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণ করে	৩৬	৬৩.১৬
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহক বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণ করে না	২১	৩৬.৮৪

* N = গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যা।

www.pathagar.com

আলোচিত সারণী বিশ্লেষণের মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায়, ৫৭ জন গ্রাহকের মধ্যে ৩৬ জন অর্থাৎ ৬৩.১৬ শতাংশ গ্রাহক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং ৩৬.৮৪ শতাংশ গ্রাহক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুসরণ করে না।

সারণী-৬ : বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় কিনা সে সংক্রান্ত তথ্যের বিবরণী

উত্তরের ধরন	গণসংখ্যা N=৩৬)	শতকরা %) হার
বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়	৩৬	১০০
বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না	০	০

উল্লিখিত সারণীতে (সারণী-৬) পরিলক্ষিত হয়, গ্রাহকদের শতকরা ১০০ জনের মতে বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তারা কোন না কোন সমস্যা লক্ষ্য করছেন।

সারণী-৭ : বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় সে সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

সমস্যার ধরন	গণসংখ্যা (N=৩৬)	শতকরা %) হার
ব্যাংকের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দীর্ঘসূত্রিতা	২৭	৭৫
ব্যাংকারের আন্তরিকতার অভাব	১৮	৫০
ব্যাংকারের ক্রয়-বিক্রয়ে সম্পাদিত শরয়ী চুক্তি সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণা	২৭	৭৫
অগ্রিম খালি ও তারিখবিহীন চুক্তিপত্রে এবং Blank চেকে স্বাক্ষর প্রদান	২৭	৭৫
ব্যাংকার সরবরাহকারীর নিকট থেকে নিজে পণ্য ক্রয় করে গ্রাহককে সরবরাহ করতে আগ্রহী নয়	২৬	৭২.২২
ব্যাংকার পণ্যের মালিকানা অর্জনের পূর্বেই গ্রাহককে তা সরবরাহ করে	২৬	৭২.২২

www.pathagar.com

ব্যাংক নগদ জামানত/সহায়ক জামানতের শর্তারোপ করে	২৯	৮০.৫৬
মাল রাখার জন্য ব্যাংকের নিজস্ব গোডাউন এবং মাল আনা নেয়ার জন্য নিজস্ব পরিবহণের অপর্যাপ্ততা	২৯	৮০.৫৬
অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) **	৯	২৫

* গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যা কর্তৃক একাধিক উত্তর প্রদানের কারণে মোট শতকরা হার ১০০ এর বেশি ।

** গ্রাহক কর্তৃক পণ্য বুঝে পাওয়ার পূর্বের ঝুঁকি ব্যাংকের থাকার কথা থাকলেও তা গ্রাহককে বহণ করতে হয়, ব্যাংক পণ্য গ্রাহকের নিকট হস্তান্তরের পূর্বে তার নামে বিনিয়োগ দায় সৃষ্টি করে।

উপরের সারণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শতকরা ৮০.৫৬ জন গ্রাহক, যথাক্রমে মাল রাখার জন্য ব্যাংকের নিজস্ব গোডাউন এবং মাল আনা-নেয়ার জন্য নিজস্ব পরিবহণের অপর্যাপ্ততা ও ব্যাংক নগদ জামানত/সহায়ক জামানতের শর্তারোপ করাকে বায়' মুরাবাহা পদ্ধতির সর্বোচ্চমাত্রার সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে শতকরা ৭৫ জন গ্রাহক, ব্যাংকারের ক্রয়-বিক্রয়ে সম্পাদিত শরয়ী চুক্তি সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণা, ব্যাংকের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দীর্ঘসূত্রিতা, ও অগ্রিম খালি ও তারিখবিহীন চুক্তিপত্রে এবং Blank চেকে স্বাক্ষর প্রদানকে বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে সমস্যা হিসেবে সনাক্ত করেছেন। এছাড়া শতকরা ৭২.২২ জন গ্রাহক, ব্যাংকার সরবরাহকারীর নিকট থেকে নিজে পণ্য ক্রয় করে গ্রাহককে সরবরাহ করতে আগ্রহী নয় ও ব্যাংকার পণ্যের মালিকানা অর্জনের পূর্বেই গ্রাহককে তা সরবরাহ করে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া শতকরা ৫০ জন গ্রাহক, ব্যাংকারের আন্তরিকতার অভাবকে সর্বনিম্ন মাত্রার সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

সারণী-৮ : বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার সম্ভাব্য সমাধান সংক্রান্ত মতামত

সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়	গণসংখ্যা (N=৩৬)	শতকরা (%) হার
ব্যাংকের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা দূর করা	২৭	৭৫
ব্যাংক কর্মকর্তাদের অধিক আন্তরিক হওয়া	১৮	৫০

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ে সম্পাদিত চুক্তির শরয়ী শর্তাবলি সম্পর্কে ব্যাংক কর্মকর্তাদের স্বচ্ছ ধারণা প্রদান	২৭	৭৫
অগ্রিম কাগজপত্রে ও Blank চেকে স্বাক্ষর নেয়ার পরিবর্তে প্রতি কিস্তিতে পরিশোধ্য অংকের চেক সই করিয়ে নিতে পারে	২৬	৭২.২২
সুনির্দিষ্ট ক্রয় প্রতিনিধির মাধ্যমে সকল ক্রয় সম্পন্ন করা / ব্যাংকের পৃথক ক্রয় বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা এবং ক্রয়ের জন্য ব্যাংক কর্মকর্তাদের স্বল্প হারে কমিশন লাভের সুযোগ থাকা	২৬	৭২.২২
পণ্যের মালিকানা অর্জনের পর গ্রাহককে তা সরবরাহ করা, এক্ষেত্রে শরীয়াহ্ কাউন্সিলের তদারকি জোরদার করা	২৩	৬৩.৮৯
সহায়ক জামানতের বিকল্প হিসেবে 'হাইপোথিকেশন' পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে	২৯	৮০.৫৬
মাল রাখার জন্য ব্যাংকের নিজস্ব গোডাউন থাকা এবং মাল আনা নেয়ার জন্য নিজস্ব পরিবহণ থাকা	২৯	৮০.৫৬
অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) **	৯	২৫

* গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যা কর্তৃক একাধিক উত্তর প্রদানের কারণে মোট শতকরা হার ১০০ এর বেশি ।

** গ্রাহকের নিকট পণ্য হস্তান্তরের পূর্বের ঝুঁকি ব্যাংককর্তৃপক্ষকে বহন করা, পণ্য গ্রাহকের নিকট হস্তান্তরের পর তার নামে বিনিয়োগ দায় সৃষ্টি করা।

উপরিউক্ত সারণী বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যায়, বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে গ্রাহক যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় তার সম্ভাব্য সমাধানে শতকরা ৮০.৫৬ জন গ্রাহক, যথাক্রমে মাল রাখার জন্য ব্যাংকের নিজস্ব গোডাউন থাকা এবং মাল আনা-নেয়ার জন্য নিজস্ব পরিবহণ থাকা ও সহায়ক জামানতের বিকল্প হিসেবে 'হাইপোথিকেশন' পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংককে বিনিয়োগের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। অন্যদিকে শতকরা ৭৫ জন গ্রাহক, ব্যাংকের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা দূর করা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ে

www.pathagar.com

সম্পাদিত চুক্তির শরয়ী শর্তাবলি সম্পর্কে ব্যাংক কর্মকর্তাদের স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করার ব্যাপারে সুপারিশ করেছেন। শতকরা ৭২.২২ জন গ্রাহক, যথাক্রমে অগ্রিম কাগজপত্রে ও Blank চেকে স্বাক্ষর নেয়ার পরিবর্তে প্রতি কিস্তিতে পরিশোধ্য অংকের চেক সই করিয়ে নেয়া ও সুনির্দিষ্ট ক্রয় প্রতিনিধির মাধ্যমে সকল ক্রয় সম্পন্ন করা / ব্যাংকের পৃথক ক্রয় বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা, এবং ক্রয়ের জন্য ব্যাংক কর্মকর্তাদের স্বল্প হারে কমিশন লাভের সুযোগ প্রদান করার জন্য তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া যথাক্রমে শতকরা ৬৩.৮৯ ও ৫০ জন গ্রাহক, পণ্যের মালিকানা অর্জনের পর গ্রাহককে তা সরবরাহ করা। এক্ষেত্রে শরীয়াহ কাউন্সিলের তদারকি জোরদার করা ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের অধিক আন্তরিক হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

উপসংহার

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহে ক্রয়-বিক্রয় বিনিয়োগ পদ্ধতির মধ্যে বায়' মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশি। ইসলামী শরীয়াহ অনুমোদিত ও দেশীয় আইনে প্রচলিত যে কোন বৈধ পণ্য সামগ্রী (নির্মাণ সামগ্রী, তৈরি পোশাক সামগ্রী, খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, চামড়াজাত দ্রব্য, ঔষধ-প্রযুক্তি, বাড়ির আসবাবপত্র, ক্রোকারিজ আইটেম ইত্যাদি) ক্রয়ের জন্য চলতি মূলধন যোগাতে এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। তবে ইসলামী ব্যাংকে এ পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা পরিলক্ষিত হয় তা দূরীকরণ সময়ের একান্ত প্রয়োজন। ইসলামী ব্যাংকে বায়' মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে যাতে প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে মিশে না যায় সে বিষয়টিও লক্ষ্য রাখা দরকার। এছাড়াও

- ইসলামী ব্যাংক-এর বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে বইপত্র, জার্নাল, সাময়িকী, গবেষণাপত্র ও প্রয়োজনীয় টেক্সটবই প্রণয়ন ও প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া।
- বিভিন্ন স্তরের ব্যাংকারদের জন্য নিয়মিত ইসলামী অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে গ্রুপভিত্তিক আলোচনা, কেইস স্টাডি, ওয়ার্কশপ, বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা অনুষ্ঠানের আয়োজন ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ ও প্রেষণাদীপ্ত ব্যাংকার গড়ে তোলা।
- গ্রাহক সমাবেশ, ব্যক্তিগত আলাপচারিতা ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রাহকদের শরীয়াহ বিষয়ে অবগত করা, মুনাফার অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ গ্রহণ না করা, সব পণ্যে একই রকম লাভের হার নির্ধারণ না করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পণ্যের গুণাগুণ ও বাজারদর সম্পর্কে ব্যাংকারের সম্যক ধারণা প্রদান করা।

www.pathagar.com

- কোটেশন, টেলিফোন কিংবা Product Price Media এর মাধ্যমে গ্রাহকের কাঙ্ক্ষিত পণ্যের প্রকৃত বাজার দর যাচাই করা।
- শরঈ প্রশিক্ষণ ও ব্যাংকের সামগ্রিক পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাংকারের শরীয়াহ্ অনুসৃতির প্রশ্নে দৃঢ় মনোভাব তৈরি করা।
- একবিংশ শতাব্দীতে সনাতন ব্যাংকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতিকে স্থিতিশীলভাবে এগিয়ে নিতে ও নতুন নতুন ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট উদ্ভাবনে ইসলামী ব্যাংকার ও শরীয়াহ্ বিশেষজ্ঞদের নিরন্তর ও সমন্বিত প্রয়াস অব্যাহত রাখা।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহে বায়' মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতির প্রায়োগিক নানাবিধ সমস্যা দূরীভূত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৬
এপ্রিল-জুন ঃ ২০১১

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শ্রম ও শ্রমনীতি

মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ*

[সারসংক্ষেপ : পরিশ্রম সাফল্যের চাবিকাঠি। বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে প্রতিনিয়ত পরিশ্রম করতে হয়। এ প্রচেষ্টার প্রধান বাহন শ্রম। পৃথিবীতে যারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, সবাই অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমেই করেছেন। "শ্রমহীন জীবন মানে হতাশার কাফন জড়ানো একখানা জীবন্ত লাশ।"[১] শ্রমহীন মানুষ দেশ ও জাতির জন্য বোঝাস্বরূপ। তাই মানবজীবনে শ্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাই ভাগ্য গঠনের বড় হাতিয়ার পরিশ্রম। কিন্তু যুগে যুগে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। নবী করীম স.-এর আবির্ভাবের পূর্বে প্রাচীন যেসব সমাজ ব্যবস্থা সমধিক পরিচিত এবং যাদেরকে নিয়ে আজকের যুগেও মানুষ গর্ববোধ করে, সে সব সমাজ ব্যবস্থায়ও খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার স্বীকার করা হয়নি। রোম সাম্রাজ্যে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। হাটে-বাজারে গরু-ছাগলের ন্যায় মানুষকে ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। মাঠে কাজ করার সময় তাদের পায়ে শিকল দিয়ে বেধে রাখা হত যাতে পালাতে না পারে। শ্রমিকরা এসব সমাজ ব্যবস্থায় সামান্যতম সামাজিক মর্যাদা ভোগ করতে পারত না। ভারতের অভিজাত হিন্দুরা মনে করতো, দাসরা (শূদ্র) ভগবানের পা থেকে সৃষ্ট। সুতরাং জন্মগতভাবে তারা নীচু ও ঘৃণ্য। তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনের কোন অধিকার নেই। তাদের মুক্তির একটি পথই খোলা আছে তা হল– ধৈর্য্য সহকারে প্রভুদের অবমাননা ও লাঞ্ছনা অকাতরে সয়ে যাওয়া, যাতে মৃত্যুর পর তাদের আত্মা কোন শ্রেষ্ঠ জীবের মধ্যে প্রবেশ করে পুনর্জীবন লাভ করে। আধুনিক যুগে সৌভাগ্যবানরা দরিদ্র লোকদের শ্রম ও সম্পদ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শোষণ করছে। ইসলাম শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে যে নীতি অবলম্বন করে তাতে অনুরূপ কোন অসঙ্গতি নেই। নেই মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোন ভেদাভেদ। জগতের সকল মানুষ সমান। কোন পেশার কারণে মানুষের সম্মানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না; বরং মানুষ সম্মানিত হয় তার চরিত্র ও সততার কারণে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে শ্রম ও শ্রমনীতি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হলো।]

---

* প্রভাষক, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

১. আশ্ শুয়াইর, ড.মুহাম্মদ ইবনে সাদ, *মাজাল্লাতুল বুহুসুল ইসলামিয়া*, রিয়াদ : ইসলামিক রিসার্চ ম্যাগাজিন, ২০০৬, পৃ.৮৭-১২০

www.pathagar.com

শ্রমের সংজ্ঞা : মানুষ হিসেবে জীবন-যাপন করার জন্য সমাজে আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজন রয়েছে। যেমন- খাদ্য, পোশাক, ঘর-বাড়ি, যানবাহন, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি। বিভিন্ন পেশার মানুষ আমাদের এসব প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। এগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে শ্রমের প্রয়োজন হয়। কোন কোন পেশার মানুষ দৈহিক পরিশ্রম করে নানা কাজ করেন, এদেরকে শ্রমিক বলা হয়। আর কোন কোন পেশার মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক পরিশ্রম করে আমাদের প্রয়োজন মেটান তাদেরকে পেশাজীবী বলা হয়। এককথায়, উৎপাদন কাজে নিয়োজিত সকল প্রকার দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[২]

শ্রমের প্রকার : শ্রমের প্রধান দু'টি প্রকার রয়েছে-

১. শারীরিক শ্রম- (Physical labour)

২. বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম- (Mental Exercise)

কৃষক, কুমার, কামার, দর্জি প্রমুখ শারীরিক পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে। আর আইনজীবী, শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী বুদ্ধি ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করে।

উৎপাদন উপাদান (Factors of Production)-এ পরিশ্রমের গুরুত্ব বেশি। কিন্তু আধুনিক সমাজবিদরা একে সীমিত করে দিয়েছেন এবং পরিশ্রমকে কেবল ধন-সম্পদ অর্জনের উপায় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এছাড়া যারা সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ করে (ডাক্তার, শিক্ষক, সরকারী কর্মকর্তা) তাদেরকে তাদের ডিগ্রী ও উচ্চ স্তরে চাকুরীর কারণে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। আর শ্রমিক, নাপিত, মুচি, ধোপাদেরকে কম সম্মানের চোখে দেখা হয়। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ শুধু তাদের পেশার কারণে নির্ণীত হয়। যদিও তারা অন্যদের ন্যায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ (Economic Activit) নেয়। এ ধরনের বিভাজন ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ বাস্তবে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শারীরিক পরিশ্রমকারীরাও কমবেশি বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম করে। যে যত বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম করে সে ততই সফল কৃষক এবং অন্যরাও তাই। এভাবে বৃদ্ধিবৃত্তিক পরিশ্রমকারীরাও কমবেশি শারীরিক শ্রম করে।

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা : ইসলামে পরিশ্রম একটি পৃথক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করে। ইসলাম মানুষকে সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণের জন্য জোর দেয়। অতঃপর পেশা নির্ধারণে (অনৈসলামিক পেশা ব্যতীত) কোন শর্ত যুক্ত করে না। লোকদেরকে শরীয়তের সীমারেখায় অবস্থান করে কোন পেশার জন্য অসম্মান করে না।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন– "মানুষ ও জ্বীনকে শুধু এজন্যে সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত ও আনুগত্য করবে"।[৩]

---

২. মান্নান চৌধুরী, ড. মুহাম্মদ আব্দুল, *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা*, ঢাকা : ২০০৫, পৃ.১৩৮

৩. আল-কুরআন, ৫১ : ৫৬, وماخلقت الجن و الانس الا ليعبدون

www.pathagar.com

এ আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য-আল্লাহর ইবাদত করা। ইসলামে ইবাদতের ধারণাও ব্যাপক। সমাজ জীবনে শারীরিক পরিশ্রম, যদি কেউ তা আল্লাহর হুকুম মুতাবেক ও রসূলুল্লাহ স. এর প্রদর্শিত পথে করে তবে তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। তাই পরিশ্রম কেবল পার্থিব সম্মান ও ধন-সম্পদ উপার্জনের জন্য সীমাবদ্ধ না হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালীন প্রতিদানও এর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন– "প্রত্যেকের জন্য সেসব ভাল মন্দ কাজের কারণে যা তারা করেছে স্তর নির্ধারিত আছে। যাতে তিনি তাদেরকে তাদের কাজের পরিপূর্ণ বদলা দেন। আর তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।"[৪]

বর্তমানে মুসলমানরা এ শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে তাদের সম্মান হারিয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে উন্নত দেশের মানুষ কাজকে ভালবাসে, যে কোন শ্রমিককে শ্রদ্ধা করে। তারা কোন কাজকে ছোট বিবেচনা করে না। তাই তারা এত উন্নত। মনীষী কার্লাইল বলেন, আমি পৃথিবীতে দু'জন ব্যক্তিকে সম্মান করি, সেই কৃষক যে পরিশ্রম করে ফসল ফলায় এবং সেই চিত্রশিল্পী যে তার জ্ঞান দিয়ে শিল্প কর্ম করে যায়।[৫]

ইসলামে পরিশ্রমের মর্যাদা : ইসলাম শ্রম ও শ্রমিককে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। কেননা, উৎপাদনের ক্ষেত্রে জমি, মূলধন ও শ্রমিকের মধ্যে শ্রমিকই গুরুত্বপূর্ণ। ফলে শ্রমিক বা মজুরের কাজের গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম। নিম্নে কুরআন মজীদ ও হাদীসের আলোকে শ্রমের মর্যাদা বিষয়ে আলোচনা করা হল।

কুরআন মজীদে শ্রমের মর্যাদা

১. শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমের প্রতি উৎসাহিত করে কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- "মানুষ তাই পায় যা সে চেষ্টা করে।"[৬]
২. জীবিকা অর্জনের জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়া প্রয়োজন। কুরআন মজীদে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে– "আর দুনিয়াতে তোমরা তোমাদের অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি লোকদের সাথে সেরূপ ইহসান করো যেভাবে আল্লাহ তোমার প্রতি ইহসান করেছেন। রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। নিশ্চয় আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।"[৭]

---

৪. আল-কুরআন, ৪৬ : ১৯, ولكل درجات مما عملوا و ليوفيهم اعمالهم وهم لايظلمون
৫. আশ্ শুয়াইর, ড. মুহাম্মদ ইবনে সাদ, প্রাগুক্ত পৃ. ৮৭-১২০
৬. আল-কুরআন, ৫৩ : ৩৯, وان للانسان الا ما سعى
৭. আল-কুরআন, ২৮ : ৭৭, ولاتنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك و لاتبغ الفساد فى الارض ان الله لا يحب المفسدين

www.pathagar.com

৩. এ পৃথিবীতে আল্লাহর সৃষ্টি করা নিয়ামত জীবনোপকরণ সকল মানুষের জন্য সমান। অতএব, সকল মানুষের জন্য প্রয়োজন তা উপার্জন করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করা। কুরআন মাজিদে উল্লেখ আছে– "এতে তিনি খাদ্য নির্ধারণ করেছেন, চার দিনে পরিপূর্ণ করেছেন, সকল অন্বেষণকারীর জন্য সমান"।[৮]

৪. হালাল পন্থায় রিযিক গ্রহণকে আল্লাহর অনুগ্রহ বলা হয়েছে– "অতঃপর নামায শেষ করে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো। আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করো এবং বেশি পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করো যাতে সফলকাম হও"।[৯]

৫. জীবিকা উপার্জনের জন্য স্থানান্তরিত হওয়া এবং সফর করা, হালাল রিযিক অর্জনের জন্য চেষ্টা করার সমান। "দ্বিতীয় আরেক দল পৃথিবীতে সফর করবে যাতে আল্লাহর অনুগ্রহ পায়।"[১০]

৬. জীবিকা উপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো উত্তম গুণাবলীর একটি। আল্লাহ তাআলা বলেন, "অতঃপর তোমরা আল্লাহর কাছে রিযিক তালাশ করো, তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তোমাদেরকে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত করা হবে।"[১১]

হাদীস শরীফে শ্রমের মর্যাদা : নবী স. তাঁর কথা, কাজ ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে শ্রম ও শ্রমিকের প্রশংসা করেছেন। তাঁর পবিত্র জীবনে এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে–

১. নবী স. বলেন– অর্থাৎ,"উৎকৃষ্ট উপার্জন শ্রমিকের উপার্জন যদি তা নিয়মতান্ত্রিক ও ভালভাবে করে।"[১২]

২. নবী স. বলেন– "সত্যবাদী, আমানতদার ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দিক ও শহীদগণের সাথে হবেন।"[১৩]

---

৮. আল-কুরআন, ৪১ : ১০, وقدر فيها اقواتها فى اربعة ايام سواء للسائلين

৯. আল-কুরআন, ৬২ : ১০, فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض و ابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

১০. আল-কুরআন, ৭৩ : ২০ واخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله

১১. আল-কুরআন, ২৯ : ১৪, فابتغوا عند الله الرزق و اعبدوه و اشكروا له اليه ترجعون

১২. আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়েদ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : আইয়ুল কাচবি আতইয়াব, বৈরূত : দারুল কিতাব আল-ইলমিয়া, ১৯৮৮, পৃ. ৬১ خير الكسب كسب العامل اذا نصح

১৩. তিরমিযী, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : মাজাআ ফিত তুজ্জার, আল-কুতুবুস সিত্তাহ রিয়াদ : দারুস সালাম ২০০০, পৃ. ১৭৭২; التاجر الصدوق الامين مع النبيين و الصديقين والشهداء

www.pathagar.com

৩. নবী স. বলেন- "পৃথিবীর গোপন সঞ্চিত সম্পদের মধ্যে রিযিক তালাশ করো।"[১৪]

৪. নবী স. বলেন– "কোন ব্যক্তি তা থেকে উত্তম আহার করেনি, যা সে নিজ হাতে উপার্জন করে খেয়েছে। আল্লাহর নবী দাউদ আ. নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।"[১৫]

৫. নবী স. বলেন– "কিছু গুণাহ এমন আছে যা মাফ হয়না, হালাল রিযিক উপার্জনের চিন্তা ব্যতীত।"[১৬]

৬. নবী স. বলেন– "মানুষের নিকট তার চেয়ে কোন উত্তম উপার্জন নেই, যা সে নিজের হাতে উপার্জন করে খায়। সে যা কিছু নিজের জন্য, পরিবার পরিজনের জন্য ও ঘরের ভৃত্যদের জন্য খরচ করে তা সবই সদকা।"[১৭]

৭. নবী স. ভিক্ষার প্রতি নিরুৎসাহিত করে বলেন– "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (অকারণে ভিক্ষা করে) সে সর্বদা ভিক্ষা করতেই থাকবে, কিয়ামত দিবসে সে এমতাবস্থায় আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায় এক টুকরাও গোশ্‌ত থাকবে না।"[১৮]

৮. নবী স. বলেন– "যে নিজ হাতে পরিশ্রম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যা করল, তার সন্ধ্যা গুনাহ মাফ হওয়ার সাথে হল।"[১৯]

৯. ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত আছে– "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পরিশ্রমী মুমিনদের ভালবাসেন।"[২০]

---

১৪. আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়েদ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : আল-কাসবু ওয়াত তিজারাতু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩ اطلبوا الرزق فى خبايا الارض

১৫. বুখারী, ইমাম, *আস-সাহীহ*, অধ্যায় : আল-বায়ূ, অনুচ্ছেদ : কাসবুর রাজুলি ওয়া আমালিহি বি-ইযাদিহি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১৯২ : ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يديه وان نبى الله داؤد عليه السلام كان يأكل من عمل يديه

১৬. আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়েদ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : আল-কাসবু ওয়াত তিজারাতু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪ ان من الذنوب ذنوبا لاتكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة قالوا فمايكفرها يا رسول الله قال الهموم فى طلب المعشية

১৭. ইবনে মাজাহ, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আত-তিজারাত, অনুচ্ছেদ : আল-হিসসু আলাল মুকাসিব, আল কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ২৬০৫ ما كسب الرجل كسبا اطيب من عمل يده وما انفق الرجل على نفسه و اهله وولده وخادمه فهو صدقة

১৮. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : মান সাআলান নাসা তাকাসসুরান, প্রাগুক্ত ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة ليس فى وجهه مزعة لحم

১৯. আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়েদ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : আল-কাসবু ওয়াত-তিজারাহ, প্রাগুক্ত পৃ. ৬৩ مغفورا له من امسى كالا من عمل يده امسى

২০. আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়েদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২ ان الله يحب المؤمن المحترف

www.pathagar.com

নবী স.-এর পূর্ণ জীবনই পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার এক প্রোজ্জ্বল আদর্শ। রসূলুল্লাহর জীবনী পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই–

১. ছোটবেলায় তিনি ছাগল চরিয়েছেন।

২. নবুয়াত প্রকাশের পূর্বে ব্যবসা করেছেন।

৩. কাবা ঘর নির্মাণে অন্যদের সাথে কাজ করেছেন।

৪. হিজরতের পর মসজিদে নববী এবং মসজিদে কুবা নির্মাণে অংশ নিয়েছেন।

৫. খন্দকের যুদ্ধে অন্যদের সাথে পরিখা খনন করেছেন।

৬. নবী স. নিজের কাপড় নিজ হাতে সেলাই করতেন।

৭. নবী স. নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন।

কয়েকজন নবী-রসূল ও মহানবীর সাহাবীগণের পেশা উল্লেখ করা হল, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরিশ্রম নবী-রসূল ও সাহাবীগণের নিকট অতীব সম্মান ও মর্যাদার বিষয় ছিল।

নবীগণ ও তাঁদের পরিশ্রম ঃ কুরআন মজীদে পূর্বের নবীগণের আলোচনা হয়েছে। নবীগণের পেশা সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ-

১. আদম আ. চাষাবাদ করতেন।

২. নূহ আ. ছুতার মিস্ত্রী ছিলেন। তিনি নিজে নৌকা বানিয়েছিলেন।

৩. মূসা আ. পরিশ্রমের বিনিময়ে হযরত ইয়াকুব আ.-এর ছাগল চরিয়েছেন।

৪. যাকারিয়া আ. কাপড় সেলাই করতেন।

৫. ইবরাহিম আ. ও ইসমাঈল আ. রাজমিস্ত্রীর কাজ জানতেন। তারা দু'জনে কাবাগৃহ নির্মাণ করেছেন।

৬. হযরত ইয়াকুব আ. দশ বছর ছাগল চরিয়েছেন।

সাহাবীগণ ও তাঁদের পরিশ্রম : নবী স. শিক্ষা ও আমল সাহাবীগণ তাঁদের জীবনে প্রতিফলিত করেছেন। তাই তাঁদের কাছে কোন ধরণের পরিশ্রম অসম্মানের ছিল না। তাঁরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের সম্মান ও মর্যাদা তাদের পেশার উপর নির্ভর করে না বরং তাদের নিষ্ঠা ও কর্ম প্রচেষ্টার উপরই নির্ভর করে। যেমন আমরা দেখি–

১. আবু বকর রা. খলিফা হওয়া সত্ত্বেও কখনও পরিশ্রম করা ছেড়ে দেননি। তিনি খলিফা হওয়ার পরও পিঠে কাপড়ের থান বহন করে মদীনা শরীফের অলি-গলিতে বিক্রি করতেন। এলাকার কাজে তিনি নিজেই অংশ নিতেন। প্রতিবেশিদের ছাগল চরাতেন এবং দুধ দোহন করে দিতেন।

২. উমর রা. ও উসমান রা. ব্যবসা করতেন।

www.pathagar.com

৩. আলী রা. ওয়ালিমা সম্পাদন করার জন্য পাহাড় থেকে গাছ কেটে বাজারে বিক্রয় করেছেন।
৪. ফাতেমা রা. নিজের ঘরের কাজ নিজেই করতেন।
৫. আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ রা. মদীনায় ব্যবসার কাজ করতেন।
৬. আবু আইয়ুব আনসারী রা. অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি কাপড়ের কাজ করে অর্থ উপার্জন করতেন।
৭. সোহাইব রোমী রা. কর্মকার ছিলেন।
৮. ইয়াসির রা. লাকড়ী বিক্রয় করতেন।
৯. সা'দ রা. কামারের কাজ করতেন। হাতুড় দিয়ে কাজ করতে করতে তার হাত দু'টি বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একদিন নবী স. এর সাথে করমর্দন করার সময় সা'দকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হাতুড়ে দিয়ে কাজ করতে গিয়ে হাতের এ দশা হয়েছে। নবী স. তার হাত চুম্বন করে বললেন– এ হাতকে কখনও আগুন স্পর্শ করবে না।[২১]

বুযুর্গদের পরিশ্রম : প্রতিথযশা 'উলামা, ফুকাহা, মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন পীর-মাশায়েখ কেউ কোন পেশাকে তাঁদের জন্য লজ্জাকর মনে করেননি।

১. ইমাম গাযালী র. সুতার ব্যবসা করতেন।
২. আবু বকর জাসসাস র. সুরকি তৈরী করতেন।
৩. আল্লামা হান্নাত র. দর্জি ছিলেন।
৪. আল বাযযার র. কাপড় বিক্রি করতেন।
৫. আল্লামা খাইয়াম র. তাঁবু বানিয়ে বিক্রি করতেন।
৬. আল্লামা খাববায র. রুটি তৈরী করতেন।
৭. আল্লামা যাইয়াত র. তেল বিক্রি করতেন।
৮. ইমাম কুদরী র. হাঁড়ি তৈরী করে বাজারে বিক্রি করতেন।
৯. ইমাম কেফাল র. তালা বানাতেন এবং তা বিক্রি করতেন।
১০. ইমাম সাফফার র. বাসন কোষণ বেচা কেনার কাজ করতেন।
১১. ইমাম সায়দালানী র. আতর বিক্রি করতেন।
১২. ইমাম দাক্কাক র. আটা বিক্রি করতেন।
১৩. ইমাম না'লী র. জুতা বেচা-কেনা করতেন।

---

২১. ইবনুল আসীর, *উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা,* বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তা. বি. খ. ২, পৃ.৪২০, هذه يد لاتمسها النار ابدا

www.pathagar.com

১৪. ইমাম বকালী র. সবজী বিক্রেতা ছিলেন।
১৫. ইমাম আবু হানিফা র. কাপড়ের ব্যবসা করতেন।
১৬. ইমাম আহমদ ইব্ন ওমর মোহাইর র. মুচি ছিলেন।

বর্তমানেও অনেক মুসলিম পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করা যাবে যারা তাদের পেশার উপাধি নিজেদের নামের সাথে যুক্ত করতে লজ্জাবোধ করেন না। যেমন– مباحث فى علوم القران এর লেখক مناع القطان-এর মধ্যে কাত্তান অর্থ তুলা ধুনাকারী। মিসরের স্কলার প্রফেসর মাহমুদ 'মাযদারা'এর অর্থ হল– ক্ষেত-খামার পেশা। تيسير مصطلح الحديث এর লেখক ড. মাহমুদ তাহসান এর 'তাহসান' উপাধির অর্থ- আটা পিশা। এভাবে অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যাবে যে, পেশার ব্যাপারে ইসলামে কোন ধরনের হীনমন্যতা নেই।

মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক : ইসলামের শিক্ষা বিশ্বজনীন। মান-সম্মান, ইজ্জত-আব্রু এবং মানুষের মহত্ব সম্পর্কে ইসলাম পূর্ণরূপে সচেতন। এ কারণে ইসলাম মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্কের ভিত্তি ভ্রাতৃত্বের ওপর রেখেছে। ইসলামের নীতি হল- মালিক ও শ্রমিক পরস্পর নিজেদেরকে ভাই মনে করবে। এ অনুভূতি সকল ঝগড়া-বিবাদ নিরসন করবে এবং ভালভাবে কর্ম সম্পাদনে সহায়ক হবে।

নবী স. বলেন– "তোমার অধীনে যারা কাজ করে তারা তোমাদের ভাই। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের অধীন করেছেন।"[২২]

হাদীস শরীফে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি ভ্রাতৃত্বের ওপর রাখা হয়েছে। মালিকদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সে শ্রমিকের শ্রম টাকার বিনিময়ে গ্রহণ করেছে; কিন্তু সে শ্রমিককে কিনে নেয়নি যে, সে ইচ্ছামত শ্রমিক থেকে শ্রম নেবে।

সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ইসলামে মালিক ও শ্রমিকের প্রতি কিছু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

১. মালিক শ্রমিককে নিজের ভাই মনে করবে এবং প্রত্যেক বিষয়ে তার সাথে সহমর্মিতার সম্পর্ক রক্ষা করবে। নবী স. বলেন– "তাদের ওপর এত বেশি কাজ চাপিয়ে দিও না যা তাদেরকে কষ্ট দেবে। যদি কোন কাজ চাপিয়ে দিতে হয় তবে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে।"[২৩]

---

২২. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : আল-মাআসি মিন আমরিল জাহিলিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪ اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم

২৩. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আইমান ওয়ান নুযূর, অনুচ্ছেদ : আস-সালিসু মিনাশ শুরুত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪১ ولاتكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم

www.pathagar.com

২. শ্রমিককে কাজ দেয়ার পূর্বে তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ করবে। নবী স. বলেন– "যদি তুমি কোন শ্রমিককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ দিতে চাও তবে প্রথমেই তাকে পারিশ্রমিক সম্পর্কে অবহিত কর।"[২৪]

পারিশ্রমিক কেবল উৎপাদন সামগ্রীর ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে না; বরং ন্যায়সঙ্গত Equitable ভিত্তির ওপর নির্ধারিত হবে। তাই এতটুকু পরিমাণ পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা উচিত যাতে একজন শ্রমিক সম্মানের সাথে জীবন যাপন করতে পারে।

৩. যথাসময় পারিশ্রমিক আদায় করা আবশ্যক। নবী করিম স. ইরশাদ করেন– "শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার পারিশ্রমিক আদায় কর।"[২৫]

ইসলামে পারিশ্রমিক আদায় করতে, বিলম্ব ও অনাদায়কে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। নবী স. বলেন– অর্থাৎ, "হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'লা বলেন- তিন প্রকার লোকের সাথে আমি কিয়ামত দিবসে ঝগড়া করব। (তাদের মধ্যে) একজন সে ব্যক্তি যে শ্রমিক থেকে পরিপূর্ণ কাজ আদায় করে কিন্তু পূর্ণ পারিশ্রমিক দেয় না।"[২৬]

নবী স. অন্য হাদীসে বলেছেন– "বিত্তবানের (বিত্ত থাকা সত্ত্বেও অন্যের হক আদায় করতে) বিলম্ব করা জুলুম।"[২৭]

৪. শ্রমিকের প্রাপ্য আদায় করে দেয়া মালিকের অবশ্য কর্তব্য। শ্রমিককে যেন পারিশ্রমিক তাগাদা করে চেয়ে নিতে না হয়। কুরআন মজীদে মূসা আ.-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি শোয়াইব আ. এর ছাগলকে পনি পান করিয়েছেন। তিনি পানি পান করিয়ে সে স্থানেই অবস্থান করেছিলেন; এসময় শোয়াইব আ.-এর কন্যা এসে বললেন– "আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন, যাতে তিনি আপনার পারিশ্রমিক আদায় করে দেন। কেননা, আপনি আমাদের ছাগলকে পানি পান করিয়েছেন।"[২৮]

এ আয়াতে يدعوك শব্দটি প্রমাণ করছে যে, মালিক শ্রমিককে ডেকে তার পাওনা আদায় করে দিবে, যেন তাকে চাইতে না হয়।

---

২৪. নাসাঈ, ইমাম, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত اذا استاجرت اجيرا فاعلمه اجره

২৫. ইবনে মাজাহ, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আর রুহূন, অনুচ্ছেদ : আজরুল আজরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২৩, اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

২৬. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ইজারা, অনুচ্ছেদ : ইসমু মান মানাআ আজরাল আজীর, প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৬, قال الله ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة---- رجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره

২৭. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হাওয়ালাত, অনুচ্ছেদ : ইযা আহালা দাইনাল মায়্যিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮, مطل الغنى ظلم

২৮. আল-কুরআন ২৮ : ২৫, ان ابى يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا

www.pathagar.com

৫. মালিক শ্রমিক থেকে তার সাধ্যানুযায়ী কাজ নেবে। নবী স. বলেন– "কাজ নেয়ার সময় তাকে এত কষ্ট দেয়া যাবে না যা সে সহ্য করতে পারবে না।"[২৯]

৬. মালিক শ্রমিকের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। নবী স. বলেন– "অধীনস্তদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৩০]

নবী স. বলেন– "তোমাদের মধ্যে কেউ (সেবক-সেবিকাকে) বলো না যে, তোমরা তোমাদের প্রভুদের খানা দাও, তোমাদের প্রভুদের উযু করাও, তোমাদের প্রভুদের পানি পান করাও; বরং তোমাদের সেবক ও সেবিকাদের এভাবে বলা উচিত– ও আমার মালিক ও সরদার। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে এও বলবে না- আমার দাস দাসী; বরং বলবে– আমার তরুণ ও তরুণী বাছারা।"[৩১]

৭. শ্রমিকের অজ্ঞতাবশত ছোট-বড় দোষগুলো ক্ষমা করা উচিত। ছোট ছোট বিষয়ে অবাধ্য হলে এবং ভুলবশত নাফরমানি করলে তাদেরকে মারধর না করে বরং উদারতা প্রকাশ করাই ইসলামের শিক্ষা। হাদীস শরীফে আছে–

"আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর রা. হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী স.-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন- হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার শ্রমিককে কতবার ক্ষমা করব? নবী স. বললেন– দৈনিক সত্তর বার।[৩২]

নবী স. বলেন– "তোমাদের কারো খাদেম যদি খাবার নিয়ে আসে, তাকে তোমাদের সাথে খেতে দাও। যদি দিতে না পার, তবে এক-দুই গ্রাস এক-দু' পেয়ালা তাদেরকেও দাও। কেননা এরা তো এ খাবার তৈরী করতে কষ্ট করেছে।"[৩৩]

এভাবে ইসলাম মালিককে এ বিষয়েও উদ্বুদ্ধ করে যেন সে শ্রমিককে তার

---

২৯. মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়; আল-আইমান, অনুচ্ছেদ : ইতআমুল মামলুক মিম্মা ইয়াকুলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭০, ولايكلف من العمل الا ما يطيق

৩০. ইবনে মাজাহ, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, আল-ইহসান ইলাল মামালিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯৭, لايدخل الجنة سيئ الملكة

৩১. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ইতক অনুচ্ছেদ : কারাইয়াতুত তাতাউল আলার রাকীক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১ : لايقل احدكم اطعم ربك وضئ ربك اسق ربك و ليقل سيدى ومولاى ولايقل احدكم عبدى امتى و ليقل فتاى وفتاتى وغلامى

৩২. আবু দাউদ, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ফী হাকিল মামলুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০০ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه يقول جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم اعفو عن الخادم ؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يارسول الله صلى الله عليه وسلم كم اعفو عن الخادم؟ فقال كل يوم سبعين مرة

৩৩. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ইতক, অনুচ্ছেদ : ইযা আতা আহাদাকুস খাদিমুহ বি-ত্বআমিহি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১ اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله لقمة او لقمتين او اكلة او اكلتين فانه ولى علاجه

www.pathagar.com

লভ্যাংশের মধ্যে শরীক করে। এ অংশীদারিত্ব ভাল কাজে আরো উদ্বুদ্ধ করার জন্য হতে পারে। এতে করে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে হৃদ্যতা সৃষ্টি হবে এবং উৎপাদন ফলপ্রসূ হবে।

৯. রসূলুল্লাহ স. মালিকদের নির্দেশ দেন যে, তারা যেন কর্মচারী, শ্রমিক ও অধীনস্তদের সাথে সন্তান-সন্ততির ন্যায় আচরণ করে এবং তাদের ইজ্জত- সম্মানের কথা স্মরণ রাখে। হাদীস শরীফে আছে- "তাদের এভাবে সম্মান করবে যেভাবে নিজের সন্তানদের করো এবং তাদেরকে সে খাবার দিবে যা তোমরা নিজেরা খাও।"[৩৪]

শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য : ইসলাম যেভাবে মালিকের ওপর দায়িত্ব কর্তব্য ওয়াজিব করেছে তেমনি শ্রমিকদের ওপরও কিছু দায়িত্ব কর্তব্য আরোপ করেছে।

১. শ্রমিককে বলা হয়েছে, সে যেন নিজ কাজে যোগ্যতা অর্জন করে। যাতে সে পরিপূর্ণ দায়িত্ব সহকারে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে। নবী স. বলেন- "নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কোন কাজ/পেশা গ্রহণ করলে তাতে পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করবে।"

শ্রমিকের উচিত, সে যে কাজের যিম্মাদারী নেবে তাতে যেন পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করে। কাজ না জানার পরও জানার ভান করে কাজ নেয়া, ধোঁকাবাজি। এ বিষয়ে কুরআন মজীদে বর্ণিত আছে, হযরত ইউসুফ আ.-কে যখন মিসরের আযীয বিশেষ উপদেষ্টা নিয়োগ দানের জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন- যেহেতু আমি জমিনের ব্যাপারে ভাল বুঝি এবং এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা আছে, সেহেতু আমাকে এ কাজ দিলে ভাল হয়। কুরআন মাজিদে উল্লেখ আছে- "ইউসুফ আ. বললেন- আমাকে মিসরের ভূমি তথা কৃষি ব্যবস্থাপনার পরিচালনার জন্য (উযীর) নিয়োগ করতে পারেন। নিশ্চয় আমি (এর) ব্যবস্থাপনা ভালভাবে করতে পারবো আমি ভালভাবে বুঝি।"[৩৫]

২. শ্রমিকের দায়িত্ব হল- সে যে কাজ করছে তাতে যেন মনোযোগী হয় এবং ভালমনে কাজ সম্পাদন করে। নবী স. বলেন- "উত্তম উপার্জন হল শ্রমিকের উপার্জন যদি ভাল মনে কাজ সম্পাদন করে।"[৩৬]

৩. শ্রমিক আমানতদার হবে। সকল অন্যায় ও দুষ্কর্ম মুক্ত থাকবে। আন্তরিকতার

---

৩৪. ইবনে মাজাহ, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : আল-ইহসান ইলাল মামলিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯৭ فاكرموهم ككرامة اولادكم واطعموهم مماتأكلون

৩৫. আল-কুরআন ১২ : ৫৫, قال اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم

৩৬. *দায়লামী*, আলফেরদৌস, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১৯৮৬, তা. বি. হাদীস নং- ২৯১০ خير الكسب كسب العامل اذا نصح

www.pathagar.com

সাথে মালিকের সকল কাজ সম্পাদন করবে। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন– মূসা আ. মাদায়ান সফরে হযরত শোয়াইব আ.-এর ছাগলকে পানি পান করালে শোয়াইব আ.-এর কন্যারা বলল– "তাদের মধ্যের দুই মেয়ের একজন বলল, হে পিতা! তাঁকে (শ্রমিক হিসেবে আপনার কাছে) থাকতে দিন। নিশ্চয় শ্রমিক হিসেবে সেই ভালো; যে শক্তিশালী ও আমানতদার।"[৩৭]

এ আয়াত থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, উত্তম শ্রমিক হল সে ব্যক্তি যে শক্তিশালী ও আমানতদার।

নবী স. বলেন– "যাকেই আমরা নির্দিষ্ট বেতনের ভিত্তিতে নিয়োগ করি এবং সে নিজের বেতনের বাইরে অতিরিক্ত (কোন পন্থায়) উপার্জন করে, তা হারাম।"[৩৮]

এভাবে কোন শ্রমিক কাজ অর্ধেকে ছেড়ে চলে যাবে অথবা নিযুক্তির পরে অকারণে পারিশ্রমিক বৃদ্ধির জন্য বাড়াবাড়ি করবে এবং দাবি পূরণ না হলে কাজ ছেড়ে পালিয়ে যাবে। এটা তার জন্য বৈধ নয়।

কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে– অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং পরস্পরের আমানতের মধ্যেও খেয়ানত করো না। অথচ তোমরা (বাস্তব অবস্থা) জান।"[৩৯]

৪. শ্রমিকের দায়িত্ব হলো সে মালিকের সাথে কৃত চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে। কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত জিম্মাদারী আদায় করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন– "হে ঈমাদনদাররা তোমাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর।"[৪০]

৫. পরস্পরে সাহায্য সহযোগিতা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা, যা দ্বারা ভালবাসা সৃষ্টি হয়। কুরআন মাজিদে উল্লেখ আছে– "ভাল ও পরহেজগারীর কাজে একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করো। গুণাহ ও সীমা লংঘনের কাজে একে অপরকে সাহয্য করো না।"[৪১] এ আয়াত থেকে একে অন্যের উপকার করা ও মঙ্গল কামনা করার শিক্ষা পাওয়া যায়। এভাবে কোন কাজে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার ধারণা পাওয়া যায়। অর্থাৎ সম্মিলিত মঙ্গল ও উপকারের জন্য একক

---

৩৭. আল-কুরআন, ২৮ : ২৬, قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوى الامين

৩৮. আবূ দাউদ, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ, অনুচ্ছেদ : ফী আর যাকিল উম্মাল من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذالك فهو غلول

৩৯. আল-কুরআন, ৮ : ২৮, يا ايها الذين امنوا لاتخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون–

৪০. আল-কুরআন, ৫ : ১, يا ايها الذين امنوا اوفوا العقود

৪১. আল-কুরআন, ৫ : ২, وتعاونوا على البر والتقوى و لاتعاونوا على الاثم والعدوان

www.pathagar.com

ভাবে নয়; বরং ঐক্যবদ্ধভাবে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করা। তাই উপার্জনের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন করা যায়। ইসলাম এরূপ ট্রেড ইউনিয়নের কেবল অনুমতিই দেয় না; বরং এজন্য উৎসাহিতও করে। নবী স. বলেন– অর্থাৎ, "তোমরা মুমিনদেরকে পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহ, মায়া-মহব্বত ও সৌহার্দ্য প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে এক শরীরের ন্যায় দেখবে। তার কোন অংশে কষ্ট অনুভূত হলে পুরো শরীরে কষ্ট অনুভূত হয়।[৪২]

উপরিউক্ত কুরআন মজীদের আয়াত ও হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যায় যে, শ্রমিকরা উত্তরোত্তর সফলতা ও উভয় পক্ষের কল্যাণের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারে। অর্থাৎ, তাদের ইউনিয়ন হতে পারে। তবে এ ইউনিয়ন অরাজকতা, বিশৃংখলা, হরতাল ও জনদূর্ভোগ সৃষ্টি করার জন্য যেন না হয়। ইসলাম এ ধরনের অমানবিক কাজকে কঠোরভাবে নিষেধ করে।

পারিশ্রমিক : মালিক ও শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনার পর শ্রমিকের পারিশ্রমিক বিষয়ে আলোকপাত করা হল। শুরুতে বলা হয়েছে পারিশ্রমিক হল কোন ব্যক্তির শারীরিক অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের বিনিময়। ইসলামী কানুন মোতাবেক-এ পারিশ্রমিক শ্রমিকের অধিকার।

পারিশ্রমিকের প্রকারভেদ

১. প্রয়োজনীয় পারিশ্রমিক।

২. অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রম অনুসারে পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

৩. কাজের অনুপাতে পারিশ্রমিক।

মোটকথা হলো, শ্রমিকের অধিকার ন্যায়সম্মত হতে ইনসাফপূর্ণ হতে হবে। প্রয়োজনে নিম্নতম মজুরী সরকার নির্ধারণ করবেন।

৪. কার্ল মার্কসের শ্রমনীতি: (Karl Marx's Wage Theory)

সমাজতান্ত্রিক দর্শনে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ একটি আলোচিত বিষয়। এ নীতির প্রতিষ্ঠাতা হলেন– কার্ল মার্কস। কার্ল মার্কস শ্রমিকদের পারিশ্রমিক নির্ধারণে ইতিহাসের সামাজিক বৈষম্যকে মূল উপপাদ্য করে তার যুক্তি উপস্থাপন করেন। সমাজে সাধারণত দু'শ্রেণীর মানুষ ধনী ও দরিদ্রের মাধ্যমে সমাজের অবস্থার পরিবর্তন হয়। ধনীরা সর্বদা শ্রমিক শ্রেণীক শোষণ করে। শ্রমিকরা তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পাওয়ার কারণে শোষণের শিকার হয়। কার্ল মার্কসের মতে, Surplus Value[৪৩] শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যের মূল কারণ। ফলে, শ্রমিকরা

---

৪২. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : রেহমাতুন নাসি ওয়াল বাহায়িম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৯ ترى المومنين فى تراحمهم و توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر و الحمى

৪৩. উৎপাদন খরচ ও বাজার মূল্যের ব্যবধানকে Surplus Value বলা হয়।

www.pathagar.com

ক্রমান্বয়ে মালিকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তার মতে, উপাদানে দু'টি জিনিস বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ–

১. প্রাকৃতিক সম্পদ

২.মানুষের পরিশ্রম।

এ দুটিতে মালিকের কোন অংশীদারিত্ব নেই; বরং প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হওয়ার পর শ্রমিকের পরিশ্রমে পণ্য উৎপাদিত হয়। অতএব, Surplus Value এর বড় অংশ শ্রমিককেই পেতে হবে এটিই যুক্তিসঙ্গত। অথচ এর সামান্য অংশই শ্রমিক পেয়ে থাকে আর অবশিষ্টাংশ (Surplus Value) মালিকের পকেটে চলে যায়। ফলে দরিদ্র আরো দরিদ্র হয় এবং ধনী আরো ধনী হয়।

কার্ল মার্কস এর সমাধানে বলেন, মূলধনের মালিক থেকে ক্ষমতা খর্ব করে তা শ্রমিকদের নিকট হস্তান্তর করার সুপারিশ করতে হবে। এভাবে শ্রমিকদের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে উদ্বৃত্ত মূলধনের পূর্ণ কর্তৃত্ব মজুরদের হাতে ন্যস্ত করতে হবে।

কার্ল মার্কস সমাজের বৈষম্যের ওপর ভিত্তি করে যে শ্রমনীতির কথা বলেছেন তাতে তিনি কেবল মানুষের মূল্যবোধ ও উৎসর্গিত জীবনকে পদদলিত করেননি; বরং মানুষকে অর্থনৈতিক মেশিনে পরিণত করেছেন যাতে মানুষের আদিকালের সম্মান মর্যাদা ধূলিসাৎ হয়েছে।

উদ্বৃত্ত মূল্যের (Surplus Value) ওপর ভিত্তি করে বর্ণিত কার্ল মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থা ঠিক একই। আমরা জানি যে, কাঁচামাল প্রকৃতিপ্রদত্ত; কিন্তু কোন কাঁচামাল উৎপাদিত বস্তুতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া বিনামূল্যে হয় না। যদিও কাঁচামাল ও শ্রমিকের পরিশ্রম উৎপাদনের মূল উপাদান; কিন্তু এতে যে ব্যবস্থাপকেরও প্রচেষ্টা আছে তা কার্ল মার্কসের অর্থনীতিতে বিস্মৃত হয়েছে। কেবল শ্রমিকের অবদান রক্ষা করে মূলধন সরবরাহকারীকে বেমালুম অবজ্ঞা করা, এক শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে অন্য শ্রেণীকে বঞ্চিত করার মধ্যে কোন ইনসাফ থাকতে পারে না। তাই বর্তমানে এ মতবাদ কাগজের ফুল তথা অসার সাব্যস্ত হয়েছে। শ্রমিকদের এরূপ অধিকার আদায় ও রক্ষার কথা যারা বলেন তারাই শ্রমিক শ্রেণীর সর্বনাশ করেছেন এবং তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছেন। সমাজতন্ত্রের কথা বলে যেসব দেশে এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে উঁচু-নীচু স্তরের মানুষের তফাত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেখানে সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ শ্রমিকের জীবনযাপন ব্যবস্থার মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। ফলে গত শতকের শেষের দিকে মাত্র সত্তর বছরের পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে এ ব্যবস্থা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োজন যা হবে বৈষম্য ও অযৌক্তিক অসুন্দর নীতি হতে মুক্ত, সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে ইসলামই একমাত্র

www.pathagar.com

ভারসাম্যপূর্ণ শ্রমনীতি উপস্থাপন করেছে যা বিশ্বজনীন ও সবদিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলামী শ্রমনীতি অনুকরণীয় হওয়ার সাথে সাথে মালিক, শ্রমিক ও তার পারিশ্রমিককে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে সকলের সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন যাপন নিশ্চিত করেছে।

ইসলামী শ্রমনীতি (Islamic Labour Policy) নিম্নরূপ–

১. মানুষের শ্রম বিক্রয়যোগ্য পণ্য দ্রব্য নয় : কুরআন মজীদে বলা হয়েছে–

"নিশ্চয় আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে বিভিন্ন বাহনের উপর আরোহণ করিয়েছি। আমি তাদেরকে পবিত্র জিনিস দ্বারা রিযিক সরবরাহ করেছি। আমি তাদেরকে অধিকাংশ সৃষ্টির ওপর যা আমি সৃষ্টি করেছি সম্মান দান করেছি।"[৪৪]

এ আয়াত দ্বারা মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সম্মান নির্ণীত হয়েছে। এ সম্মান সকল মানুষের জন্য। যদি কোন শ্রমিক তার প্রয়োজনের জন্য পরিশ্রম করে, তার অর্থ এ নয় যে, সে তাকে মালিকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। আর মালিকের জন্য এটা চিন্তা করা উচিৎ নয় যে, সে শ্রমিকের শ্রম নিয়ে তাকে দাসে পরিণত করেছে; বরং মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোন কাজ সম্পাদন করার চুক্তি মূলতঃ Mutual Interest এর তথা পরস্পরের প্রয়োজন মেটানোর সামাজিক ব্যবস্থা। এখানে কেউ ক্রেতা আর কেউ বিক্রেতা, এমন নয়। এ কর্ম সম্পাদনের চুক্তি ভ্রাতৃত্ব ও পরস্পরের সম্মান রক্ষা করার ওপর নির্ভরশীল। কাউকে বড় করার এবং কাউকে ছোট করার জন্য নয়। মূলত এ পারিশ্রমিক সে সময়ের বিনিময় যা শ্রমিক উপার্জনের জন্য অন্য জায়গায় ব্যয় করতে পারত।

২. অন্যায় ও অমানবিক নির্যাতন রহিতকরণ (Prohibition of Injustice and Inhumane Traetment) : কাজ সম্পাদনে মালিক এ বিষয়ে খেয়াল রাখবে যে শ্রমিকের ওপর যেন কোন প্রকারের জুলুম না হয়। সাথে সাথে উভয়ের মধ্যে পারস্পিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা উচিত। শ্রমিক ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাকে বিশ্রাম করার সুযোগ দেয়া উচিত। যথাসময়ে তার পারিশ্রমিক আদায় করা উচিত। দুর্ঘটনায় শ্রমিককে সাহায্য-সহযোগিতা করা উচিত। এ পদ্ধতি ইসলাম নিশ্চিত করেছে।

৩. মজুরির শ্রেণীবিন্যাস ও ন্যায় সঙ্গত মজুরি (Categorization of Labour and Honorable Equitable Wages) : পারিপার্শ্বিক কারণে অনেক সময় শ্রমিকরা কাজ

---

৪৪. আল-কুরআন, ১৭ : ৭, ولقد كرمنا بنى آدم و حملناهم فى البر والبحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

www.pathagar.com

করতে বাধ্য হয় । এ সুযোগে মালিক পক্ষ তাদেরকে কম মজুরিতে কাজ করায়, কখনও কখনও শ্রমিককে কাজে লাগিয়ে কাজ শেষে মালিক ইচ্ছানুযায়ী মজুরি দেয়, যা অধিকাংশ সময় কম হয়। তাছাড়া মজুরি আদায়ে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিতে শ্রমিকরা নির্যাতিত হয়। ইসলামী শ্রমনীতিতে এসব অন্যায় কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এসব অন্যায়কে জুলুম হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী স. বলেন– "বিত্তবানের জন্য গরিমসি করা জুলুম।"

ইসলাম অমানবিক ও অন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে নিরুৎসাহিত করে। এর মূলোৎপাটন করে। ন্যায়ভিত্তিক শ্রমনীতির ধারণা উপস্থাপন করে। শ্রমিক এতটুকু মজুরি পাবে যাতে সে স্বচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতে পারে।

শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে একটি সঙ্গত ব্যবস্থা প্রচলন করার জন্যে রাষ্ট্রের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, যাতে শ্রমিকরাও শান্তি ও নিরাপদে জীবনযাপন করতে পারে। এ কারণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

ক. লভ্যাংশে শ্রমিকের জন্য অংশ নির্ধারণ।

খ. বার্ষিক বোনাস প্রদান।

গ. অভিজ্ঞ ও মনোযোগী শ্রমিকদের সম্মানিত করা।

ঘ. শ্রমিকদের যিম্মাদারী গ্রহণ করা (স্বাস্থ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সহযোগিতা করা)।

৪. বাধ্যতামূলক পরিশ্রম নিষিদ্ধকরণ (Prohibition of Forced Labour)

কুরআন মজীদের শিক্ষা বিশ্বজনীন। কুরআন মজীদের হুকুম-আহকাম জীবনের সকল স্তরে বাস্তবায়িত করে সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক শ্রম গ্রহণ নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন– "আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না।"[৪৫]

আল্লাহ তা'আলার বিধান হল, তিনি তার বান্দার ওপর সাধ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপিয়ে দেন না। এ আয়াতে মানুষকে সে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, তারা নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে বাধ্যতামূলক এমন কোন কাজে নিয়োজিত করতে পারবেন যা তাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সম্ভব হলে এদেরকে পরিপূর্ণরূপে মুক্তি দেয়াই উচিত।

নবী স. বলেন– "তাদের ওপর এমন কাজ চাপিয়ে দিওনা, যা তাদেরকে নিঃশেষ করে দেয়।"

---

৪৫. আল-কুরআন, ২ : ২৮৬, لايكلف الله نفسا الا وسعها

www.pathagar.com

নবী স. সাহাবীগণ এ নিয়মনীতির ওপর আমল করেছেন। ওসমান রা. বলেন- "যে দাসী কোন কাজ জানে না, তাকে উপার্জন করার জন্য বাধ্য করো না। আর শিশুদেরকেও কাজে বাধ্য করো না।"[৪৬]

অতএব, শ্রমিককে অতিরিক্ত কাজে বাধ্য করা যাবে না। এহেন কাজে তাদের লিপ্ত করা মানে শ্রমিকের অধিকার পদদলিত করা ও তার প্রতি জুলুম করার শামিল।

৫. অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরি (Extra Wage for Extra Labour)

যেভাবে শ্রমিক থেকে বাধ্যতামুলকভাবে কাজ আদায় করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে অনুরূপভাবে অতিরিক্ত কাজের জন্য বাড়তি মজুরি প্রদানের কথাও বলা হয়েছে। চুক্তির সময় কাজ করার জন্য যে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত হয়েছিল। যদি কোন কারণে কাজ বেড়ে যায় তবে তার জন্য অতিরিক্ত মজুরি প্রদান করতে হবে।

৬. বেতনের সাথে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ (Provision of Fringe Facilities)

ইসলামী শ্রমনীতি মজুরি আদায় করার সাথে সাথে শ্রমিকের জন্য কিছু অতিরিক্ত অধিকারও নিশ্চিত করে। যেমন- পেনশন সুবিধা, বৃদ্ধ বয়সে প্রদত্ত সুবিধা, মরণোত্তর সুবিধা ইত্যাদি নিশ্চিত করা ইসলামী শ্রমনীতির উপজীব্য বিষয়।

৭. মূলধন, অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রমের মধ্যে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা (Balance in capital)

কোন কিছু উৎপাদনে মূলধন, অভিজ্ঞতা ও শ্রমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এতে মূলধন সর্বোচ্চ হলেও শ্রমের ভূমিকা কম নয়। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকারের প্রতারণার মাধ্যমে শ্রমকে অবমূল্যায়ন করা হয়। এটি কখনও ন্যায়সঙ্গত নয়। নীতি নির্ধারণের জন্য প্রয়োজন হল, উৎপাদনের উপাদানগুলো (মূলধন, অভিজ্ঞতা ও শ্রম)'র মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করা। এতে উভয়পক্ষে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করাই মূল চালিকা শক্তি।

৮. কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াত শ্রমিকের প্রতি আচরণ ও আইনগত অধিকার নিশ্চিত করার আহবান জানায় (Ethical and legal Rights of the labourers)

ক. মানবিক অধিকার : আল্লাহ তা'আলা বলেন- "তোমরা কখনও পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু ব্যয় করবে।"[৪৭]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- "তারা আপনার কাছে প্রশ্ন করে যে, কি খরচ করবে? বলুন! প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ খরচ করো।"[৪৮]

এভাবে আরো অনেক আয়াতে আল্লহর পথে ব্যায় করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার একটি দিক হল শ্রমিকদের পরিপূর্ণ

---

৪৬. মালিক, ইমাম, *আল-মুয়াত্তা*, অধ্যায় : হুসনিল খালক, অনুচ্ছেদ : আল-আমরু বিররিফ্‌কি বিল মামলূক, আল-কাহেরা : জামহুরিয়্যাতু মিসরিল আরাবিয়্যাহ, ২০০৫, পৃ. ৪২৭ لاتكلفوا الامة غير ذات الصنعة الكسب - ولاتكلفوا الصغير الكسب

৪৭. আল-কুরআন ৩ : ৯২, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

৪৮. আর-কুরআন ২ : ২১৯, ويسئلونك ماذا تنفقون قل العف

www.pathagar.com

অধিকার আদায় করা। যথাসময়ে তার পারিশ্রমিক পাওয়া শ্রমিকের অধিকার। ধর্মীয় শিক্ষা হল, এ অধিকার পূর্ণরূপে আদায় করা মানবিক কর্তব্য, যা সকল মালিকের ওপর বর্তায়।

খ. আইনী অধিকার : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– "তাদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের জন্য অধিকার রয়েছে।"[৪৯]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– "তাদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের জন্য অধিকার রয়েছে।"[৫০]

কুরআন মজীদের ভাষায় বিত্তবানদের বিত্তে শ্রমিকের অধিকার রয়েছে; এটি শ্রমিকের আইনী অধিকার।

নবী স. বলেন– "যে অনুর্বর ভূমি আবাদ করল সেটি তার।"[৫১]

উপসংহার : জাতীয় জীবনে শ্রম ও শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। জনসংখ্যাকে জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে শ্রমের ক্ষেত্র গড়ে তুলতে হবে, কঠোর পরিশ্রমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং একই সাথে শ্রমের যথার্থ মূল্যায়ন করতে হবে। জনগণকে পরিশ্রমী করে তুলতে পারলে জাতীয় উন্নতি ত্বরান্বিত হবে; সকল অভাব-অনটনের অবসান ঘটবে। তাই জাতীয় জীবনে শ্রম ও শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। যে জাতি যত বেশী পরিশ্রমী, সে জাতি তত উন্নত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কায়িক শ্রমের প্রতি আমাদের দেশের মানুষের এক ধরণের অবজ্ঞা ও ঘৃণা রয়েছে। ফলে শিক্ষিত সমাজের একটা বিরাট অংশ কায়িক শ্রম থেকে দূরে সরে আসছে। চরম বেকারত্ব সত্ত্বেও তারা শ্রমবিমুখ। আর এ শ্রমবিমুখতার কারণেই আমরা আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছি। শ্রম ও শ্রমিককে ইসলাম অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখে। ইসলামেই রয়েছে শ্রমজীবীদের জন্য সকল সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান। শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে ইসলাম যে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে তার অনুসরণ ও অনুকরণেই নিহিত রয়েছে আমাদের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে ইসলামের দিক-নির্দেশনা মোতাবিক আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

৪৯. আল-কুরআন ৫১ : ১৯, وفى اموالهم حق للسائل والمحرو

৫০. আল-কুরআন ৭০-২৪, والذين فى اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم

৫১. আবূ দাউদ, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-খারাজ, অনুচ্ছেদ : ফী ইহ্য়ায়িল মাওয়াত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫৫, হাদীস নং-৩০৭৩ من احيا ارضا ميتة فهى له

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৬
এপ্রিল-জুন ঃ ২০১১

নবাবী আমলে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান*

[সারসংক্ষেপ : মধ্যবাংলায় মোগল আধিপত্য দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় সতেরো শতকের গোড়ার দিকে সম্রাট জাহাঙ্গিরের রাজত্বে সুবাদার ইসলাম খানের শাসনামলে (১৬০৮-১৩ খ্রি.)। সুবাদার ইসলাম খানের পর থেকে শুরু করে প্রাক নবাবী আমল পর্যন্ত কমবেশী ১৮/১৯ জন মোগল সুবাদার নিযুক্ত হন এবং বাংলা মুলুক শাসন করেন। এদের অধিকাংশই রাষ্ট্রদ্রোহীদের দমনে ব্যস্ত থাকায় ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে মনোনিবেশ করতে পারেননি। তা সত্ত্বেও এই সময়কালে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বে শাহজাদা মুহম্মদ শুজা (১৬৩৯-৬০ খ্রি.) সুবাদার হিসেবে তাঁর দীর্ঘ প্রায় ২১ বছরের শাসন পর্বে বাংলার ভূমিরাজস্বের সংস্কারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। তবে প্রকৃত ও ব্যাপক রাজস্ব সংস্কার শুরু হয় নবাব মুর্শিদকুলি খান (১৭১৭-২৭ খ্রি.)-এর আমলে।]

বাংলার নবাবী আমলের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা

শাহজাদা মুহম্মদ শুজা (১৬৩৯-১৬৬০)

বাংলায় প্রকৃত নবাবী আমলের শুরু নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময় থেকে হলেও সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র মুহম্মদ শুজার রাজত্বকাল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হেতু আমরা প্রথমে তাঁর সময়ের ভূমিকর বা ভূমিরাজস্ব নিয়ে আলোচনা করব।

সম্রাট আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী রাজা টোডরমলের পরে সুবাদার শাহজাদা শুজাই ছিলেন প্রথম মোগল প্রাদেশিক শাসনকর্তা যিনি বাংলার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ 'আসল-তুমারি জমা' বা ভূমি রাজস্বের খতিয়ান (Rent-Roll) তৈরি করেছিলেন। আর এটি ছিল মোগল বাংলার দ্বিতীয় রাজস্ব বন্দোবস্ত। এ ছাড়াও শুজা দীর্ঘ ২০ বছরের শাসন আমলে একটি সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ গঠনের সুযোগ পেয়েছিলেন। Firminger-এর The fifth Report-এ বলা হয়েছে "In after times the subahdari of sultan Shuja came to be regarded as an epoch of good and equitable administration".[১]

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ, বাড্ডা আলাতুন্নেছা স্কুল এন্ড কলেজ, বাড্ডা, ঢাকা।

১. Walter, The Ven, Kelly Firminger, *Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report*, Delhi : Today and Tomorrow's Printers & Publishers,1977, p.363

www.pathagar.com

স্বভাবতই শুজার পক্ষে বাংলার জন্য নতুনভাবে একটি রাজস্ব-বন্দোবস্ত প্রণয়ন করার সময় ও সুযোগ দুই-ই জুটেছিল। শাহ শুজার রাজত্বকালে ১৬৫৮ সনে বাংলার এই নতুন রাজস্ব-বন্দোবস্ত প্রণীত হয়। পরবর্তী প্রায় সুদীর্ঘ ৬৪ বছর তথা নবাব মুর্শিদকুলির সময়ে ১৭২২ সনে বাংলার তৃতীয় রাজস্ব-বন্দোবস্ত চালু হওয়ার আগ পর্যন্ত এটি কার্যকর থাকে। উল্লেখ্য, শেষোক্ত 'আসল-তুমারি জমা' তৈরিতে একে ভিত্তি ধরে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-সংস্কার করা হয়। সুতরাং এদিক দিয়েও শুজার রাজত্বকাল বাংলার রাজস্ব ইতিহাসের জন্য সমান তাৎপর্যপূর্ণ।[২] এ অধ্যায়ে নবাবী আমলের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ইতিহাস আমাদের পর্যালোচ্য হলেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তাঁর ব্যবস্থা নিয়েও আমরা এখানে কিছুটা আলোকপাত করবো।

১৬৩৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে সম্রাট শাহজাহান তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মুহম্মদ শুজাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান। তিনি ইসলাম খান মাশাহেদীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, শাহজাদা শুজাই ছিলেন বাংলার প্রথম মোগল সুবাদার যিনি একাধারে সম্রাট-তনয় ও কেন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৩]

শুজা তাঁর দীর্ঘ শাসনকালে বাংলার আর্থ সামাজিক জীবনের তথা 'কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের' ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছিলেন। মূলত তাঁর রাজত্বকালে বাংলায় 'নিরবচ্ছিন্ন শান্তি' বিরাজমান ছিল। তাই বলা হয়েছে, "With the coming of prince Shuja to Bengal as viceroy began a long period of peace for this province."[৪]

তাঁর শাসন আমলে প্রচলিত রাজস্ব নীতির অনুকূলে রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলেও তার মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। তাঁর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের ফলে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ জমিদার ও স্থানীয় রাজন্যবর্গ নিয়মিত কর ও উপঢৌকন প্রদান করতেন। রাষ্ট্রে শান্তি -শৃংখলা বজায় থাকায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, 'শুজার সুদীর্ঘ শান্তিপূর্ণ শাসনের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি হয়।'[৫]

---

২. ইসলাম, কাবেদুল, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা,* ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১, খ. ১, পৃ.৩০৯-৩১০

৩. Dani, Dr. বলেন, 'Shah Shuja was the first Mughal prince posted in Bengal as viceroy.' (Ahmad, Dr. Hasan Dani, *Dacca : A Record of its Changing Fortunes,* Dacca : People's Publishing House, 1962, P.60

৪. Jadunath, Dr. Sarkar, Edited, *The History of Bengal,* Vol,II, Dacca : The Univercity of Dacca, 1963, p.370

৫. মজুমদার, ড. রমেশ চন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* খ. ২, (মধ্য যুগ), কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৩, পৃ.১৪৭

www.pathagar.com

ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারে শুজার প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় ইউরোপীয় বণিকগণ বিশেষ করে ডাচ (ওলন্দাজ) ও ইংরেজরা যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল। শুজা মাত্র তিন হাজার টাকা শুল্কের বিনিময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলায় অবাধ বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করেন।[৬] মূলত এই বিরাট সুবিধার ফলে ইংরেজ বণিকরা অল্প সময়ে বাংলায় অবাধ বাণিজ্য বিস্তার করে সমৃদ্ধ হতে সুযোগ পায়।[৭] যদিও এই সুযোগ পরবর্তীতে বাংলার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নবাব মুর্শিদকুলি খান (১৭১৭-১৭২৭)

ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা অধিক আলোচিত উত্তরাধিকার যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মিরজুমলার কাছে শুজার শোচনীয় পরাজয় ও সুবাদারি হারানোর পর প্রায় ৫৪ বছরব্যাপী (মুর্শিদকুলির সুবাদারি লাভের পূর্ব পর্যন্ত) ৮ জন সুবাদার বাংলায় দায়িত্ব পালন করেন। এই দীর্ঘ কালপর্বে শাহ শুজা প্রণীত রাজস্ব ব্যবস্থা চালু ছিল। বস্তুত শাহ শুজার পরে সতেরো শতকে আর কোন বন্দোবস্তের তথ্য পাওয়া যায় না।[৮]

মিরজুমলার কাছে শুজার পরাজয় ও তাঁর আরাকানে পলায়নের (৬ মে, ১৬৬০) খবর পাওয়ার পর সম্রাট আওরঙ্গজেব একই বছর বিজয়ী সেনাপতি মিরজুমলাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন (৯ মে, ১৬৬০)। মিরজুমলা তিন বছর শাসন কার্য পরিচালনা করে মৃত্যু বরণ করেন (মার্চ, ১৬৬৩)।[৯]

মিরজুমলার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রায় বছর খানেক বাংলার প্রশাসনিক ও সমাজ জীবনে বেশ অশান্তি দেখা দেয়। ফলে জনজীবনের দুর্গতি দূরীকরণ ও শাসনকার্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সম্রাট অনতিবিলম্বে তাঁর দরবারের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি শায়েস্তা খানকে সুবাদার করে পাঠান। অতঃপর নতুন সুবাদার প্রায় দীর্ঘ ২২/২৩ বছর (মাঝখানে ১৬৭৮ ছাড়া) বাংলায় একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম রাখেন। শায়েস্তা খানের সুযোগ্য পুত্র বুজুর্গ উমেদ খানের নেতৃত্বে মোগল বাহিনী ফেনী নদী পার হয়ে তৎকালীন আরাকান রাজ্যের সীমানায় অনুপ্রবেশ করে চট্টগ্রাম জয় করে (২৭ জানুয়ারি, ১৬৬৬)।[১০]

---

৬. শোনা যায়, শুজার এক ঘনিষ্ট নিকট আত্মীয় গাব্রিয়েল ব্রাউটন নামক এক ইংরেজ চিকিৎসকের আন্তরিক সেবা-শুশ্রুষা-চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় তিনি তাদেরকে এই সুবিধা দিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Krishna Sur, Dr. Atul, *History and culture of Bengal*, Delhi : Best Books, 1992, p.114.

৭. রহিম, ড. এম.এ ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯২, পৃ. ২৬৮

৮. করিম, ড. আবদুল, (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, (১৭০৪-১৯৭১), ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯২, খ. ২, পৃ.১৫০

৯. মজুমদার, ড. রমেশ চন্দ্র , *বাংলাদেশের ইতিহাস*, (মধ্য যুগ), প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৪৮

১০. এই যুদ্ধাভিযানের বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মাহবুবুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, (নবাবী আমল)

www.pathagar.com

মধ্যকালীন বাংলার সমাজ জীবনে দীর্ঘকালীন শান্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা বিশেষত দ্রব্য মূল্য অত্যন্ত নীচু স্তরে রাখাও শায়েস্তা খানের আমলের অন্যতম ঘটনা।[১১] কথিত আছে, তাঁর আমলে টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত[১২] যা আপাত অবিশ্বাস্য মনে হলেও অসত্য নয়।

শায়েস্তা খানের পর বাংলার সুবাদার হন আওরঙ্গজেবের ধাত্রীপুত্র খান-ই জাহান বাহাদুর (জুন, ১৬৮৮)। শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন খুবই অযোগ্য। ফলে এক বছর পরেই (জুলাই,১৬৮৯) সম্রাট তাকে পদচ্যুত করে তদস্থলে ইব্রাহীম খানকে নিযুক্ত করে পাঠান। ইব্রাহীম খান ছিলেন অপেক্ষাকৃত কোমল হৃদয়ের অধিকারী।[১৩] তাঁর কোমলতার সুযোগে চারিদিকে বিদ্রোহ শুরু হয়। এ সংবাদ অবগত হয়ে সম্রাট আওরঙ্গজেব ইব্রাহীম খানকে পদচ্যুত করেন এবং তদস্থলে স্বীয় পৌত্র আজিমউদ্দিন ওরফে আজিম-উশ-শানকে সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান।[১৪] তিনি ১৬৯৭ থেকে ১৭১২ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন। তাঁর সময়েও ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হায়দরাবাদের সুযোগ্য দিওয়ান কারতালব খান (পরবর্তীতে স্বনামখ্যাত মুর্শিদকুলি খান[১৫])-কে সম্রাট আওরঙ্গজেব সুবে বাংলার সম্রাট নিযুক্ত করে পাঠান। এক কথায় তিনি ছিলেন 'খুব দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্মচারী'।[১৬]

মুর্শিদকুলি খান বাংলার দিওয়ান[১৭] হিসাবে আসার পর সুবে বাংলার ভূমিরাজস্ব ও আর্থিক প্রশাসনে অভূতপূর্ব শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিভিন্ন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে বাংলার রাজকোষে বার্ষিক বিপুল পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হয়। ফলে প্রদেশের আয়ের অর্থ থেকে তিনি শুধু প্রদেশের যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যয় মেটাননি, উপরন্তু দাক্ষিণাত্যে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত ও প্রতিনিয়ত অর্থ সংকটের সম্মুখীন সম্রাটকে

---

১১. 'তাওয়ারিখ-ই-ঢাকার লেখক বলেন, 'শায়েস্তা খানের আমলে দেশে শান্তি ছিল। লোকজনের অবস্থা ভাল ছিল এবং সকলেই স্বচ্ছল জীবন যাপন করত। (তায়েশ, মুনশী রহমান আলী, *তাওয়ারিখ-ই-ঢাকা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৮, পৃ. ৬৩

১২. Jadunath, Dr. Sarkar, *The History of Bengal,* Vol.II., Op.cit, p.391

১৩. Ibid, p.392

১৪. ইসলাম, কাবেদুল, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২

১৫. তার কর্মদক্ষতায় খুশি হয়ে ১৭০২ খ্রি. আওরঙ্গজেব তাঁকে 'মুর্শিদকুলি খাঁ' উপাধি দান করেন। *(বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'* খ. ৩; দ্বিতীয় পর্ব, ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪)

১৬. মজুমদার, ড. রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

১৭. 'দিওয়ান'–প্রাদেশিক প্রশাসনে 'দিওয়ান' ছিলেন সুবাদারের পরবর্তী সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি এবং ভূমিরাজস্ব বিষয়ের সর্বেসর্বা। (Dr. Abdul Karim, Murshid *Quli Khan and His Times,* Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1959, p.65

www.pathagar.com

বার্ষিক ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকার নিয়মিত 'পেশকাশ'[১৮] প্রেরণ করতেও সক্ষম হন। স্বভাবতই বৃদ্ধ সম্রাট আওরঙ্গজেব দিওয়ানের প্রতি যারপরনাই প্রীত ও আস্থাশীল হন এবং তাকে পুরস্কৃত করেন।[১৯]

১৭০৭ সনের গোড়ার দিকে (ফেব্রুয়ারি ২০) সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হলে মুর্শিদকুলি খান-এর মাথার ওপর দিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয়ের সাময়িক বিলুপ্তি ঘটে। দিল্লীর মসনদের দখলদারিত্ব নিয়ে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে তিনি সাময়িক সমস্যার মধ্যে পড়লেও স্বীয় দূরদর্শিতা ও অবিচল আদর্শের উপর স্থির থাকার কারণে বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন। ১৭০৮ থেকে ১৭০৯ সন পর্যন্ত পূর্ণ দু'বছরকাল তিনি দাক্ষিণাত্যের দিওয়ানগিরি করেন। ১৭১০ সনে পুনরায় তাঁকে বাংলার দিওয়ানী ও আজিম-উশ-শানের জায়গির তত্ত্বাবধানের ভার দেয়া হয়। এমনিভাবে একের পর এক দায়িত্ব লাভের পর সম্রাট ফররুখ শিয়র (১৭১৩-১৭১৯) মুর্শিদকুলিখানকে ১৭১৭ সনের অক্টোবর মাসে বাংলার পূর্ণাঙ্গ সুবাদার হিসাবে নিযুক্ত করেন এবং অত্যন্ত ভূয়সী প্রশংসাসূচক উপাধি নাসিরি, নাসির জঙ্গ-এ ভূষিত করেন। ১৭২৭ সনের ৩০ জুন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[২০]

বাংলার দিওয়ান ও সুবেদার হিসাবে মুর্শিদকুলি খান ছিলেন প্রাদেশিক রাজস্ব বিভাগের সর্বময় কর্তা। তিনি এখানকার অবস্থা বুঝে প্রদেশের ভূমিরাজস্বের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করেন।[২১] তাঁর ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তে রায়তদের দেয় রাজস্বের প্রকৃত হার কী ছিল সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কিছু জানা যায় না। তবে বিষয়টি জ্যেষ্ঠ মোগল সম্রাটদের বিশেষ করে সম্রাট আকবর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত শাসককুলের সময়কার প্রেক্ষাপটে বিচার করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তার সময়ে ভূমিরাজস্বের হার কোন অবস্থাতেই উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশের অধিক ছিল না।[২২] তবে তার সময়ে ভূমিরাজস্বের হার যাই থাক না কেন এটা ঠিক যে, তিনি ভূমিরাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরতা, নিয়ম-নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'তাওয়ারীখ-ই-বঙ্গলাহ'-এর লেখক বলেন, "মুর্শিদকুলি খান নিজে দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করে বালাম বই-এ প্রত্যেক দিন সই করতেন।

---

১৮. জমিদার ও অন্য কোনো পদে নিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সরকারকে দেয়া নজর-নেওয়াজ। নির্দিষ্ট রাজস্বের অগ্রিম অংশ সরকারকে প্রদান করা। (হক, কাজী এবাদুল, *ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ. ৩৬৪)

১৯. ইসলাম, কাবেদুল, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৪

২০. William, Dr. Wilson Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol.IX., p174

২১. করিম, ড. আবদুল, সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস, (১৭০৪-১৯৭১)*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯২, খ. ১, পৃ.৬৭

২২. ইসলাম, কাবেদুল, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬

www.pathagar.com

তিনি প্রত্যেক মাসে নির্ধারিত হারে রাজস্ব আদায় করতেন। সরকারী রাজস্বে ঘাটতি দেখা দিলে খেলাপি জমিদার, আমিল, কানুনগো এবং মুৎসুদ্দিদের দিউয়ানী দফতরে আটক থাকতে হতো। খেলাপিদের খাদ্য দেয়া হতো না এবং পানি পান করতে দেয়া হতো না তাদের এভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ বন্দি করে রাখা হতো এবং কোন কোন সময় তাদের মাথা নিচের দিকে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হতো, বেত্রাঘাত করা হতো।[২৩]

বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মুর্শিদকুলি খান সুবে বাংলার ভূমিরাজস্ব বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুর্শিদকুলি খানের সুযোগ্য শাসনে স্বল্পকালের মধ্যেই বাংলা তার হৃত গৌরব ফিরে পায়। তাঁর আমলে বাংলা প্রদেশের টাকা দিয়ে তিনি শুধু এখানকারই প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করেননি, বরং দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধমান ও প্রতিনিয়ত অর্থ-সংকটের সম্মুখীন সম্রাট আওরঙ্গজেবকেও প্রতি বছর নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করতেন। দিল্লীতে অর্থ প্রেরণের এই ধারা মুর্শিদকুলি খান তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছিলেন। যত দূর জানা যায়, তিনি সর্বমোট ২৫ কোটি টাকার মতো প্রেরণ করেছিলেন।[২৪]

একজন রাজস্ব-প্রশাসক হিসাবে মুর্শিদকুলি খানের খ্যাতি যে পরিমাণ, তার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না ন্যায় বিচারক হিসাবে তাঁর প্রসিদ্ধি। প্রতি সপ্তাহে দু'দিন তিনি স্বয়ং বিচার কার্য করতেন।[২৫] তিনি সকলের প্রতি সমান দৃষ্টিতে ন্যায়-বিচার করতেন। তাঁর ন্যায় বিচারের প্রকৃতি এমনই ছিল যে, অপরাধ করার জন্য তিনি স্বীয় পুত্রকে পর্যন্ত প্রাণদণ্ড দিতে কুণ্ঠিত হননি।

নবাব মুর্শিদকুলি খানের প্রায় সিকি শতাব্দীর শাসনকালে বাংলার হিন্দু-মুসলিম সকল রায়তশ্রেণীর আর্থিক সামর্থ্যের বিকাশ না ঘটলেও তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অসচ্ছল ছিল না। অধিকন্তু সামাজিক জীবনে অভূতপূর্ব শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় থাকায় দিল্লী কেন্দ্রিক মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গা গড়ার ডামাডোল বাংলাকে মোটেও আচ্ছন্ন করতে পারেনি। স্বীয় যোগ্যতা বলেই মুর্শিদকুলি বাংলায় দিওয়ানি ও পরবর্তীকালে সুবাদারি শুরু করেছিলেন, যে কোন বিচারে তাঁর মিশন সফল হয়েছিল-এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।[২৬]

---

২৩. করিম, ড. আবদুল (সম্পাদিত), *'বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.১৫২

২৪. মুখোপাধ্যায়, ড. সুবোধকুমার, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, (অষ্টাদশ শতাব্দী), কলকাতা : কে. পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৫, পৃ.৯

২৫. তায়েশ, মুনশী রহমান আলী, *তাওয়ারিখ-ই-ঢাকা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩

২৬. করিম ড. আবদুল, বিষয়টি চমৎকার বলেছেন, The evidence of agriculture loans (taqawi) having been advanced, of the moderate assessment of revenues, the policy of basing assessment on the productivity of the land and the capacity of the husbandmen to

www.pathagar.com

নবাব শুজাউদ্দিন মুহম্মদ খান (১৭২৭-১৭৩৯)

নবাবী আমলের বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ও সোপান মুর্শিদকুলি খানের যুগ থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। রাজস্ব পরিচালনার নীতি, রাজস্বের গতি ও প্রবণতা এবং রাজস্বের সঞ্চয় ও ব্যয়ের মৌল প্রকরণগুলো মুর্শিদকুলি খান নির্দিষ্ট করে গিয়েছিলেন।[২৭] শুজা উদ্দীনের উত্তরসূরী ও পুত্র সরফরাজ খান এবং পরবর্তী নবাবেরা কেউ স্থিত ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার মূল সূত্র ও কাঠামোর বিশেষ কোন পরিবর্তন করেননি। সম্ভবত এর কোন প্রয়োজনও ছিল না। তারা শুধু 'আবওয়াব'[২৮] বৃদ্ধি করেই রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের সঙ্গে আয়ের সঙ্গতি রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন।

মুর্শিদকুলি খানের কোন পুত্র সন্তান ছিল না বিধায় তাঁর মৃত্যুর পরে জামাতা শুজাউদ্দিন মুহম্মদ খান বাংলার মসনদ অধিকার করেন (জুলাই, ১৭২৭)। মসনদে আরোহণের পর তিনি মুর্শিদকুলি খান প্রবর্তিত 'মাল জামিনি' ব্যবস্থা তথা ইজারাদারদের সঙ্গে সম্পাদিত রাজস্ব বন্দোবস্ত অব্যাহত রাখেন। এর পাশাপাশি তিনি জমিদারদের সঙ্গেও সম্পর্কোন্নয়নের সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে তিনি উদার নৈতিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।[২৯]

ভূমিরাজস্ব অনাদায় ও অন্যান্য কারণে যে সকল জমিদার-তালুকদারকে মুর্শিদকুলি খান কয়েদ করে নানারূপ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেছিলেন শুজাউদ্দিন তাদেরকে কিছু শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দেন। 'সিয়ারে মুতাআখখিরীন' এর লেখক সৈয়দ গোলাম হুসায়ন খান তাবতাবায়ী এ সম্পর্কে বলেন, নিজের শাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করে শুজা খাঁ যে সকল জমিদার ও অন্যান্য ভূমির মালিককে নির্দোষ এবং অপরাধ বা প্রতারণামুক্ত দেখতে পেলেন, তাদেরকে বিদায় দিলেন।[৩০] বকেয়া খাজনা কিস্তিতে এবং ভবিষ্যতে তা নিয়মিত যথাসময়ে প্রদানের অঙ্গীকারে তিনি জমিদারদের সঙ্গে নতুনভাবে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। দীর্ঘদিন বিবিধ উৎপীড়ন ও তীব্র যন্ত্রণা ভোগের পর

---

pay, of the strict collection of revenues and their regular dispatch to the imperial court, all these suggest that Murshid Quli Khan's reforms were aimed at achieving the double purpose of collecting as much revenue as possible and at the same time making the peasants happy and prosperous.'(Dr. Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and his Times*, Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1963, p.90

২৭. গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, *ইতিহাস অনুসন্ধান-৩*, কে.পি.বাগচী এন্ড কোম্পানী, ১৯৮৮, পৃ.১৭৭

২৮. 'আবওয়াব'-মুর্শিদকুলি খান কর্তৃক জমিদারদের উপর ভূমিরাজস্ব বহির্ভূত কর বা সেস

২৯. ইসলাম, কাবেদুল, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩

৩০. গোলাম, সৈয়দ হুসায়ন খান তাবতাবায়ী, *রিয়াজ-উস-সালাতীন* (অনু. ড. এম আবদুল কাদের), ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮, পৃ.৩০৯

www.pathagar.com

মুক্তির অনাবিল আনন্দে জমিদারগণও নতুন নবাবের 'সদাশয়তা ও মহত্ত্বের প্রশংসা করেন এবং মহান আল্লাহর নিকট তাঁর সুদীর্ঘ জীবন কামনা করে সর্বসম্মতভাবে উচ্চৈঃস্বরে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, এখন হতে তারা পূর্বাপেক্ষা সহস্রগুণ নিয়মিতভাবে খাজনা দিবেন।[৩১]

ভূমিরাজস্ব নীতি ও কাঠামোর ক্ষেত্রে শুজাউদ্দিন খান তার পূর্বসূরী মুর্শিদকুলি খানের প্রবর্তিত ব্যবস্থাকেই বহাল রেখেছিলেন। তবে মুর্শিদকুলি খান ভূমিরাজস্ব বহির্ভূত কর বা 'আবওয়াব'-এর ক্ষেত্র ও পরিমাণ-কে যেখানে অত্যন্ত সীমিত ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, সেখানে শুজাউদ্দিনের সময়ে তা অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। মুর্শিদকুলির সময়ে কর খাতে বাৎসরিক আয় হতো ২,৫৮,৮৫৭ টাকা।[৩২] আর শুজাউদ্দিনের সময় বেড়ে হয়েছিল ১৯,১৪,০৯৫ টাকা।[৩৩] উল্লেখ্য, ১৭২৮ সনে শুজাউদ্দিন মুর্শিদকুলির প্রবর্তিত রাজস্ব বন্দোবস্তের যে ঈষৎ সংশোধিত তালিকা ('শুমার'নামে পরিচিত) প্রকাশ করেন, যা বাংলার ৪র্থ ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত হিসেবে পরিচিত এবং আধুনিক ঐতিহাসিকগণ যাকে 'important land mark in the history of Settlement'[৩৪] বলে মত প্রকাশ করেছেন, এতে পূর্বাপেক্ষা যে রাজস্ব বৃদ্ধি ঘটেছিল তা ছিল মূলত আবওয়াব বৃদ্ধির ফল বা বহিঃপ্রকাশ।

নবাব আলিবর্দি খান (১৭৪০-১৭৫৬)

নবাব শুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সরফরাজ খান বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার হন (১৩ মার্চ, ১৭৩৯)। চরিত্রগত দিক থেকে তিনি ছিলেন পিতার মতোই পরম ইন্দ্রিয়-পরায়ণ কিন্তু প্রশাসক হিসাবে তার প্রধান দুর্বলতা ছিল তিনি পিতার ন্যায় অভিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না এবং যথাসময়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার দৃঢ় মনোবলের অভাব ছিল। স্বভাবতই বলা যায় 'তিনি যেই উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই উচ্চাসনের উপযুক্ত তিনি ছিলেন না।[৩৫] তা সত্ত্বেও নবাব সরফরাজ খান প্রায় ১ বছর ১ মাস তিন প্রদেশের সুবাদারের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সময়কার বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসন সম্বন্ধে একটি কথাই বলা যায়, তিনি পিতা শুজাউদ্দিনের অনুসৃত প্রথা-পদ্ধতিই বহাল রেখেছিলেন।[৩৬]

---

৩১. রহীম, ড. আবদুর, ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৯

৩২. রহিম, ড. এম.এ, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.১২০

৩৩. Ed.By Romesh, Dr. Chandra.Majumdar, *The History and culture of the Indian people: The Maratha Supremacy*, Vol. VIII., Bomby : Bharatiya Bidya Bhavan, 1971, p.107

৩৪. The Report of 1940, Vol.II., p.107

৩৫. করিম, ড. আবদুল, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭০৪-১৯৭১) প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.৮৬

৩৬. ইসলাম, কাবেদুল, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৭

www.pathagar.com

১৭৪০ সনের ৯ এপ্রিল আলিবর্দি খান নবাব শুজা উদ্দিনের পুত্র সরফরাজকে গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করে অবৈধভাবে বাংলার মসনদ জবর-দখল করেন। অবৈধ পন্থায় প্রাপ্ত ক্ষমতাকে বৈধকরণে নতুন নবাব আলিবর্দি খান সরফরাজ খানের রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ (৭০ লক্ষ টাকার নগদ অর্থ ও তৎসহ স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান পদার্থের সমন্বয়ে প্রায় ৫ কোটি টাকা মূল্যমানের অলংকারাদি[৩৭]) স্বীয় দোষ লুকাবার জন্য অন্যায়ভাবে চতুর্দিকে দু' হাতে ব্যয় করেন। ফলে বাংলার সিংহাসন জোর পূর্বক দখলের ফলে নবাব আলিবর্দি খানের প্রতি যে বৈরী ও প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল তা অনেকটাই কেটে গিয়েছিল।[৩৮]

ক্ষমতারোহণের পর তিনি নবাব মুর্শিদকুলি খান ও শুজাউদ্দিন খানের আমলে অনুসৃত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন।[৩৯] সার্বিক প্রশাসনে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ তিনি শুরু করেছিলেন। কাজগুলো করার সুযোগ তিনি খুব স্বল্পকালের জন্য লাভ করেন। ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলার নবাব হয়ে প্রবীণ[৪০] আলিবর্দি বেশী দিন সুখ-শান্তি ভোগ করতে পারলেন না বা বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা ও শাসনসংক্রান্ত সুপরিকল্পনাগুলো বাস্তবে রূপ দেবার সুযোগ পেলেন না।[৪১]

আলিবর্দির শাসনকালের ভূমিরাজস্ব বিভাগসহ সার্বিক প্রশাসনযন্ত্রের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও অপরিহার্য বিষয় ছিল হিন্দু রাজকর্মচারীদের অবস্থান। ড. কে.এম. করিম বলেন, 'নবাব আলিবর্দি খানের সময়ে হিন্দু রাজকর্মকর্তাদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। তারা ঐ সময়ে সামরিক, বেসামরিক ও রাজস্ব বিভাগে বিপুল সংখ্যক পদ লাভ করেন।[৪২] তবে অনেক হিন্দুই প্রশাসনের দৈনন্দিন কাজকর্মে ও পরামর্শে তাদের অপূর্ব দক্ষতা ও যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও শ্রমের পরিচয় দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু এর মধ্যেই সুযোগসন্ধানী কেউ কেউ বাংলার দীর্ঘ কয়েকশত বছরের মুসলিম শাসন যুগের অবসানের লক্ষ্যে অন্তরালে নিঃশব্দে কাজ করে চলেছিল-ইতিহাস যার নীরব স্বাক্ষী।[৪৩]

---

৩৭. Islam Dr. Sirajul, , (Edited), *The History of Bengal,* Vol.II, Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, p.442

৩৮. ইসলাম, কাবেদুল, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯

৩৯. রহিম, ড. আব্দুর ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ.৩২০

৪০. আলিবর্দি খান যখন বাংলার মসনদ দখল করেন তখনই তার বয়স ষাটের বেশী ছিল। (ড. রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৯)

৪১. বন্দ্যোপাধ্যায় ড. অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* খ. ৩, দ্বিতীয় পর্ব, কলিকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৯৩, পৃ.৩০৯

৪২. ইসলাম, ড. সিরাজুল, (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস,* (১৭০৪-১৯৭১), ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯২, খ. ৩, পৃ.৩৯

৪৩. ইসলাম, কাবেদুল, *বাংলাদেশের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা,* প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯১-৯২

www.pathagar.com

সম্রাট আলিবর্দি খান যে সময়টুকু পেয়েছিলেন সেটুকুই জনদরদী শাসকের মতো প্রজার কল্যাণ ও কৃষির উন্নয়নে ব্যয় করেছিলেন। প্রতিকূল সময়ের বিচারে যোগ্যতায় ও গুণে পূর্বসূরী কারো তুলনায় তিনি কম ছিলেন না। বরং এক অর্থে, 'সুবায় সুশাসন স্থাপনের জন্য তিনি যেরূপ বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে তাকে মুর্শিদকুলি খাঁ অপেক্ষাও প্রশংসা করতে হবে।[৪৪]

নবাব সিরাজউদ্দৌলা

১৭৫৬ সনের ১০ এপ্রিল বেশ কিছু দিন শোথ রোগে শয্যাশায়ী থাকার পর নবাব আলিবর্দি খান ৮০ অথবা ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মিরজা মুহাম্মদ ওরফে সিরাজউদ্দৌলা[৪৫] আলিবর্দির স্থলাভিষিক্ত হন। এ সময় সিরাজউদ্দৌলার বয়স হয়েছিল ২৩ বছর।[৪৬]

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের এই তরুণ নবাবের জন্য তাঁর প্রাজ্ঞ পূর্বসূরী ঘরে-বাইরে প্রচুর শত্রু ও সমস্যা রেখে গিয়েছিলেন। ড. করীমের ভাষায়, 'আলিবর্দিখান তার প্রিয় সিরাজের জন্য অনেক সমস্যা রেখে যান। তাঁর নিজের পরিবারেই ছিল অনৈক্য এবং তাদের মধ্যেও ছিল সিরাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। সিরাজ মসনদে বসেই এই সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হন এবং দেখতে পান, চতুর্দিকে ষড়যন্ত্রকারীদের জাল পাতা রয়েছে। তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে যেমন তাঁর শত্রু ছিল, সেনাবাহিনী এবং বে-সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যেও তাঁর শত্রুর অভাব ছিল না।[৪৭] অন্যদিকে ইংরেজ বণিক শক্তিও যারা ইতঃপূর্বে কখনও কখনও মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়াতে চাইলেও মুর্শিদকুলি থেকে আলিবর্দি খান পর্যন্ত সুযোগ্য ও কঠোর শাসনের কারণে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারলেও এ সময় তারাও অদম্য সাহস ও নবীন স্পৃহায় মাঠে নেমে পড়ে।

---

৪৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, দ্বিতীয় পর্ব, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ.১৪

৪৫. আলিবর্দি মিরজা মুহম্মদের জন্য এই উপাধি (সিরাজউদ্দৌলা) বাদশাহের দরবার থেকে আনয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। Dr. William Wilson Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol.IX., Op.cit, p.185.

৪৬. H.H. Dodwell, *The Cambridge History of India : British India*, Vol.I., Calcatta : S. Chand & Co, 1987, p.141. ড.এম.এ রহিমের মতে এ সময়ে সিরাজউদ্দৌলার বয়স ছিল ২২ বছর। ড.রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ.৩২৫; ড. রাম গোপাল সিরাজের জন্ম সন উল্লেখ করেছেন ১৭২৯-সে হিসেবে সিংহাসনে আরোহনকালে নবাবের বয়স হয়েছিল ২৬/২৭ দেখুন, Dr. Ram Gopal, *How The British Occupied Bengal*, Calcatta : Asia publishing House, 1963, p.61.

৪৭. ইসলাম, ড. সিরাজুল, (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭০৪-১৯৭১) খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৫

www.pathagar.com

মূলত নবাব সিরাজউদ্দৌলা ঘরে-বাইরের যে প্রবল প্রতিকূলতা ও ষড়যন্ত্রের মধ্যে তাঁর স্বল্পকালীন শাসন ক্ষমতা নির্বাহ করেছিলেন তাতে তাঁর পক্ষে পূর্বসূরীদের ন্যায় প্রশাসনিক ও ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে যে উল্লেখযোগ্য কোন নীতি ও সংস্কার সাধন সম্ভব হয়নি তা সহজেই অনুমেয়। তবে তিনি প্রচলিত ব্যবস্থাকেই অব্যাহত রেখেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ড.এম.এ রহীম বলেন, "Sirajuddaulah followed his grandfather policy."[৪৮]

তরুণ নবাবের অনভিজ্ঞতা, চঞ্চলমতি মানসিকতা, প্রশাসনিক বিচক্ষণতার অভাব এবং সর্বোপরি প্রতিনিয়ত যুদ্ধ-ব্যস্ততা তাঁকে দৈনন্দিন প্রশাসনের মতো ভূমিরাজস্ব বিভাগের কাজকর্মে মনোযোগের প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ দেয়নি। যে কারণে স্বভাবতই এ সময়ে কৃষক-প্রজার অবস্থা পূর্বের তুলনায় ক্রমাবনতির দিকে যাচ্ছিল।[৪৯]

নবাব মীর কাশিম আলী খান (১৭৬০-১৭৬৩)

পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও শোচনীয় মৃত্যুর পর সেনাপতি মীর জাফর আলি খান 'বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার নিজামতের মসনদে আরোহণ করেন (২৯ জুন, ১৭৫৭)। কিন্তু ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের বিশেষ করে লর্ড ক্লাইভের হাতের ক্রীড়নক অযোগ্য মীর জাফর যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতার মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার রাজনীতির শীর্ষআসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন; সর্বোপরি নবাবের চতুর্দিকে ঘিরে থাকা সুযোগসন্ধানী স্বার্থান্বেষী মহলের বিশেষত তারই জামাতা ও পরবর্তী নবাব মীর কাশিমের ইংরেজদের সাথে কৃত গোপন সন্ধির কারণে মীর জাফর আলী খানকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করে (২০ অক্টোবর, ১৭৬০)। কিন্তু ইত্যবসরে বাংলার রাজকোষের তথা অর্থনীতির ক্ষতি তিনি প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছিলেন। এক বর্ণনায় দেখা যায়, মীরজাফর স্বীয় অল্পাধিক ৩ বছরের রাজত্বকালে বাংলার রাজকোষ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে পলাশির যুদ্ধজনিত জনবল, অস্ত্রশস্ত্র ও অবকাঠামোগত ক্ষতি পূরণার্থে ১৭৫৭ সনের ১ মে-এর চুক্তির[৫০] শর্তানুযায়ী অন্যান্য ২,২৫,০০,০০০ টাকা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৫১]

---

৪৮. Atiur, Dr.Rahman, *Muslim Society and politics in Bengal,* (AD 1757-1947), Dacca : The Univercity of Dacca, 1978, p.5

৪৯. ইসলাম, কাবেদুল, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা,* প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৭

৫০. মীরজাফর ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে গোপন চুক্তির শর্তাবলী নিয়ে ইংরেজদের আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা শুরু হয় ১লা মে, কিন্তু দু'পক্ষে লিখিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, জুন, ১৭৫৭

৫১. Brijen. K Gupta, *Sirajuddaullah and the East India Company (1756-57) : Background to the Foundation of British Power in India,* Calcutta : People's publishing House, 1985, p.126

www.pathagar.com

মীর জাফরের বিদায়ের ফলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে আরোহণ করতে যেয়ে মীর কাশিমকে পূর্বসূরীদের মতো ইংরেজদের সাথে গোপন আঁতাত ও গ্লানিকর শর্ত সম্পাদন করতে হয়েছিল। ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৭৬০ সনে সম্পাদিত এই গোপন সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল–

> The negotiations with him were confided to Holwell in person; and on 27 September an agreement was reached by which Mir Kasim was to receive the office of deputy subahdar, with a guarantee of succession to the subahdari, while the English were to receive the three districts of Burdwan, Midnapur and Chittagong for the maintenance of their troops. Mir Kasim also agreed to pay off the outstanding debts of Mir ja'far to the Company"[৫২]

আলীবর্দি খানের পর বাংলার নবাবদের মধ্যে মীর কাশিমই ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক ধীশক্তির অধিকারী, বিচক্ষণ রাজনীতিক ও দূরদর্শী সমরনায়ক। সিংহাসনে আরোহণের প্রথম দিন থেকেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন; আজ হোক-কাল হোক, ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য। তবে প্রথম আঘাত বা প্রতিরোধের সেই প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জনের জন্য তাঁর সময়ের দরকার। বস্তুত সে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলে এবং কোম্পানির অদৃশ্য নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে তাঁকে সন্ধি অনুযায়ী বেনিয়াদের প্রতিশ্রুত পাওনা ও ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তাই ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের ভাষায় বলা যায়, "মীর জাফরের পরিত্যাক্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে মীর কাশিম ইংরেজ কোম্পানির মনসন্তুষ্টির জন্য নানা প্রকার আয়োজনে প্রবৃত্ত হলেন।"[৫৩]

মীর কাশিমকে ইংরেজদের সঙ্গে কৃত চুক্তির শর্তানুযায়ী সিংহাসনে আরোহণের পর পরই চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের ভূমিরাজস্বের দাবি (খালসা ভূমি ব্যতীত) কোম্পানির ব্যয় বহনের জন্য ছেড়ে দিতে হয়েছিল। স্বভাবতই ভবিষ্যতে বাংলার ভূমিরাজস্বের আয় কমে গেল। অন্যদিকে আলীবর্দি -পরবর্তী পর পর দু'জন নবাবের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অনেক বড় বড় জমিদারও নিয়মিত ভূমিরাজস্ব প্রদান বন্ধ করে দিয়েছিল।[৫৪]

হতভাগ্য তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার অনভিজ্ঞতা ও প্রশাসনিক তদারকির অভাব, বৃদ্ধ অযোগ্য ও ইংরেজদের হাতের পুতুল নবাব মীর জাফরের দুর্বলতার সুযোগে

---

৫২. Dodwell, H.H. *The Cambridge History of India : British India,* Vol.V., Op.cit, p.168

৫৩. রায় শ্রী নিখিলনাথ, *জগৎশেঠ,* ইংরেজ শাসনামলে বাজেয়াপ্ত বই, খ. ২, পৃ. ২৫৯

৫৪. ইসলাম, ড. সিরাজুল, (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস,* (১৭০৪-১৯৭১) প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ.১৮৫

www.pathagar.com

প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে, বিশেষ করে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের অনেক সরকারী আমলা, মুৎসুদ্দি ও জায়গিরদারগণ এই সময়ে প্রবল দুর্নীতি ও কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। মীর কাশিম এই সমস্ত দুর্নীতিবাজ কর্মচারীর অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ উদ্ধারের জন্য একটি শক্তিশালী তদন্ত দল গঠন করেন।[৫৫] যারা আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব দিতে ব্যর্থ হয় তাদের সম্পত্তি তিনি বাজেয়াপ্ত করেন। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে সরকারের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস ফিরে এসেছিল এবং ইংরেজদের পাওনা পরিশোধের পথ সুগম হওয়ায় নবাবের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট বলেন, The Nawab applies with great diligence to the regulation of his affairs, and behaves so as to gain the affection of the people.[৫৬]

ভূমিরাজস্ব সংস্কারের উদ্দেশ্যে মীর কাশিম প্রধানত দু'টি বিষয়ের ওপর জোর দেন। এক. রাজস্ব ধার্য ও আদায়ের সঙ্গে জড়িত কর্মচারী বিশেষ করে আমিল ও জমিদারদের ওপর কঠোর খবরদারী ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ, এবং দুই মূল ভূমি রাজস্বের হার না বাড়িয়ে বরং নতুন কিছু খাত সৃষ্টি করে প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি।[৫৭]

পরিশেষে নবাব মীর কাশিমের স্বল্পাধিক ৩ বছরের শাসনকালে তার 'ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও উদ্যম' এর ফলে বাংলার এই পর্বের ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থার যে সর্বশেষ স্থিতি ও রূপরেখা দাঁড়িয়েছিল এবং যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী যুগ তথা ইংরেজ ব্যবস্থাপনার সূত্রপাত ঘটেছিল সে সম্বন্ধে ড. নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ের একটি বিবৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন–

> 'During his (Mir Quasim's) short rule, he completely changed the sprit of the revenue system which he had inherited from the previous regime, and sought to revolutionise it by introducing into it new principles, and reviving in a new form the methods and ideas that had once been associated with the administration of some of the former Nazims like jafar Khan, Shuja Khan,or Ali Vardi Khan. The laxty inefficiency, and corruption that had crept into financial administration in recent years deeply prejudiced to clear the revenue administration of its chronic wastefulness, joberry, and irregularities

---

৫৫. Chatterji, Dr. Nanda Lal, *Mir Qasim, Nawab of Bengal* (1760-1763), Calcutta : The Indian Press, 1935, p.42

৫৬. Ibid.p,44

৫৭. ইসলাম, কাবেদুল, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০৫

www.pathagar.com

with a high hand, and himself set to infuse into it a vigour that was in a way unprecedented. Mir Qasim's revenue administrationis therefore of peculiar interest. It not only gives a perfect insight into his characteristic severty and oppression, but forms the back-ground for the revenue administrationof the East India Company in Bengal."[৫৮]

উপসংহার : নবাবী আমলে বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় যে অকল্পনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছিল তার মূলে ছিল সম্রাটদের দূরদৃষ্টি, সততা এবং দেশ প্রেম। বাংলার সমাজ জীবনে শান্তি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়নে শায়েস্তা খানের ভূমিকা ছিল অনন্য। মুর্শিদকুলি খান সম্রাট হিসাবে আসীন হবার পর ভূমিরাজস্ব ও আর্থিক প্রশাসনে যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা সত্যিই অনুসরণযোগ্য। মুর্শিদকুলি খানের পর হতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার আগ পর্যন্ত প্রায় সকল শাসকই মুর্শিদকুলি খান প্রবর্তিত নিয়ম নীতির অনুসরণ করেছেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময় নানা জটিলতার কারণে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা আশানুরূপ সফলতা লাভ করতে পারেননি। মীর কাসিম অবশ্য তাঁর যোগ্যতা ও শক্তিবলে হৃত অবস্থা অনেকটা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। ন্যায় নীতি ও আদর্শবান হওয়ার মাধ্যমে আজও বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনে আমাদের এ দেশটিকে বিশ্ব বুকে আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব।

---

৫৮. Chatterji, Dr. Nanda Lal, *Mir Qasim, Nawab of Bengal* (1760-1763), Op.cit, pp.277-78

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৬
এপ্রিল-জুন ঃ ২০১১

ইসলামে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর বিধান

মোহাম্মদ ইলিয়াছ ছিদ্দিকী*
মোহাম্মদ মুরশেদুল হক**

[সারসংক্ষেপ : লুক্‌তাহ্ (কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু) একটি বহুল পরিচিত আরবী পরিভাষা। সিহাহ্ সিত্তাহ্‌সহ প্রায় সকল হাদীস ও ফিক্‌হ গ্রন্থে লুক্‌তাহ্ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম বুখারী র. তাঁর সহীহ গ্রন্থে কুরআনের আয়াত, সাহাবাগণের আছার, আলিমগণের বক্তব্য ও তালীক্বাত ছাড়াও মোট ১২টি পরিচ্ছেদে ১২টি মারফু' হাদীস উল্লেখ করেছেন। যে সব চতুষ্পদ প্রাণী মাঠে-ঘাটে, বনে-প্রান্তরে চরে বেড়ায়, পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত, গাছপালাবিহীন পথে ভ্রমণরত পিপাসার্ত পথিকের ঐ বিচরণশীল প্রাণীর দুধপান করার ব্যাপারে মালিকের পক্ষ থেকে সাধারণ অনুমতি থাকে। যদি সাধারণ প্রথা এমন হয়ে যায় তবে ইসলামী আইনে এ ক্ষেত্রে মূল মালিক থেকে অনুমতি নেয়া আবশ্যিক নয়; বরং উপকৃত হবার অবকাশ আছে। নবী করিম স. আরবের এ প্রথার ভিত্তিতে মালিকের অনুমতি ছাড়া বকরীর দুধপান করেছেন। এ ধরনের সম্পদ লুক্‌তাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত নয়। এর উপর লুক্‌তাহ্'র বিধানও প্রযোজ্য হবে না। যেহেতু লুক্‌তাহর (কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু) আইনী বিধান ইদানিং খুবই প্রাসঙ্গিক, তাই এ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা বিশ্লেষণ করা আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।]

পরিচয় : লুক্‌তাহ্ আরবী শব্দ। এর অর্থ– কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু। এ শিরোনামে বুখারী শরীফে একটি অধ্যায় রয়েছে, যার নামকরণ করা হয়েছে "ফিল লুকতাহ্"। আল্লামা আইনী ও কিরমানী র. কিতাবুন ফিল্– লুক্‌তাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। "লুক্‌তাহ্" শব্দটির লামের উপর পেশ ও কাফ-এর উপর যবর যোগে পাঠ অধিকতর বিশুদ্ধ। আর লুক্‌তাহ্ শব্দের কাফ বর্ণের উপর সাকিন করে পড়া ব্যাকরণের নিয়ম বহির্ভূত। এ সময় তা ইসমে মাফউল বা কর্মকারক বিশেষ্য হবে। 'লুক্‌তাহ' এরূপ মালামালকে বলে, যা পথ থেকে কুড়িয়ে উঠানো হয় অথবা এরূপ বস্তুকে বলা হয়, যার মালিকের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।[১]

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

১. কাসেমী কিরানভী, মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান, *আল-কামুসুল ওয়াহিদ*, কুতুবখানা হোসাইনিয়া, ইউপি : দেওবন্দ, ২০১০, খ. ২, পৃ. ২৭০

www.pathagar.com

ইমাম বুখারী র. লুক্‌তাহ্‌ দ্বারা কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসকে বুঝিয়েছেন।[২]

লুক্‌তাহ্‌ শব্দটি 'আম বা ব্যাপক যাতে মানুষ ও প্রাণী সকলেই অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে দাল্লা (ضالة) শব্দটি খাস বা প্রাণীর সাথে নির্দিষ্ট। আর লাকীত ও দ্বাল শব্দদ্বয় মানুষের সাথে খাস। কিছু সংখ্যক গবেষক হারানো মানুষকে 'লাকীত' বলে অভিমত দিয়েছেন।[৩]

শরীয়তের পরিভাষায়– 'লুকতাহ' রাস্তায় পতিত জিনিসকে বলা হয়। যদি তা মানুষ হয়, তবে তাকে লাকীত বলে। মানুষ না হয়ে যদি তা প্রাণী হয়, তাহলে তাকে 'দাল্লা' বলা হয়।[৪]

বিধান : ইমাম আহমদ র. এর মতে, লুক্‌তাহ হস্তগত না করাই উত্তম। অপরদিকে ইমাম আবূ হানিফা, শাফিঈ এবং ইমাম মালিক র. এর অভিমত হলো, যদি প্রাপক নিজের উপর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আস্থা রাখে তাহলে লুকতাহ হাতে নেয়া উত্তম। খুলাসা কিতাবে এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে, লুকতাহ আয়ত্তে নিয়ে সংরক্ষণ করা ওয়াজিব। আর এটাই ইমাম শাফিঈ র.-এর মাযহাব। বাদাইউস সানাঈ কিতাবের ভাষ্য মতে, লুকতাহ্‌ আয়ত্তে নেয়া ওয়াজিব নয়। আর নিজে মালিক হবার উদ্দেশ্যে লুক্‌তাহ্‌ নিজের আয়ত্তে নেয়া ছিনতাই বা আত্মসাতের ন্যায় হারাম। যদি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আশা করে প্রাপক তা তুলে নিয়ে পরে আবার সেখানেই রেখে দেয়, তাকে তাহলে জরিমানা আদায় করতে হবে না। যদি মালিককে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তোলে নেয় তাহলে মালিককে না দেয়া পর্যন্ত যামিন থাকবে।[৫]

লুক্‌তাহ্‌ হস্তগত করার পর সাক্ষী রাখা : ইমাম আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্‌নে মাজায় আয়াজ ইবনে হাম্মারের বর্ণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– "যে ব্যক্তি পড়ে থাকা জিনিস উঠায়, সে যেন কাউকে সাক্ষী বানিয়ে নেয়।" সাক্ষী রাখার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, কাউকে কোন হারানো জিনিস খুজঁতে দেখলে বা শুনলে সে বলবে, আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। সাক্ষী রাখার সুবিধা হলো যদি মালিক ও প্রাপকের মাঝে

---

২. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ফিল-লুকতাহ অনুচ্ছেদ : ইউপি মাতবা আসাহহুল মাতাবি তা.বি., খ. ১, পৃ.৩২৭-৩৩০

৩. ইবনে মনযুর, *লিসানুল আরাব*, বৈরূত ঃ দারু ইয়াহ্‌য়ায়িত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৮ খ. ১২, পৃ.৩১১-৩১৩

৪. প্রাগুক্ত

৫. আব্দুল আলাম, সৈয়দ মুহাম্মদ ও আহাদ, আব্দুল, *আদ্‌ দিরায়াতু ফী তাখরিজী আহাদিসীল হিদায়া*, ইউ.পি : মাতবা আলিমী, তা.বি., পৃ.৫৯৩- ৫৯৮

www.pathagar.com

মতানৈক্য হয়ে যায়, মালিক বলে তুমি ফেরত দেয়ার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করনি; বরং নিজে মালিক হবার উদ্দেশ্যে কুঁড়িয়েছিলে, আর প্রাপক যদি বলে আমি মানুষকে জানানোর উদ্দেশ্যে তুলেছি। যদি সাক্ষী থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে মাল নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকলে জরিমানা দিতে হবে না। সাক্ষী না থাকলে এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা র.-এর মতে, জরিমানা দিতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ র.-এর মতে, প্রাপকের কথাই ধর্তব্য হবে। আর এটিই ইমাম আহমদ, শাফিঈ এবং ইমাম মালিক র.-এর অভিমত। তাঁরা বলেন, যদি সাক্ষী বানানো প্রয়োজন হতো, তাহলে যায়েদ ইবনে খালিদ ও অন্যান্যের বর্ণনায় তার উল্লেখ থাকতো। যায়েদকে লুক্তাহ্'র বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি এ প্রসঙ্গে শুধু ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৬]

'লুক্তাহ্' বা কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের বিজ্ঞপ্তি এক বছর পর্যন্ত দিতে হবে। এটাই ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমদ ও আবূ হানীফা র.-এর অভিমত। কেননা অধিকাংশ হাদীসে এক বছর বিজ্ঞপ্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা র.-এর অপর একটি অভিমত হলো, যদি কুঁড়িয়ে পাওয়া জিনিসটি দশ দিরহামের কম মূল্যের হয়, তাহলে যতদিন প্রয়োজন মনে করবে বিজ্ঞপ্তি দিবে, আর যদি দশ দিরহাম বা তার চেয়ে বেশী মূল্যের হয়, তবে এক বছর বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। ইমাম নববী র. বলেন, যদি লুক্তাহ্ কম মূল্যের জিনিস হয়, তবে তার বিজ্ঞপ্তি ততদিন পর্যন্ত প্রকাশ করতে হবে, যতদিন পর্যন্ত এর মালিক সাধারণভাবে ফিরে এসে দাবি করতে পারে বলে মনে হয়। ইমাম মুহাম্মদ র. মুআত্তায় বলেন, কোন ব্যক্তি পতিত জিনিস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তুললো, সেই বস্তুটি দশ দিরহাম বা তার চেয়ে বেশি মূল্যের হলে এক বছর পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তি দেবে। আর যদি তার মূল্য দশ দিরহামের কম হয়, তবে যতদিন সমীচীন মনে করবে, ততদিন বিজ্ঞপ্তি দেবে।

'লুক্তাহ্'র মূল্য কম বা বেশী হওয়ার ঘটনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মতের ভিত্তিতে হবে। ইয়ালা ইবনে মুর্‌রা এর বর্ণনায় এসেছে, সামান্য জিনিসের জন্যে সারা বছর বিজ্ঞপ্তি প্রদান আবশ্যিক করলে লোকদের কষ্ট হবে। আর মানুষ পড়ে থাকা জিনিস উঠিয়ে সংরক্ষণ করা ছেড়ে দেবে, যার ফলে জিনিসটা বিনষ্ট হয়ে যাবে।[৭]

---

৬. কাস্তালানী, ইমাম, *ইরশাদুস সারী লি-শারহে সহীহিল বুখারী,* বৈরূত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, ১৯৯৬, খ. ৫, পৃ.৪২৩-৪৪৪

৭. আল-কুরতুবী, শেখ আবুল হাসান আলী, *শারহু ইবনি বাত্তাল আলা সহীহিল বুখারী,* বৈরূত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, ২০০৩, খ. ৬, পৃ.৪৪৯-৪৬৫

www.pathagar.com

বিজ্ঞপ্তিদানের স্থান : লুক্‌তাহ্ পাওয়ার জনসমাগমস্থলে, বাজারে, মসজিদের দরজা, কোর্ট-কাচারী, স্টেশন, মাদরাসা ও স্কুল-কলেজ প্রভৃতি জনবহুল স্থানে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

তবে আধুনিক যুগে প্রচার মাধ্যম যেহেতু অধিকাংশ গণমানুষের নাগালে পৌঁছে গেছে তাই প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করাই শ্রেয়। যেমন– স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, রেডিও, টিভি ইত্যাদি।

কোন ধরনের বিজ্ঞপ্তিদান আবশ্যক নয় : যে জিনিস সম্পর্কে জানা যায় যে, মালিক এগুলো খোঁজ করো না। যেমন, খেজুরের আঁটি, আপেলের খোসা ইত্যাদি। তবে তা কুড়িয়ে নিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদান ছাড়াই তা দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ।

আবূ দাউদ শরীফে জাবির রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম স. আমাদেরকে পথে পড়ে থাকা সামান্য বস্তু যেমন– লাঠি, রশি, চাবুক ইত্যাদি উঠিয়ে নিয়ে তা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম আবূ দাউদ র. বলেন, মুগীরা ইবনে সালামার শিষ্যদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে শুয়াইব মারফু হিসেবে এটি উদ্ধৃত করেছেন। উপরোক্ত হাদীসের ব্যাপকতার দাবি হল এই যে, সব ধরনের লুকতাহ'র ঘোষণা দিতে হবে। তবে সামাজিক রীতি-নীতির ভিত্তিতে যে সব হারানো জিনিস মালিক খোজাঁখুজিঁ করে না, তা বাদ দেয়া হয়েছে। স্বয়ং নবী করিম স. রাস্তায় খেজুরের বিচি পড়ে থাকতে দেখে বলেছেন, যদি সাদকাহর আশংকা না হতো, তাহলে আমি এ খেজুর খেয়ে ফেলতাম। এ প্রসঙ্গে আলী রা.-এর একটি হাদীস আবূ দাউদ গ্রন্থে আছে। একটি দীনার তিনি পেয়েছিলেন। নবী করিম স.-এর কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এটা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের হাদীস একাধিক ও বিশুদ্ধ। তদুপরি হানাফী আলিমগণের এক বক্তব্য অনুযায়ী পরিস্থিতির শিকার ব্যক্তি বা বিচারকের মতে এটি নির্ধারিত হবে। এর কম মূল্যের জিনিসের জন্য মানুষের ভরা মজলিসে আলোচনা করাটাই ঘোষণার সমতুল্য। আর যদি তার মালিক না আসে, তাহলে তুমি তা খরচ করতে পারবে এবং সে জিনিস তোমার নিকট আমানত হিসেবে থাকবে। যদি তার মালিক আসে, তাহলে তার জরিমানা দিতে হবে। উবাই ইবনে কাব রা.-এর বর্ণনায় আছে, তুমি তা দ্বারা উপকৃত হও, যদি তার মালিক না আসে, তাহলে সেটা তোমার মালের ন্যায় ব্যবহার করবে।[৮]

---

৮. আল-কুরতুবী, প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. লুকতাহ্ প্রাপকের মালিকানার ফাতওয়া দিয়েছেন। আবূ দারদা রা. স্বীয় স্ত্রীকে এ ফাতওয়া দিয়েছিলেন। ইমাম আওযায়ী র.-এর বক্তব্য এটাই।[৯]

ইমাম আবূ হানীফা র.-এর মতে, এ ক্ষেত্রে তা আমানত হিসেবে রাখতে হবে। প্রাপক দরিদ্র হবার ক্ষেত্রে তাতে মালিক সুলভ ব্যবহার করার অনুমতি আছে। মালিক ফিরে আসলে তার সম্পদ ফেরত দেয়ার নিয়ত থাকতে হবে। আর যদি সে ধনী হয়, তবে সে নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারবে না; বরং সাদকাহ্ করে দেবে, আর এটা নফল সাদকাহ্ হিসেবে গণ্য হবে এবং তা যে কাউকে দিয়ে দেয়া যাবে। অবশ্য ধনীদে দেয়ার ব্যাপারে ফকীহ্গণের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে।

এ হাদীসের বাহ্যিক বক্তব্যের ভিত্তিতে ইমামগণ বলেন, প্রাপক ধনী হোক বা দরিদ্র, প্রাপ্ত জিনিস এক বছর ঘোষণা দেয়ার পর তার অধিকার থাকবে, ইচ্ছা করলে মালিক হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। যদি মালিক হিসেবে ব্যবহার করতে চায়, তবে এর মূল মালিক কখনো মালিকানা দাবি করলে যামানত দেয়ার নিয়ত রাখতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা র. বলেন, ধনী হলে অবশ্যই তা দান করে দেবে। কেননা কোন মুসলমানের সম্পদ তার অনুমতি ছাড়া ভোগ করা হালাল নয়।[১০]

লুকতাহ'র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর তাতে মালিকের মালিকানা রহিত হয়ে যায় না। এ জন্যেই পরবর্তীতে তার যামানত নেয়ার অধিকার থাকে। এমনিভাবে আয়ায ইবনে হিশামের এক বর্ণনায় আছে– যদি তার মালিক না আসে, তাহলে সেটি হলো আল্লাহর মাল, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তা দান করেন।

যে মালের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে করা হয়, তার হকদার হয় যাকাতের অধিকারীরা। দরিদ্র হলে নিজের কাজে ব্যয় করা সাদকাহ্ করার মতই। আর মালিক না চেনার ক্ষেত্রে যদি মূল জিনিস মালিককে ফেরত দেয়া না যায়, তবে তার পরিবর্তে অন্য কিছু দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে পরিবর্তে দেয়া জিনিসটা সওয়াবের উপকরণ হবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. কোন এক লোকের কাছ থেকে সাতশ টাকার বিনিময়ে একটি গোলাম কিনে ছিলেন। এরপর গোলামের মূল্য দেয়ার জন্য তাকে খুঁজে না পেয়ে এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দিয়েছিলেন। এরপরও খোঁজে না পেয়ে মিসকিনদের একত্র করে ঐ গোলামের মূল্য দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! এটা তার মালিকের পক্ষ

---

৯. আব্দুল আলাম, সৈয়দ মুহাম্মদ ও আহাদ, আব্দুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৮

১০. আল-কুরতুবী; প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৬

www.pathagar.com

থেকে দান করলাম, যদি সে তা অনুমোদন না করে, তাহলে আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উপরই এর মূল্য আদায় করা আবশ্যিক। এরপর বলেন, "হাকাজা য়্যাফয়ালু" যার ভিত্তিতে হানাফী আলিমগণ বলেন, যদি কোন ব্যক্তির ওপর ঋণের বোঝা থাকে, আর পাওনাদারদের পরিচয় জানা না থাকে, তাহলে তা তাদের পক্ষ থেকে সাদকাহ করে দেবে।[১১]

অনুরূপভাবে আলী রা. লুকতাহ সাদকাহ করে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন। যদি তার মালিক খুঁজে না পাও, তা হলে তা সাদকাহ করে দাও। হ্যাঁ, যদি পরে মালিক এসে পড়ে, তাহলে তার ইখতিয়ার থাকবে, সে পড়ে থাকা বস্তু উঠানেওয়ালা ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ নিতে পারে বা তার ওই সাদকাহকে অনুমোদন দিতে পারে।

উমর রা. থেকে বর্ণিত। মালিক না পেলে তুমি তা দান করে দাও, যদি পরে তার মালিক আসে এবং ঐ মাল চায় বসে, তাহলে তুমি তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেবে। আর দানের সওয়াব তোমারই হবে, যদি সে দান করাটা অনুমোদন করে, তাহলে তার মূল্য তারই হবে। আর তুমি তোমার নিয়্যত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকেও অনুরূপ বর্ণনা আছে।

হানাফী ফকীহগণের মতে যদি বিচারক অনুমতি প্রদান করেন, তাহলে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু প্রাপকের ব্যবহার বৈধ। প্রাপকের নিজে কুঁড়িয়ে নেয়ার ভিত্তিতে বৈধ নয়। উবাই রা. প্রথমে দরিদ্র ছিলেন, তাই আবূ তালহা রা. নিজের বাগান তাকে সাদকাহ করেছিলেন। যখন নবী করিম স. বলেন, এটা তোমার নিকটাত্মীয় দরিদ্রদের দান করো। তখন তিনি তা উবাই রা.-কে দান করেছিলেন। পরবর্তীতে উবাই রা. ধনী হয়ে গিয়েছিলেন।[১২]

যাইদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী রা. এর অধিকাংশ বর্ণনার মধ্যে "তা তুমি ব্যয় করতে পারো" উল্লেখ আছে। কিন্তু সুলাইমান রাবীয়া থেকে, রাবীয়া ইয়াযিদ সূত্রে বলেন, যদি তার মালিক না আসে, তবে তা তোমার কাছে আমানত হিসেবে থাকবে। আবার ইয়াহয়া ইবনে সায়ীদ কর্তৃক ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, "তুমি তা খরচ করো এবং তা তোমার কাছে আমানত হিসেবে থাকবে।" উভয় কথাই আছে। ইবনে দাকীকুল ঈদ র. বলেন, প্রাপক চাইলে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু যামানত প্রদানের শর্তে খরচ করতে পারে বা চাইলে আমানত হিসেবে রেখে দিতে পারে।

---

১১. প্রাগুক্ত
১২. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

এক বছর পর মালিক না পাওয়া পর্যন্ত তা তোমার কাছে আমানত হিসেবে থাকবে। যদি কোন ধরনের ব্যবহার ছাড়াই তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আবার এ অর্থও হতে পারে, ব্যয় করার পর ক্ষতিপূরণ থেকে অব্যাহতি পাবে না, তা তোমার কাছে আমানতের অন্তর্ভুক্ত হবে। লুকতাহ আমানত হবার অর্থ হলো তা, প্রত্যর্পণ আবশ্যক। হাদিসে ওয়াদিয়াত শব্দ ব্যবহার করার দ্বারা বুঝানো হয়েছে খরচ করার পর লুক্তাহ্র পরিবর্তে সমজাতীয় কিছু দিতে হবে। মূলত এটা আমানত; যার মূল জিনিসটাই বহাল থাকা আবশ্যক। সুতরাং এটা খরচের অনুমতি প্রদানই প্রমাণ করে এর মূল বহাল থাকবে না।

যদি লুক্তাহ্ অনুসন্ধানে তার মালিক বছরের মধ্যে কোন সময় আসে, তবে তাকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে।

হাম্মাদ ইবনে সালামা কর্তৃক ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ থেকে এবং রাবীয়াতুর রায় কর্তৃক ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, যদি লুকতাহ'র মালিক এসে লুক্তাহ্র পরিমাণ, পাত্র, থলে ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারে, তবে তাকে তা দিয়ে দিবে, নতুবা তা তোমার। তবে ইমাম আবূ দাউদসহ অনেকেই হাম্মাদের বর্ণনাকে সঠিক নয় বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু উবাই ইবনে কাব রা.-এর হাদীসে একাকী হাম্মাদই রাবী নন বরং তার সাথে সুফিয়ান ও যাইদ ইবনে আবী উনাইসও আছেন। তাই আবূ দাউদের বক্তব্য সঠিক নয়।

ইবনে হাজার আল-আসকালানী বলেন, এটি সঠিক। যদি কেউ এসে এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে দাবি করে, তবে তবে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু দিয়ে দেয়া ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে এ হাদীসে আদেশ সূচক শব্দ উল্লেখ থাকায় ইমাম মালিক ও আহমদ র.-এর মতে, তা দিয়ে দেয়া ওয়াজিব।

ইমাম শাফিঈ ও আবূ হানীফা র.-এর মতে, দাবিকারীর সততা সম্পর্কে প্রাপকের যদি ধারণা প্রবল হয়, তাহলে দিয়ে দিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে আদেশসূচক সীগাহ ওয়াজিবের জন্য নয়; বরং মুস্তাহাবের জন্য। সূত্রমতে, সাক্ষ্য পাবার পর লুক্তাহ্ ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব।

যে ব্যক্তি দাবি করবে, সে ব্যক্তিকেই প্রমাণ দিতে হবে। আর প্রমাণ দিতে না পারলে, যে অস্বীকার করবে, তাকে কসম (শপথ) দেয়া যেতে পারে।

মালিককে চিনতে পারলে তার প্রাপ্য ফিরিয়ে দেয়া : এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, উবাই ইবনে কাব রা. বলেন, আমি একশ দীনারের একটি থলে পথে পেয়েছিলাম এবং আমি এটা নিয়ে নবী করিম স. এর কাছে এলাম। তিনি আমাকে বললেন, এক

www.pathagar.com

বছর পর্যন্ত ঘোষণা করো। আমি তাই করলাম। কিন্তু এটি সনাক্ত করার মতো কোন লোক পেলাম না। তখন আবার তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন, আবার এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করো। আমি তাই করলাম। কিন্তু কাউকে পেলাম না। আমি তৃতীয়বার তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন, থলে ও তার সংখ্যা এবং বাঁধন স্মরণ রাখো। যদি এর মালিক আসে তাকে দিয়ে দেবে। নয় তো তুমি তা ভোগ করবে। তারপর আমি তা ভোগ করলাম। শু'বা বলেছেন, আমি এরপর মক্কায় সালামার সাথে দেখা করলাম, সে বলল, তিন বছর কিনা এক বছর ঘোষণার জন্য বলেছেন, তা আমার জানা নেই।[১৩]

আলোচ্য বিধান মতে, পড়ে থাকা বস্তুর দাবিদারকে দেয়ার জন্য নয়; বরং পড়ে থাকা জিনিস উঠিয়ে যে ব্যক্তি নিচ্ছে, তার নিজস্ব সম্পদের সাথে কুঁড়িয়ে পাওয়া জিনিস মিলিয়ে না ফেলার জন্য এ বিধান। তা না হলে প্রাপ্ত মালের মালিক দাবি নিয়ে এলে পৃথক করে দেয়া জটিল হতে পারে। অথবা এ বিধান উচ্চতর তাকওয়ার আলোকে দেয়া হয়েছে। পতিত জিনিস কুঁড়িয়ে আনা ব্যক্তির যদি পরিপূর্ণ বিশ্বাস হয় যে, এর দাবিদার সত্যবাদী, তাহলে তাকে তা দিয়ে দেবে। যদি পরিপূর্ণ বিশ্বাস না হয়, তাহলে দাবিদারকে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। প্রমাণ ছাড়া দেয়া যাবে না। কেননা, দাবিদার কুঁড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তির কাছে সে জিনিস সম্পর্কে অপর কারো কাছ থেকে জেনে শুনেও দাবি করতে পারে।

ঘোষণা সম্পর্কে এক বা কয়েক বছরের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম লক্ষণীয় হলো, হাদীসে সম্বোধিত ব্যক্তি একজন বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ সাহাবী। তাই আমরা বলতে পারি, এতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বিধান সতর্কতা ও তাকওয়ার কারণে দেয়া হয়েছিল।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী র.-এর মতে, আমানতদারীর ভিত্তিতে লুকতাহ্ কুঁড়িয়ে আনা ব্যক্তি নিজেই নির্ধারণ করবে কত দিন সে বিজ্ঞপ্তি দিবে। যাতে দূরের ও কাছের যে কোন মালিকের কাছে সংবাদ পৌঁছে যায়। তিনি নিজে এ মতামতটি পছন্দ করেছেন। এমনিভাবে প্রাপ্ত জিনিসের মূল্য দশ দিরহাম (আনুমানিক আড়াইশত টাকা) থেকে যদি কম হয়, তাহলে এর ব্যাপারেও মতপার্থক্য আছে। যদি একটা সময় পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তি দেয়ার পরও আসল মালিক না পাওয়া যায়, এবং প্রাপক যদি নিঃস্ব হয় তবে নিজ প্রয়োজনে খরচ করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে সে নিজে খরচ

---

১৩. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ফিল-লকুতাহ, অনুচ্ছেদ : ইযা আখবারা রব্বুল লুকতাহ বিল-আলামাতি দাফাআ ইলাইহি, রিয়াদ : আল-কুতুবুস সিত্তাহ, দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১৯০

www.pathagar.com

করতে পারবে। প্রাপক ধনী হলে শাসক বা তার পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন প্রশাসকের অনুমতিক্রমে ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে নিজ প্রয়োজনে খরচ করতে পারবে। অবশ্য এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঘোষণা দেয়ার পর এবং নিজ প্রয়োজনে খরচের পর যদি মালিক পাওয়া যায়, তবে মালিককে মালের জরিমানা দিতে হবে।[১৪]

হারানো উট : যাইদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী রা. বলেন, একবার এক বেদুঈন এসে নবী করিম স.-কে রাস্তায় পড়ে থাকা বস্তু গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এক বছর যাবত এর ঘোষণা করতে থাকো। এরপর থলের মুখ বন্ধ করে স্মরণ রাখো। এর মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি আসে এবং তোমাকে খবর দেয় ভালো, নতুবা তুমি তা ব্যয় করো। সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! হারানো বস্তু যদি বকরী হয়? তিনি বললেন, সেটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ের জন্য। সে আবার বললো, হারানো বস্তু উট হলে? নবী করিম স.-এর চেহারায় রাগের ভাব ফুটে ওঠলো। তিনি বললেন, এতে তোমার কি কাজ? তার সাথে তার রশি ও পানির পাত্র রয়েছে, সে পানি পান করবে এবং গাছের পাতা খাবে।[১৫]

প্রথমত, উট মরুভূমি ও বৈরী পরিবেশে জীবনধারণে অভ্যস্ত। তার স্নায়ুর দৃঢ়তাও প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয়ত সে নিজ মালিক ও ঘর খুব ভালোভাবেই চিনে। যে সকল দুর্গম রাস্তা দিয়ে সে একবার গমন করে তাও সে ভালোভাবে স্মরণ রাখতে পারে। আরবরা দুর্গম কঠিন পাহাড়ি পথে উটকে পথ-প্রদর্শক হিসেবে ব্যবহার করতো। কেননা এটি আরবের দুর্গম মরু ও পাহাড়ি পথে হারিয়ে যাবার পর সাধারণ মানুষের চাইতে খুব ভালোভাবে মালিক পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। আরবরা তা অবহিত ছিল। নবী করিম স. এ কারণেই এ প্রশ্নে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।[১৬]

হারানো ছাগল : যাইদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী রা. বলেন, পড়ে থাকা বস্তু সম্পর্কে নবী করিম স.-কে জিজ্ঞেস করা হলো। যাইদ বলেন, তিনি বলেছেন– থলেটি এবং তার বাঁধন চিনে রাখ। অতঃপর এক বছর যাবত ঘোষণা করতে থাক। ইয়াযীদ র. বলেন, যদি এর সনাক্তকারী না পাওয়া যায়, তবে যে এটা উঠিয়েছে সে খরচ করবে। কিন্তু সেটা তার কাছে আমানত স্বরূপ থাকবে। ইয়াহইয়া র. বলেন,

---

১৪. আল-আসকালানী, ইবনে হাজার, *ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ৫, পৃ. ৩৬১-৩৮৩

১৫. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ফিল-লুকতাহ, অনুচ্ছেদ : দাল্লাতুল ইবল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

১৬. আইনী, বদরুদ্দীন, *উমদাতুল কারী শারহু সহীহিল বুখারী, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৯৮ খ. ৯, পৃ. ১৫৪-১৮১*

www.pathagar.com

আমার জানা নেই যে, এ কথাটা নবী করিম স.-এর হাদীসের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা, নাকি তিনি নিজ থেকে বলেছেন। এরপর সে জিজ্ঞেস করল, হারিয়ে যাওয়া বকরী সম্পর্কে আপনি কি বলেন? নবী করিম স. বললেন, এটা নিয়ে যাও। তা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য অথবা নেকড়ের জন্য। ইয়াযীদ র. বলেন, এটারও ঘোষণা করতে হবে। তারপর আবার সে জিজ্ঞেস করল, হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে আপনি কি বলেন? রাবী বলেন, নবী করিম স. বললেন– এটা ছেড়ে দাও। কারণ এর সাথেই রয়েছে এর রশি ও পানির মশক। সে নিজেই পানি পান করবে এবং গাছপালা খাবে, যতক্ষণ না এর মালিক একে ফিরে পায়।

এতে ছাগল, ভেড়ার বিধান উটের বিধান হতে পৃথক হবার কারণ হলো ছাগল দুর্বল প্রাণী। হিংস্র বন্য প্রাণী তাকে পথিমধ্যে খাদ্যে পরিণত করতে পারে। তাই ইসলামী বিধান মতে, মালিকের কাছে পৌঁছানোর পূর্ণ চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে তা আটক করবে। যদি মালিক পাওয়া যায় তো ভাল; নতুবা আটককারী যদি দরিদ্র হয় তা ভোগ করবে, নতুবা সাদকাহ করা ভাল। তবে সর্বাবস্থায়ই মালিক চাইলে তার জরিমানা দিতে হবে।[১৭]

হারানো জিনিসের মালিক এক বছরে না পাওয়া গেলে : যাইদ ইবনে খালিদ রা. বলেন, এক ব্যক্তি নবী করিম স.-এর কাছে এসে পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, তিনি বললেন, থলেটি এবং এর বাধঁন চিনে রাখ। তারপর এক বছর যাবৎ ঘোষণা করতে থাক। যদি মালিক আসে (তবে তাকে তা দিয়ে দাও) আর যদি না আসে তা তোমার দায়িত্বে। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, যদি বকরী হারিয়ে যায়? তিনি বললেন, সেটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের নতুবা সেটা নেকড়ের। অত:পর সে হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, এতে তোমার কি? ওর সাথেই ওর পানির মশক ও রশি রয়েছে। মালিক তাকে না পাওয়া পর্যন্ত সে পানি পান করবে এবং গাছপালা খাবে।[১৮]

হাদীসের ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায় যে, একবার বিজ্ঞপ্তি প্রদানই যথেষ্ট। কিন্তু বছরব্যাপী প্রচারের ব্যাপারটা প্রথা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের দাবি অনুযায়ী বার বার করা চাই। যখন কোথাও মালিক থাকার ধারণা হবে, সেখানে বিজ্ঞপ্তি দেবে। ইমামত্রয় ও ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, প্রাপ্ত মাল কম হোক বা বেশি হোক এক বছর পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে।

---

১৭. প্রাগুক্ত
১৮. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

ইমাম আবূ হানীফা র. থেকে এ প্রসঙ্গে তিনটি অভিমত রয়েছে। বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো, বিজ্ঞপ্তিদানের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই; তা লুক্তাহ্ প্রাপকের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেয়া হবে। যদি তার বিশ্বাস হয়ে যায় যে, মালিক পাওয়া সম্ভব নয় তবে তা জরিমানা প্রদানের শর্তে সাদকাহ করতে পারে বা নিজে ব্যবহার করতে পারে। চাই সে ধনী হোক বা দরিদ্র। হাদীসে যে এক বছরের শর্ত দেয়া হয়েছে, তা বকরীর দিক লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কেননা, হারানো বকরী এক বছর পর্যন্ত খোঁজ করা হয়। তাই বিজ্ঞপ্তিও সারা বছর দিতে হবে। কিন্তু এ দ্বারা এক বছরই উদ্দেশ্য নয়। কেননা, অন্য হাদীসে তিন বছরেরও উল্লেখ আছে।

সাগরে কাঠ অথবা বেত ইত্যাদি পাওয়া : লাইস র. বলেন, আমাকে জাফর ইবনে রবীআ র. আবদুর রহমানের সূত্রে আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন। নবী করিম স. বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বর্ণনা করেন। সে বাইরে বের হলো হয়ত কোন জাহাজ তার মালামাল নিয়ে আসবে। পথিমধ্যে একটা কাঠের উপর তার দৃষ্টি পড়ল। সে তা জ্বালানী হিসেবে কাজে লাগবে মনে করে নিয়ে আসলো। সে তা কাটলে কাঠের মধ্যে তার জন্য প্রেরিত টাকা ও একটা চিঠি পেল।[১৯]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কাঠ বা ইত্যাকার বস্তু দিয়ে তৈরি কোন বাক্স যদি রাস্তা সাগর বা নদীতে পাওয়া যায়, তাহলে প্রাপক নিজে তা ব্যবহার করতে পারবে। এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের বাধ্যবাধকতা নেই। যদিও ঘটনাটা পূর্বেকার শরীয়তের। কেননা নবী করিম স. এতে আপত্তি তোলেননি, তাঁর নীরব সমর্থনই বৈধতার প্রমাণ।

পথিমধ্যে খেজুর পাওয়া : এ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে যে, আনাস রা. বলেন, নবী করিম স. রাস্তায় পড়ে থাকা খেজুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন– আমার যদি আশংকা না হতো যে, এটি সাদকাহ'র, তাহলে আমি এটা খেতাম। মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল র. আবূ হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী করিম স. বলেছেন, আমি যখন আমার পরিবারের কাছে ফিরে যাই, তখন আমার বিছানায় খেজুর পড়ে থাকতে দেখি। খাবার জন্য আমি তা তুলে নেই। পরে আমার ভয় হয় যে, হয়ত ওটা সাদকাহ'র খেজুর হবে। সুতরাং আমি তা ফেলে দেই।[২০]

---

১৯. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ফিল-লুকতাহ, অনুচ্ছেদ : ইযা ওয়াজাদা খাশাবাতান ফিল বাহরি আও সাওতান আও নাহওয়াহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

২০. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ফিল-লুকতাহ, অনুচ্ছেদ : ইজা ওয়াজাদা তামরাতান ফিত তারীক, প্রাগুক্ত. পৃ. ১৯০

www.pathagar.com

প্রথমত, লুকতাহ সম্পর্কে একটা মৌলিক কথা জেনে নেয়া উচিত যে, লুকতাহ'র প্রাপক যদি জানতে পারে যে, এর মালিক এটা খোঁজ করবে না যেমন, খেজুরের আঁটি, আঙ্গুরের খোসা ইত্যাদি। তাহলে সেটি তুলে নিয়ে তা থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ। তবে যদি মালিক চায়, তাহলে প্রাপকের কাছ থেকে সেটি নিয়ে যেতে পারবে। দ্বিতীয়ত, ঐ মাল যা সম্পর্কে জানা আছে যে, মালিক তা সংরক্ষণ করবে এবং তালাশ করবে তাহলে মালিকের কাছে পৌঁছানোর জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া উচিত। উমর রা.-এর যে ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এটাকে মুসাদ্দাদ র. মাওসূল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

মক্কাবাসীদের হারানো জিনিসের বিজ্ঞপ্তি : তাউস র. ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে নবী করিম স. থেকে বর্ণনা করেন। মক্কায় পড়ে থাকা জিনিস সেই তুলবে যে সেটার বিজ্ঞপ্তি দেবে। খালিদ ইকরামার সূত্রে ইবনে আব্বাস রা. নবী করিম স. থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে উল্লেখ আছে, মক্কার মধ্যে পড়ে থাকা জিনিস সেই কুড়িয়ে নেবে যে তা প্রচার করতে পারবে। আহমদ ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন আমাদের কাছে রাওহ, যাকারিয়া, আমর ইবনে দীনার, ইকরামা, ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণনা করেন। নবী করিম স. বলেছেনথ– এখানকার (মক্কা) গাছ কাটা যাবে না। শিকার করার উদ্দেশ্যে প্রাণী তাড়ানো যাবে না এবং বিজ্ঞপ্তি দেয়ার নিয়্যত ছাড়া পড়ে থাকা জিনিস তোলা যাবে না। ইবনে আব্বাস রা. বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! ইযখির ঘাস কাটার অনুমতি দিন। জবাবে তিনি বললেনথ– এর অনুমতি আছে।[২১]

কোন কোন ফকীহ এ হাদীসের ভিত্তিতে হারাম শরীফের লুকতাহ ও হারাম শরীফের বাইরের লুকতাহ'র বিধানের মাঝে পার্থক্য করেন। হানাফী ফকীহগণের নিকট মক্কা ও অন্যান্য স্থানের লুকতাহ'র মাঝে কোন পার্থক্য নেই। হাদীসে বিশেষভাবে হারাম শরীফের উল্লেখের কারণ হলো, এখানে বাইরে থেকে বেশি পরিমাণে লোকজন এসে থাকেন। এক ব্যক্তি আসলো আর নিজের কোন জিনিস ফেলে রেখে চলে গেল এবং বাড়িতে গিয়ে মনে পড়লো। এমতাবস্থায় প্রাপক ব্যক্তির বিজ্ঞপ্তিতে তার কি উপকার হবে। হাদীসে বিশেষভাবে এ কথা বলা হচ্ছে যে, সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বে বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে, এর মাধ্যমে মক্কার বাইরের লুকতাহ'র সাথে পার্থক্য বুঝানো হয় নি।

কারো পশুর দুধ অনুমতি ছাড়া দোহন করা : আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, নবী করিম স. বলেছেন– অনুমতি ব্যতীত কারো পশুর দুধ দোহন করবে না। তোমাদের

---

২১. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ফিল-লুকতাহ, অনুচ্ছেদ : কাইফা তুআররিফু লুকতাতু আহলি মাক্কা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

www.pathagar.com

কেউ কি এটা পসন্দ করবে যে, তার তোশাখানায় কোন লোক এসে ভাণ্ডার ভেঙ্গে ফেলে এবং ভাণ্ডারের শস্য নিয়ে যায়? তাদের পশুগুলোর স্তনে তাদের খাদ্য রাখে। সুতরাং কারো পশুর দুধ তার অনুমতি ব্যতীত দোহন করবে না।"[২২]

এতে দুধের কথা বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ হলো, মানুষ এটাকে খুব হালকা মনে করে মালিকের অনুমতি ছাড়াই দুধ দোহন করে নেয়, যা কখনো কাম্য নয়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের কাছ হতে অনুমতি নিতে হবে। এক কথায় মালিকের সন্তুষ্টি ও অনুমতি আবশ্যক।

আবূ দাউদ গ্রন্থে সামুরা রা.-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ না থাকে তবে তিনবার আওয়াজ দিবে। সাড়া দিলে অনুমতি নিবে নতুবা পান করে নেবে; কিন্তু দুধ দোহন করে বাইরে নিয়ে যাবে না। তিরমিযী গ্রন্থে ইবনে উমর রা.-এর হাদীসে আছে, একটি ছেলে গাছে ঢিল মেরে ফল পেড়েছিল, নবী করিম স. ছেলেটার মাথায় হাত বুলিয়ে দুআ করলেন– "হে আল্লাহ! তুমি তার উদর পূর্ণ করে দাও এবং বললেন, যে ফল মাটিতে (আপনা-আপনি) পড়েছে, তা খাও (ঢিল মেরে) ফেলো না।"[২৩]

মালিক এক বছর পর আসলে : যাইদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে নবী করিম স.-কে জিজ্ঞেস করলো। জবাবে তিনি বললেনথ– এক বছর যাবত এর ঘোষণা করো। এরপর জিনিসটির পাত্র এবং তার বাঁধন স্বরণ রাখ এবং সেটা খরচ করো। যদি তার মালিক এসে যায় তবে তাকে দিয়ে দাও। লোকেরা এরপর জিজ্ঞেস করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! হারিয়ে যাওয়া বস্তু বকরী হলে কি করতে হবে? তিনি বললেন, ওটা তুমি নিয়ে নাও। কেননা সেটা তোমার কিংবা তোমার ভাইয়ের জন্য। আর তা না হলে নেকড়ে বাঘের জন্য। সে আবার বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! হারানো বস্তু উট হলে কি করতে হবে? এতে নবী করিম স. রাগ হলেন– ফলে তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। অত:পর তিনি বললেন, এতে তোমার কি? তার সাথে তার ক্ষুর ও মশক রয়েছে, যতক্ষণ না তার মালিক তার সন্ধান পায়।[২৪]

অত্র হাদীস থেকে যা বুঝা যায়, লুকতাহ তোলা হালাল নয়, কারণ তা অন্যের সম্পদ বিনা অনুমতিতে নেয়ার নামান্তর যা শরীয়তে হারাম। তাবেঈন ও অন্যান্য

---

২২. প্রাগুক্ত

২৩. আইনী, বদরুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

২৪. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ফিল লুকতাহ, অনুচ্ছেদ : দাল্লাতুল গানাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

www.pathagar.com

ইমামগণের মধ্য পূর্ববর্তী ফকীহগণের মতে, লুকতাহ উঠানো বৈধ; কিন্তু না উঠানোটা উত্তম। কেননা, নিশ্চয় তা তার মালিককে পৌঁছিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে উঠানো বৈধ এবং উত্তম।

হানাফী, ফকীহ ও সাধারণ ফকীহগণের মাযহাব হলো, লুকতাহ ফেলে রাখার চেয়ে তুলে সংরক্ষণ করা উত্তম। বাদাই উসসানাই গ্রন্থে হানাফী মাযহাবের বিবরণ এভাবে আছে যে, যদি লুকতাহ ধ্বংস হয়ে যাবার আশংকা থাকে, তবে তা তোলা বৈধ; তবে নিজের জন্য তোলা হারাম।

পড়ে থাকা বস্তু রক্ষার নিমিত্তে কুড়িয়ে নেয়া : সুয়াইদ ইবনে গাফলা র. বলেন, সুলাইমান ইবনে রবীআ এবং যাইদ ইবনে সুহানের সঙ্গে আমি এক লড়াইয়ে শরীক ছিলাম। আমি একটি চাবুক পেলাম। একজন আমাকে এটা ফেলে দিতে বললেন। আমি বললাম, না। এর মালিক এলে এটা আমি তাকে দিয়ে দেবো। নতুবা আমিই এটা ব্যবহার করবো। আমরা ফিরে গিয়ে হজ্জ করলাম এবং যখন মদীনায় গেলাম তখন উবাই ইবনে কাব রা.-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নবী করিম স.-এর সময় আমি একটি থলে পেয়েছিলাম, এর মধ্যে একশ দীনার ছিল। আমি এটা নবী করিম স.-এর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, এক বছর পর্যন্ত তুমি এটার ঘোষণা করতে থাকো। সুতরাং আমি এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করলাম। এরপর আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আরো এক বছর ঘোষণা দিতে বললেন। আমি আরো এক বছর ঘোষণা দিলাম। এর পর আমি আবার তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আবার এক বছর ঘোষণা দিতে বললেন। আমি এক বছর ঘোষণা দিলাম। এরপর আমি চতুর্থবার তাঁর কাছে আসলাম। তিনি বললেন, থলের ভেতরে দীনারে সংখ্যা, বাধঁন এবং থলেটি চিনে রাখো। যদি মালিক ফিরে আসে তাকে দিয়ে দিও। নতুবা তুমি নিজে ব্যবহার করো।[২৫]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, সম্পদ রক্ষার স্বার্থে কুড়িয়ে নেয়া যায়।

প্রাপ্ত হারানো মাল প্রশাসকের হাতে হস্তান্তর না করা : যাইদ ইবনে খালিদ রা. বলেন, নবী করিম স.-এর কাছে জনৈক বেদুঈন পড়ে থাকা বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, "এক বছর পর্যন্ত এটার ঘোষণা দিতে থাকা। যদি কেউ

---

২৫. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ফিল-লুকতাহ, অনুচ্ছেদ : হাল ইউখাযুল লুকতাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

www.pathagar.com

আসে এবং তার বাঁধন সম্পর্কে পরিচয় দেয়, তাহলে তাকে ফিরিয়ে দাও। নতুবা তুমি নিজে সেটা ব্যবহার কর। এরপর সে হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। এতে নবী করিম স.-এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি বললেন, সেটা দিয়ে তোমার কি প্রয়োজন? তার সাথে মশক ও ক্ষুর রয়েছে। সে নিজেই পানির কাছে যায়, গাছের পাতা খায়। তাকে ছেড়ে দাও, যতক্ষণ না তার মালিক তাকে ফিরে পায়। বকরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বললেন, সেটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের, আর তা না হলে নেকড়ের।"[২৬]

এ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী র. ঐ সকল লোকের মতামতকে খণ্ডন করার জন্য চাচ্ছেন, যাদের ধারণা লুক্তাহ্ যদি স্বল্পমূল্যের হয়, তবে প্রাপক স্বয়ং বিজ্ঞপ্তি দেবে। আর যদি মূল্যবান হয়, তাহলে বাইতুলমালে জমা দিবে। যাতে সেখান থেকে বিজ্ঞপ্তির ব্যবস্থা করা হবে। তবে, শাসককে এ বিষয় অবহিত করার প্রয়োজন নেই। আর যদি খিয়ানতকারী হয়, তাহলে প্রশাসনের কাছে সোপর্দ করবে যাতে শাসকের কোন আমানতদারের হাতে সোপর্দ করে দেয়। মালিকীগণ ন্যায়পরায়ণ শাসক ও অত্যাচারী শাসকের মাঝেও পার্থক্য করেন। বর্ণিত হাদীসে ইমাম বুখারী র. এর দাবি এভাবে সাব্যস্ত হয় যে, যদি কোন বিবরণ ও পার্থক্য থাকত, তবে তিনি অবশ্যই বলতেন। যে সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদীসে রয়েছে।

হজ্জ আদায়কারীর লুকতা : আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। "হজ্জ আদায়কারীকে লুক্তাহ্ করতে নবী করিম স. নিষেধ করেছেন।" এতে কোন কিছুকে বাদ দেয়া ছাড়াই নিষেধ করা হয়েছে। আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীসে আছে, "লুকতাহ বৈধ নয়, তবে অনুসন্ধানকারী হিসেবে লুকতাহ উঠানো বৈধ।" এ বিধান অন্যান্য স্থানের লুকতাহ'র মালিক হবার উদ্দেশ্যে তা উঠানো বৈধ নয়। এমনিভাবে হিল্ল ও হারাম শরীফের লুকতাহ'র মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু কোন কোন ফকীহ হিল্ল ও হারাম শরীফের লুক্তাহ্র মাঝে পার্থক্য করেছেন। তারা বলেন হিল্লের লুক্তাহ্ ঘোষণা দেয়ার পর মালিক না পাওয়া গেলে নিজে মালিক হয়ে যাবার উদ্দেশ্যে উঠানো বৈধ। পক্ষান্তরে হারাম শরীফের লুক্তাহ্ এ উদ্দেশ্যে উঠানো বৈধ নয়। ঘোষণা দিয়েই যেতে হবে।[২৭]

---

২৬. প্রাগুক্ত
২৭. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

নবী করিম স.-এর বিশেষভাবে উল্লেখের হিকমাত এটা হতে পারে যে, হজ্জ আদায়কারী প্রয়োজন মাফিক জিনিসপত্র নিয়ে আসে। তাই হারিয়ে গেলে সাথে সাথেই তার খোঁজ শুরু করবে। যেখানে পড়ে থাকবে, সেখানেই থাকতে দেবে। যেমন, আবূ দাউদ শরীফে ইবনে ওহাব র. বর্ণিত হাদীসে আছে- "ফেলে রাখবে, শেষে তার মালিক তা পেয়ে যাবে। আর ঘোষণাকারী " অনুসন্ধানকারী ছাড়া"-কে বিশেষায়িত করার কারণ হলো হজ্জে সারা বিশ্বের লোকেরা আসে। এখন মালিক কোথায় পাবে, এ চিন্তা করে ঘোষণা দিতে অলসতা করতে পারে। এমতাবস্থায় হজ্জের উদ্দেশ্যে আবাসনকারীর পড়ে থাকা বস্তু কুড়িয়ে নেয়া উচিত নয় বরং যেখানে পড়ে আছে সেখানেই থাকতে দিতে হবে।

উপসংহার : আলোচ্য আলোচনার নিরিখে বলা যায় যে, লোভী লোকদের জন্য লুকতাহ্ উঠানো বৈধ নয়। যারা নির্লোভ তাদের জন্যেই লুকতাহ্ উঠানো বৈধ। তবে হ্যাঁ যদি এমন জিনিস হয়, যা অতি নগণ্য বস্তু যা মালিক খোঁজ করবে না এবং তা তিনি না তুললে নষ্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে এমতাবস্থায় তা তার জন্য তোলা বৈধ হবে এবং মালিকের অনুমতি ব্যতীত তা ব্যবহার করা যাবে। তবে এমতাবস্থায়ও বিরত থাকা উত্তম। আর মূল্যবান জিনিস যদি কেউ হস্তগত করে, তাহলে তাকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নির্দিষ্ট (১/২/৩ বছর) সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এর পরেও মালিক না আসলে উক্ত ব্যক্তি দরিদ্র হলে নিজেই ব্যবহার করবে অন্যথায় দরিদ্রদেরকে সাদকাহ করে দিবে। তবে উক্ত ব্যক্তি ধনী হলেও এ সময়ে তা তিনি ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৬
এপ্রিল-জুন : ২০১১

বিচারবহির্ভূত হত্যা : প্রচলিত আইন ও ইসলামের ফৌজদারি নীতিমালার তুলনা

মোঃ শাহাদাত হোসেন*

[সারসংক্ষেপ : *ন্যায়বিচার লাভের অধিকার ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে অনেক বড় বড় সংগ্রাম হয়েছে এবং এরই ফল স্বরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আইনের এ সংস্কার সাধিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত ও রসূল স. প্রদর্শিত জীবন বিধান যে দিন থেকে সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল সে দিন থেকে ন্যায়বিচারের সার্থক বাস্তবায়ন পৃথিবী পর্যবেক্ষণ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিনন্দন নামের আড়ালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে বিচারবহির্ভূত ভাবে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে যা কোন সভ্য সমাজের মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। এই প্রবন্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যা সম্পর্কে ইসলাম ও সাধারণ আইনের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং বিচারবহির্ভূত হত্যা সংক্রান্ত কুরআন-সুন্নাহ ও প্রচলিত আইনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে।*]

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় সকল রাষ্ট্র স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের জনগণের আইনগত অধিকার তথা মৌলিক অধিকারসমূহ সমুন্নত রাখতে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে দাবি করছে। প্রতিটি সরকারই একান্তভাবে চান, তার দেশের আইন শৃঙ্খলার উন্নতি, বিচারব্যবস্থার সুদৃঢ় অবস্থান, যাতে সকল নাগরিক আইনের আওতায় সমান সুযোগ লাভ করতে পারে। কিন্তু এ কথাও এড়িয়ে যাবার সুযোগ নেই যে, বিভিন্ন আদর্শে উজ্জীবিত রাজনৈতিক সরকার তাদের প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার জন্য বা সাময়িকভাবে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধের নামে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে আদালতকে পাশ কাটিয়ে কোন রকম বিচার ছাড়াই মানুষ হত্যা করে নিজ রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির অপচেষ্টা করে। এ সকল হত্যাকাণ্ডের পেছনে সরকারগুলো বিভিন্ন যুক্তিও প্রদর্শন করে থাকে যার তেমন কোন আইনগত ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রতিটি নাগরিকের আইনের সমান আশ্রয়

---

* প্রভাষক, আইন বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

www.pathagar.com

লাভের সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার রয়েছে, যা কোন ব্যক্তি বা সরকার কোন ভাবেই কেড়ে নিতে পারে না। বিচারব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়ে স্বীকৃত মানবাধিকার হরণ করা হলে শাসনব্যবস্থার ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা হ্রাস পায় এবং বিচারব্যবস্থা হয়ে পড়ে দুর্বল।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের গোড়ার কথা

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঠিক কবে কোথায় প্রথম সংঘটিত হয়েছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও এ কর্মকাণ্ড পৃথিবীতে প্রচলিত সকল সভ্যতায় কমবেশি ছিল বলেই ইতিহাসবিদগণ ধারণা করে থাকেন। কাজেই এ বিষয়টি একটি পৃথক গবেষণার বিষয় হতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের হত্যা এবং ডেথ স্কোয়াড নামগুলো আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দেখতে পাই। এগুলো সাধারণত দু' ধরনের হয়ে থাকে– এক. এমন সব হত্যাকাণ্ড, যার সাথে রাষ্ট্রযন্ত্র সরাসরি জড়িত থাকে অর্থাৎ রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় তার কোন বিশেষ বাহিনীর মাধ্যমে বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য সম্পাদন করে। দুই. এমন সব হত্যাকাণ্ড, যা কোন বিশেষ গ্রুপ কোন বিশেষ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করার জন্য সম্পাদন করে। এ দু'ধরনের হত্যাই বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং আইনের দৃষ্টিতে দণ্ডনীয় অপরাধ।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আদম আ. পুত্র কাবিল হত্যার মাধ্যমে পৃথিবীতে যে হত্যার ঘটনা শুরু হয় তা কালক্রমে সুমেরীয়, আসিরীয়, গ্রীক, রোমান স্বৈরাচারী আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এরপর রসূল স. ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগ পরবর্তী উমাইয়্যা, আববাসীয় ও ফাতেমিয় যুগেও বিচারবহির্ভূত হত্যা কাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। আধুনিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই বলশেভিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল ১৯৩০ এর দিকে। এ বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরও সূচনা হয় এবং এরই প্রেক্ষাপটে প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তৎকালীন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রসমূহ এ সকল প্রতিবাদী কণ্ঠগুলোকে দমন করার জন্য বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যাকাণ্ড পরিচালিত করে।

১৯৫৫-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত ঐতিহাসিক ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ে মার্কিন ও ভিয়েতনাম সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত 'ভিয়েতকং' ক্যাডারদের বিপক্ষে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করা হয়, যা 'ফনিক্স প্রোগ্রাম' নামে খ্যাত, যেখানে তারা প্রায় ২৬ সহস্রাধিক মানুষকে হত্যা করে।[১] ১৯৩৯-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত দ্বিতীয়

১. কারনো, স্টেনলি, *ভিয়েতনাম: এ হিস্ট্রি*, নিউইয়র্ক, ভিকিং, ১৯৪৮, পৃ. ৬০

www.pathagar.com

বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস সবার জানা, যেখানে হিটলার কোনো কারণ ছাড়া প্রায় ৬০ লাখ ইহুদিকে হত্যা করেছিল বলে দাবী করা হয়।

১৯৭৬ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ল্যাতিন আমেরিকার রাষ্ট্র আর্জেন্টিনাতে সংঘটিত হয় দ্বিতীয় 'ডার্টি ওয়ার' যাকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বা সমর্থিত নির্যাতন বলা হয়ে থাকে। এ সময় প্রায় ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষকে বিনা বিচারে হত্যা করা হয়েছিল।[২]

একই অঞ্চলের ক্ষুদ্র রাষ্ট্র চিলি। ১৯৭২ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত একইভাবে তৎকালীন শাসক শ্রেণী 'অপারেশন কনডর' পরিচালনা করেছিল, যা সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট সমর্থিত আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। এ ভয়াবহ অভিযানে প্রায় ৬০ হাজার মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।[৩]

দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, এ ধরনের গর্হিত কাজ বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিদ্যমান। এশিয়ার দ্বীপ রাষ্ট্র ফিলিপাইনে সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপকভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। এশিয়া টাইমস পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০১ সাল থেকে ২০১০ পর্যন্ত প্রায় ১২ হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করে সে দেশের মিলিটারি ও পুলিশ বাহিনী।[৪] এ হত্যাকাণ্ড আরোইয়া সরকারের সময় সবচেয়ে বেশি ঘটেছিল বলে গবেষণায় উঠে এসেছে।[৫]

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমার উপজাতি সংখ্যালঘু কারেন বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করছে। এছাড়াও বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত ও আমাদের সীমান্তের সাধারণ নিরপরাধ মানুষদের হত্যা করে চলেছে, যা প্রতিনিয়ত দেশের জাতীয় দৈনিকে লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর এ্যাকশনকে প্রথম দিকে 'ক্রস ফায়ার' এবং পরবর্তীতে এনকাউন্টার নামে অভিহিত করা হয়।

---

২. দি গর্ডিয়ান, ইউ কে., ২ এপ্রিল, ২০০৯' ডানিয়েল, আলফানসো, *আর্জেন্টাইন'স ডার্টি ওয়ার: দ্যা মিউজিয়াম অব হরর*, ১৭ মে, ২০০৮

৩. *ই. এল. ইউনিভার্সাল. কম, এম এক্স (মেক্সিকো), ভিক্টোর, ফ্লোরেস অলে*, ১০ এপ্রিল, ২০০৬

৪. *এশিয়া টাইমস*, ডেডলি ডার্টি ওয়ার্ক ইন দ্যা ফিলিপিন, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

৫. সান, জুন, ডা. ই. জে আর, *ক্লাস স্ট্রাগল এ্যান্ড সোসালিস্ট রিভোলিউশন ইন দ্যা ফিলিপিনস: আন্ডাস্ট্যানডিং দ্যা ক্রাইসিস অব ইউ এস হেজিমনি, আরোইয়া স্টেট টেরোরিজম এ্যান্ড নিউ লিবারাল গ্লোবালাইজেশন*, এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন, ১৮, সেপ্টেম্বর, ২০০৬

www.pathagar.com

বিচারবহির্ভূত হত্যা

আমরা স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারি যে, বিচারবহির্ভূত হত্যা এমন হত্যাকাণ্ড যা প্রচলিত ফৌজদারী কার্যবিধির পরিপন্থী, যেখানে আইনের পরিবর্তে বিশেষ স্বার্থের প্রাধান্য অধিক মাত্রায় কার্যকর থাকে। 'বিচারবহির্ভূত' কথাটির অর্থ হলো, সাধারণ প্রচলিত জুডিসিয়াল পদ্ধতি বহির্ভূত বিষয়।[৬]

বিচারবহির্ভূত হত্যার ধরাবাধা কোন সংজ্ঞা নেই তবু আমরা বলতে পারি, যে সমস্ত হত্যাকাণ্ড আদালতের সঠিক রায়ের ভিত্তিতে না হয়ে আদালতের বাইরে কোন রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্দেশনার মাধ্যমে সংঘটিত হচ্ছে তাকে বিচারবহির্ভূত হত্যা বলা হয়। এ ক্ষেত্রে একজন অপরাধী তার স্বাভাবিক আইনগত সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয় অর্থাৎ আত্মপক্ষ সমর্থন করে তার বক্তব্য দেয়ার কোন সুযোগ থাকে না। তাই যে সকল মৃত্যু আদালতের সঠিক রায় ব্যতিরেকে কার্যকর হয় তাকে সাধারণ বিচারে মৃত্যুদণ্ড বলা যায় না, তা অবশ্যই বিচারবহির্ভূত হত্যা।[৭]

এ সকল হত্যা সম্পর্কে সরকার বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন, তবে ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন এ ধরনের হত্যাকাণ্ড যে কাঙ্ক্ষিত নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নিরপেক্ষ বিচারিক পরিবেশের অপ্রতুলতা, বিচার কার্যক্রমে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং প্রয়োজনীয় সৎ ও দক্ষ জনবলের ব্যাপক ঘাটতি থাকায় এসকল অনিয়ম ও অসাংবিধানিক পথের উৎপত্তি হয়। এ পথের মাধ্যমে সাময়িকভাবে কিছুটা ফলাফল পাওয়া গেলেও দীর্ঘ মেয়াদে তা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না।

মৃত্যুদণ্ড প্রদানের প্রচলিত পদ্ধতি

ফৌজদারী অপরাধের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে তিনটি বিশেষ আইন অনুসরণ করা হয়, যেগুলো ছাড়া সঠিকভাবে বিচার সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। প্রথমত: একটি সময়োপযোগী দণ্ডবিধি[৮], যেখানে সকল ধরনের অপরাধের সজ্ঞায়ন করা ও তার উপযুক্ত শাস্তির বিধান সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। দ্বিতীয়ত, একটি ফৌজদারী কার্যবিধি[৯] থাকা, যেখানে একটি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর থেকে নিয়ে বিচারের রায় কার্যকর করা পর্যন্ত যাবতীয় পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা থাকে,

---

৬. *ওয়েস্ট এনসাইক্লোপেডিয়া অব এমেরিকান ল'*, ২০০৮

৭. রশিদ, ব্যারিস্টার হারুন অর, *বিচারবহির্ভূত হত্যা; বিভিন্ন বিষয়*, দ্যা ডেইলি স্টার, ১৮ জুন, ২০০৫

৮. বাংলাদেশের আইনটির নাম, *দণ্ডবিধি*, ১৮৬০

৯. বাংলাদেশের আইনটির নাম, *ফৌজদারী কার্যবিধি*, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫নং আইন), ২০০৭ সালে সংশোধিত হয়।

www.pathagar.com

যাতে করে একটি মামলা তার প্রতিটি ধাপ সঠিকভাবে অতিক্রম করে চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে পারে এবং একটি সুস্পষ্ট সমাধানে পৌঁছাতে পারে। তৃতীয়ত : ফৌজদারী কার্যবিধিকে যথাযথভাবে কার্যকর রাখার জন্য তথা একটি ফৌজদারী মোকদ্দমাকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় বাদী অথবা বিবাদী উভয় পক্ষের সঠিক সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা। আর এই সাক্ষ্য প্রমাণ কিভাবে কতটুকু বা কোন কোন বিষয়ে সাক্ষ্যের আওতাভুক্ত হবে তা নির্ধারণ করে সাক্ষ্য আইন[১০], যা প্রতিটি দেশেই রয়েছে। এই তিনটি আইনের সমন্বয়ে একটি মোকদ্দমা তার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিষ্পত্তি লাভ করতে পারে। আমাদের দেশে সাধারণত দু'ভাবে ফৌজদারী মামলা হয়ে থাকে। একটি হলো থানা থেকে প্রাথমিক তথ্য-প্রতিবেদন বা এফ.আই.আর এর মাধ্যমে সংক্ষেপে যাকে জি.আর মোকদ্দমা বলা হয়; আর অন্যটি হলো বাদি সরাসরি আমলী আদালতে আবেদন বা অভিযোগ দায়েরের মাধ্যমে, সংক্ষেপে যাকে সি, আর মোকদ্দমা বলা হয়। যে ভাবেই মামলা হোক না কেন আমলী আদালত উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন।[১১] তদন্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে মামলার সঠিক কারণ অনুসন্ধানের নির্দেশ প্রদান করে থাকেন এবং সে মোতাবেক উক্ত অফিসার মামলার তদন্ত কার্য পরিচালনা করেন।[১২] এ ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তার নিকট যদি এই সত্য ধারণার উদ্ভব হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের সাথে সংযুক্তির যথাযথ কারণ রয়েছে তাহলে তদন্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে এজহার বা চার্জশিট দাখিল করবেন।[১৩] আর যদি অভিযোগের সাথে উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের কোন সংশ্লিষ্টতা না পাওয়া যায় তাহলে তদন্ত কর্মকর্তা একটি রিপোর্ট আদালতে দাখিল করবেন যাকে ফাইনাল রিপোর্ট বা পুলিশ রিপোর্ট বলা হয়ে থাকে।[১৪] অতপর আদালত অভিযোগ গঠন করার লক্ষ্যে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনানি করবেন।[১৫] শুনানির সময় মামলার সংশ্লিষ্ট দলিলাদি প্রদান করতে হবে। এ সম্পর্কে উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করার পর আদালত যদি মনে করেন যে, আসামীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাবার কোন কারণ নেই তাহলে আদালত আসামীকে অব্যাহতি বা (Discharge) দিবেন এবং এর কারণ লিপিবদ্ধ করবেন।[১৬] কিন্তু শুনানির পর যদি আদালত মনে

---

১০. *সাক্ষ্য আইন*, ১৮৭২ (১৮৭২ সালের ১নং আইন)

১১. ফৌজদারী কার্যবিধি, ৪৬-৫৩, *বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার*, ধারা ৫৪-৬৮, গ্রেফতারি পরোয়ানা, ধারা ৭৫-৮৬ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে।

১২. প্রাগুক্ত, ধারা ১৫৫, ১৬৫, ১৫৯

১৩. প্রাগুক্ত, ধারা ১৫৬, ১৭০

১৪. প্রাগুক্ত, ধারা ১৭৩

১৫. প্রাগুক্ত, ধারা ২৬৫-ক, ২৬৫-খ

১৬. প্রাগুক্ত, ধারা ২৬৫-গ

www.pathagar.com

করেন যে, আসামী অপরাধ করেছে এমন মনে করার যুক্তিসংগত কারণ আছে। তাহলে আদালত আসামীর বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ গঠন করবেন।[১৭] অতপর আদালত বাদী এবং বিবাদী উভয় পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ এবং এর উপর শুনানি করবেন। এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই চূড়ান্ত যুক্তিতর্কে অংশ গ্রহণ করবে।[১৮] যুক্তি-তর্কের পর বাদী পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ, আসামীর জবানবন্দী গ্রহণ এবং বাদী পক্ষ ও আসামী পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করার পর আদালত যদি মনে করেন যে, আসামী অপরাধ করেছে এমন কোন সাক্ষ্য নেই, তাহলে আদালত আসামীকে খালাস দিবেন।[১৯] আর যদি অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাহলে আদালত মামলার রায় ঘোষণা করবেন।[২০] এ ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা এখতিয়ার আছে এমন আদালতই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হওয়া সাপেক্ষে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে পারবেন এবং দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী উচ্চ আদালতে আপীল করার সুযোগ পাবেন। তবে নিম্ন আদালতের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে উচ্চ আদালত বা হাইকোর্ট ডিভিশনের অনুমোদন নিতে হবে।[২১]

বিচারবহির্ভূত হত্যা ও আমাদের সংবিধান

সংবিধান যে কোন দেশের সর্বোচ্চ আইন হিসাবে বিবেচিত হয়। দেশ পরিচালনা অথবা জনগণের মৌলিক অধিকারের সনদ বলা হয় এই সংবিধানকে। আমাদের সংবিধানও এর ব্যতিক্রম কিছু নয়, যেখানে নাগরিকের মর্যাদা ও তার অধিকারসমূহ বর্ণিত হয়েছে এবং আইনের মাধ্যমে তা বলবৎ করার ব্যবস্থাও রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"।[২২] রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের আইনের আশ্রয় লাভের সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি না ঘটে।

"আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না, যাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা,

---

১৭. প্রাগুক্ত, ধারা ২৬৫-ঘ (১, ২)
১৮. প্রাগুক্ত, ধারা ২৬৫-ঞ
১৯. প্রাগুক্ত, ধারা ২৬৫-জ
২০. প্রাগুক্ত, ধারা- ২৬৫-ট
২১. প্রাগুক্ত, ধারা- ৩১ (২)
২২. অনুচ্ছেদ-২৭, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*

www.pathagar.com

দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে"।[২৩] বেআইনী ভাবে অথবা জোর জবরদস্তি করে কোন ব্যক্তি ও তার ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার হনন করা যাবে না। যেমন সুস্পষ্ঠভাবে সংবিধানে উল্লেখ আছে, "আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না"।[২৪] কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে কারণ দর্শানো ছাড়া তাকে আটক রাখা যাবে না এবং আটক হবার ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করতে হবে, শুধু তাই নয় এরূপ ব্যক্তিকে তার মনোনীত আইনজীবীর সাথে পরামর্শের ও তার মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার থেকেও তাকে বঞ্চিত করা যাবে না। "গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেফতারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেফতারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না"।[২৫] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে সংবিধানে যেভাবে একজন ব্যক্তির আইনের আশ্রয় লাভের নিশ্চয়তা রয়েছে সেখানে বিচারবহির্ভূত ভাবে হত্যাকাণ্ডের বিন্দুমাত্র সুযোগ অবশিষ্ট আছে কি? বরং আসামী যত বড় জঘন্য বা বেপরোয়া হোক না কেনো তাকে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং এর মধ্যে থেকেই তার যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যদি আইনের আওতাধীন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হয়, তবে আইনের প্রতি মানুষের আস্থা হ্রাস পাবে এবং মানুষ বাধ্য হবে আইন নিজের হাতে তুলে নিতে যা সমাজের জন্য আরো মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে। যে জন্য একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেছিলেন, "এসকল সংবিধান সকল রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই তৈরী করে"।[২৬] ফলাফল দেখা যায় সাধারণ মানুষের অধিকারগুলোর অবস্থা যাই হোক নিজেদের অধিকারগুলোর নিশ্চয়তা বিধান করে।[২৭] আল-কুরআন ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানিক মূলনীতি এর আওতায় আইন তৈরী ও আনুগত্যের বাধ্যবাধকতা ও শর্ত নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যা পরিবর্তনযোগ্য নয়। যেমন বলা হয়েছে "তোমরা অনুসরণ করো যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ করো না"।[২৮] অর্থাৎ সকল

---

২৩. অনুচ্ছেদ-৩১ প্রাগুক্ত

২৪. অনুচ্ছেদ-৩২ প্রাগুক্ত

২৫. অনুচ্ছেদ-৩৩ (২) প্রাগুক্ত

২৬. জোরসি, পিকলেস, *ডেমোক্রেসী*, লন্ডন : মেথুইন কোম্পানি , ১৯৭০, পৃ. ১০১

২৭. সালাউদ্দিন, মোহাম্মদ, *ইসলামে মানবাধিকার*, অনুবাদঃ মোহাম্মাদ আবুত তাওয়াম ও মোহাম্মাদ আবু নুসরাত হেলালী, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৫, পৃ. ৫১-৬৫

২৮. আল-কুরআন, ৭:৩

www.pathagar.com

ক্ষেত্রেই আল-কুরআনের নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করতে হবে। ইসলামী সংবিধান সে মোতাবেক সর্বপ্রথম একজন নাগরিকের সম্মান ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে এবং একজন ব্যক্তির সম্মান ও জীবন-নাশের সুযোগ চিরতরে বন্ধ ঘোষণা করে।[২৯] ইসলামী সংবিধানের অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, এটি ন্যায় বিচার লাভের অধিকারকে নিশ্চিত করে।[৩০] এই সংবিধানের উদ্দেশ্যই হলো, মানব সমাজে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, যে কারণে আল্লাহ তাঁর রসূলকে ঘোষণা করতে নির্দেশ দেন যে, আমি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।[৩১]" অতএব প্রচলিত ও ইসলামী আইন উভয়ই ন্যায়বিচারের কথা বলে।

হত্যা ও তার পরিণতি সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহ'র দৃষ্টিভঙ্গি

শাস্তি যদি মৃত্যুদণ্ডের মতো গুরুদণ্ড হয় তাহলে তো সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়া ও উচ্চ আদালতের নিশ্চিতকরণের কঠিন শর্ত পূরণ করেই সম্পন্ন করতে হবে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনও রসূল স.-এর সুন্নাহ ইসলামী আইনের উৎস। ফৌজদারী নীতিমালা তথা বৈধ ও অবৈধ হত্যাকাণ্ডের বিভিন্ন অবস্থা এবং তার ক্ষতিকর পরিণতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়েছে আল-কুরআন। কোন মানুষকে হত্যা করা ইসলাম জঘন্য অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করেছে। পৃথিবীতে সর্ব প্রথম রক্তপাত হয়েছিল আদম আ.-এর পুত্র হাবিল ও কাবিলের মধ্যে। সেখানেও হত্যাকারীকে তিরস্কার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত কর, তবে আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার দিকে হস্ত প্রসারিত করব না। কেননা, আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি। আমি চাই যে, আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও। অতপর তুমি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এটাই অত্যাচারীদের শাস্তি। অতপর তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃ হত্যায় উদ্বুদ্ধ করল এবং সে তার ভাইকে হত্যা করল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্ত দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল"।[৩২] হাদীসের ভাষ্য মোতাবেক পৃথিবীতে যত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে তার যে গুনাহ হবে সেখান থেকে একটি অংশ প্রথম হত্যাকারীর আমলনামায় যুক্ত হবে অর্থাৎ প্রতিটি হত্যাকান্ডের অভিযোগের একাংশ অভিযোগ

---

২৯. আবুল আলা, সাইয়েদ, *ইসলামী আইন ও সংবিধান*, অনুবাদ : আব্দুস শহীদ নাসীম ও অন্যান্য, ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ. ২৩৭

৩০. সালাউদ্দিন, মোহাম্মদ, *ইসলামে মানবাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

৩১. আল-কুরআন, ৭:২৯, ৫:৮, ৪:৫৮, ৬:১৫২

৩২. আল-কুরআন, ৫:২৮, ২৯, ৩০

www.pathagar.com

আদম আ. পুত্র কাবিলের উপর বর্তাবে এবং সে এসকল হত্যার অভিযোগে শেষ বিচারের দিন অভিযুক্ত হবে।[৩৩] আল-কুরআন মানুষকে আল্লাহর খলীফা হিসাবে মর্যাদা প্রদান করেছে এবং পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে প্রত্যেক মানুষের জীবনকে অন্যের জন্য পবিত্র ঘোষণা করেছে। মানুষের এ মর্যাদার মাপকাঠি হিসাবে আল্লাহভীতিকে নির্ধারণ করা হয়েছে। রসূল স. বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করেন, "তোমাদের একজনের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং সম্মান এমনই পবিত্র (অন্যজনের নিকট) যেমন আজকের এই দিন (আরাফার দিন), এই নগর (মক্কার হারাম এলাকা)"।[৩৪] সুতরাং এমন মর্যাদাপূর্ণ মানুষকে কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়া হত্যা করা রসূল স.-এর নির্দেশের লঙ্ঘন। কুরআন বলেছে, "যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ বা বিপর্যয় সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করে এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সমস্ত মানুষকেই রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গাম্বরগণ প্রকাশ্য নির্দেশাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এর পরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে"।[৩৫] আয়াতটি বিশ্লেষণ করলে খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারি যে, বিনা বিচারে কোন মানুষকে হত্যা করার অর্থ সমগ্র মানব জাতিকে হত্যার মতো জঘন্য ও গুরুতর অপরাধ। এ যেন ব্যক্তিকে নয়, সমাজকে, সমাজের মানুষের নিরাপত্তাকে সে হত্যা করল। এবং এর ফলাফল শুধু একজন মানুষের নিহত হওয়াই নয় বরং সমাজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং সমাজ ব্যবস্থায় আইনের শাসনে বিঘ্নিত হয়; আইনের প্রতি মানুষের আস্থাহীনতা সৃষ্টি হয়। কুরআন সে কারণে এহেন হীন অপকর্মকে সবচেয়ে ঘৃণিত কাজ এবং এর জন্য মারাত্মক পরিণতির সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। কুরআন ঘোষণা করেছে, "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মুসলমানকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানেই সে চিরকাল অবস্থান করবে। আর আল্লাহ তার উপর ক্রোদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন"।[৩৬] এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, কতিপয় কারণে কোন ব্যক্তিকে

---

৩৩. বুখারী, ইমাম, *আস্-সহীহ*, অধ্যায় : আদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদ : ওয়ামান আহইয়াহা, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস্ সালাম, ২০০০, পৃ. ৫৭৩

৩৪. আহমদ, ইমাম, *আল-মুসনাদ*, আল-কাহেরা : তা. বি. পৃ. ১৩৮

৩৫. আল-কুরআন, ৫:৩২

৩৬. আল-কুরআন, ৪:৯৩

www.pathagar.com

হত্যা করা যাবে তবে সেই কারণ সংঘটিত হয়েছে কিনা তা বিচার করার জন্য অবশ্যই একটি বিচার বিভাগ থাকবে যারা বিষয়টি নির্ধারণ করবে এবং সে মোতাবেক অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করবে। এ বিষয়টিকে নিশ্চিত করার জন্য কুরআন ঘোষণা করেছে, "আপনি বলুন, এসো আমি তোমাদেরকে ঐ সব বিষয় পাঠ করে শোনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো, স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে খাদ্য দেই, নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না, কিন্তু ন্যায় ভাবে (যদি হয় তবে তা আলাদা) তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ"।[৩৭] অন্যত্র বলা হয়েছে, "সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন, কিন্তু ন্যায়ভাবে, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা প্রদান করি। অতএব, সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত"।[৩৮] উপরোক্ত আয়াত দু'টি সুস্পষ্টভাবে আইনগত বাধ্যবাধকতাতে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্ষমতাপ্রাপ্ত বৈধ কারণ ছাড়া কর্তৃপক্ষ, কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠান কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে তো নয়ই বরং কোন অপরাধী ব্যক্তিকেও কোন রূপ শাস্তি প্রদান করা সরাসরি আল্লাহর নির্দেশের লঙ্ঘন। কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে ইসলাম তাও সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছে। ইসলামী আইনে নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যাকারীর অবস্থা আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে, তাই এমন ব্যক্তি তার কৃতকর্মের শাস্তি লাভ করারই উপযোগী। আর অন্যদিকে তাকে শাস্তি প্রদান করার মধ্য দিয়ে তাকে এবং সমাজকে পরিশুদ্ধ করার মহান দায়িত্ব বর্তায় সমাজ পরিচালকদের উপর। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. বলেছেন, "ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুমিন ধর্মীয়ভাবে স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোন মানুষকে হত্যা করে"।[৩৯] হাদীসখানা অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে। যেহেতু কোন মুসলিমের আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশনা মেনে চলা বা লঙ্ঘন করা তার

---

৩৭. আল-কুরআন, ৬:১৫১

৩৮. আল-কুরআন, ১৭:৩৩

৩৯. বুখারী, ইমাম, *আস্-সহীহ*, অধ্যায় : আদ্-দিয়াত, অনুচ্ছেদ : ওয়ামান ইউকতাল মুমিনান মুতায়াম্মিদান ফাজাউহু জাহান্নাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২

www.pathagar.com

শরয়ী আনুগত্যের মানদণ্ড হিসাবে ধরা হয়ে থাকে, কোন ব্যক্তির হত্যাকাণ্ড ঘটানো অবশ্যই আল্লাহর নির্ধারিত সীমার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন; শাস্তিই তার একমাত্র পাওনা এবং তাকে তা প্রদান করাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ। আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম রক্তপাতের বিচার করবেন"।[৪০] আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল স. বলেছেন, "হত্যাকাণ্ড এমন একটি নিকৃষ্ট কর্ম যার ক্ষতিকর পরিণতি থেকে অপরাধী কখনো পালাতে পারে না"।[৪১]

ইসলামের বিচার বিভাগীয় নীতিমালা

পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ধর্মই মানুষের মর্যাদা, তার অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সুন্দর সুন্দর বাণী দিয়েছে কিন্তু ইসলাম একমাত্র জীবন বিধান যা মানুষের অধিকারকে পরিকল্পিতভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার অনন্য উদাহরণ পেশ করেছে। ইসলাম ন্যায়বিচারের কথা বলে, আদল-ইনসাফের কথা বলে, বিশ্বমানের বিচারব্যবস্থার কথা বলে। তবে এ সকল শুধু থিউরী নয় সম্পূর্ণ বাস্তব যা মানবতার শিক্ষক রসূল স. তাঁর সমগ্র জীবন দিয়ে এবং তাঁর সাহাবাগণ সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল্লাহ তাঁর রসূল স. কে নির্দেশ দিয়েছেন "বলুন, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে আদিষ্ট হয়েছি[৪২]"। যে সুন্দর পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে খোদ সেই পৃথিবীকেও মহান আল্লাহ আদলের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই ন্যায়বিচার বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদণ্ড, যাতে তোমরা সীমালংঘন না কর তুলাদণ্ডে। ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিয়ো না[৪৩]"। এসবের পাশাপাশি যারা ন্যায়বিচার করে, ইনসাফ করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন, ভালবাসেন সে কথাও ঘোষণা করেন[৪৪]। সুতরাং একজন অপরাধীকে যেমন ন্যায় বিচারের মাধ্যমে করতে হবে ঠিক তেমনি একজন নিরপরাধ ব্যক্তির ন্যায় সংগত অধিকারকেও সমুন্নত রাখতে হবে।

---

৪০. প্রাগুক্ত
৪১. প্রাগুক্ত
৪২. আল-কুরআন, ৪২:১৫
৪৩. আল-কুরআন, ৫৫: ৭-৯
৪৪. আল-কুরআন, ৬০:৮

www.pathagar.com

ইসলামে আদালত ও বিচারকার্য পরিচালনার নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর অধিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চাইতে বেশী। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কে অবগত"[৪৫]। ঠিক একইভাবে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, "আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দেখিয়েছি"[৪৬]।

উপরোক্ত আয়াত থেকে বিচার বিভাগের মূলনীতি হিসাবে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ করি–

- বিচারককে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে।
- বিচারককে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত থাকতে হবে।
- বিচারপ্রার্থীকে বা তার পক্ষে আগত সাক্ষীকে সত্য ও ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান করতে হবে।
- বিচারককে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করতে হবে।
- বিচারককে পক্ষপাতহীন হয়ে বিচার করতে হবে।
- রাগান্বিত অবস্থায় বিচারককে রায় দেয়া নিষিদ্ধ[৪৭]।

এ ছাড়াও হাদীসে এসেছে, "এক মহিলার শাস্তি না দেওয়া সম্পর্কে সাহাবী হযরত উসামা রা. নবী স-এর কাছে সুপারিশ করলেন। অতপর তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা তাদের দুর্বল

৪৫. আল-কুরআন, ৪:১৩৫

৪৬. আল-কুরআন, ৫:৪৮

৪৭. বুখারী, ইমাম, *আস্-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আহ্কাম, অনুচ্ছেদঃ হাল ইয়াকযিল কাযি আও ইউফতি ওয়া হুয়া গাদবানু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৬,

www.pathagar.com

(সাধারণ) লোকদের ওপর দণ্ড বা শাস্তি প্রয়োগ করতো আর তাদের (সম্ভ্রান্ত)-দেরকে রেহাই দিতো। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি ফাতিমাও এ কাজ করতো অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম[৪৮]।" এ হাদীস থেকে আমরা আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমতা বিধানের উজ্জ্বল দিক নির্দেশনা পাই। এখানেই শেষ নয়, যখন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দণ্ড ঘোষিত হয় সেই দণ্ড লাঘবের জন্য বিচারক বা প্রশাসকের নিকট কোন সুপারিশ করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৪৯] আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কোন ব্যক্তিকে ক্ষমা করার, যার কোন সুযোগ ইসলামী ফৌজদারী আইনে নেই। উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা থেকে ইসলামের বিচার বিভাগ ও নীতীমালাসমূহ পরিষ্কার হলো। বিচার ছাড়া কাউকে কোন ধরনের দণ্ড বিশেষ করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উপরন্তু কোন এক পক্ষের বক্তব্য শুনে বিচার করতে নিষেধ করা হয়েছে। বরং অন্য পক্ষের বক্তব্য শোনার পরই বিচারের রায় ঘোষণা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কোন সুযোগ নেই বরং মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ সম্পূর্ণ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে।

উপসংহার

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামের মোড়কে ন্যায়বিচারের বাইরে রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক যে সমস্ত হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হচ্ছে তা আইনের দৃষ্টিতে কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। উপরন্তু এ ধরনের কাজ মানবাধিকার ঘোষণাপত্রসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনসমূহের সুস্পষ্ট লংঘন। কোন মানুষ এমনিভাবে অন্যায় হত্যাকাণ্ড সম্পাদনের মাধ্যমে সমাজে শাস্তি বিধান গ্রহণ করতে পারে না। সরকার অপরাধীকে দ্রুত ন্যায় বিচার করে শাস্তি বিধান করার কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারেন। অন্যথায় বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সীমালংঘন এক সময় নিয়ন্ত্রণের বাইওে চলে যাবে, যা শাসকদের জন্যেও সমূহ বিপদ ঢেকে আনতে পারে। সেই সাথে ভেঙ্গে পড়তে পারে আইনশৃংখলার সকল বন্ধন।

---

৪৮. প্রাগুক্ত পৃ. ৫৬৬
৪৯. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

।। ল' রিসার্চ রিপোর্ট ।।

৯ এপ্রিল ২০১১ শনিবার বিকেল ৫ টায় বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর জেনারেল সেক্রেটারী এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সাহেব-এর সভাপতিত্বে সংস্থার অডিটরিয়ামে লেকচার সিরিজ অন দি হলি কুরআন শীর্ষক বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতা উপস্থাপিত হয়। বক্তব্য উপস্থাপন করেন অনুষ্ঠানের মুখ্য আলোচক বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোঃ রফিকুল ইসলাম। আরো আলোচনা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুস সালাম আল-মাদানী, সাবেক বিচারপতি আমীরুল কবির চৌধুরী, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর ঢাকা ক্যাম্পাসের আরবি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুস সামাদ প্রমুখ।

বক্তব্য রাখছেন মুখ্য আলোচক প্রফেসর মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

মুখ্য আলোচক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, যদি কখনও কোন গ্রন্থ কোন এক অসভ্য মানবগোষ্ঠীকে সুসভ্য ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও জাতিতে পরিণত করে থাকে এবং তাদেরকে অনুপম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পরিচিতি দান ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বরূপে প্রতিষ্ঠা করে থাকে এবং হাজার বছরের অধিক কাল ধরে তা তাদের উদ্দীপনার শ্রেষ্ঠতর উৎসরূপে অব্যাহত থাকে তবে তা হচ্ছে এ আল-কুরআন। এ মহাগ্রন্থের প্রভাব শুধু মুসলিম ও তাদের কৃষ্টি কালচারেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি বিভিন্নভাবে গোটা বিশ্ব মানবেতিহাসের মূল স্রোতধারায় বিভিন্ন ঐতিহ্যের পতাকাবাহী মানব গোষ্ঠীর সংস্কৃতি, চিন্তাধারা ও জীবনাচরণে প্রভাব বিস্তার করে।

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানে উপস্থিতির একাংশ

আল-কুরআন সর্বশেষ নবী স.-এর উপর আল্লাহপ্রদত্ত কিতাব যা জিবরাইল আমীন কর্তৃক মহানবী স.-এর নবুওয়তের দীর্ঘ প্রায় তেইশ বছরে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ক্রমিক ধারায় মানবজাতির পথনির্দেশনার লক্ষ্যে সত্যায়নসহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং সনদ পরম্পরার মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়ে আসছে যার তেলাওয়াত ইবাদত হিসেবে গণ্য তাকেই বলে কুরআন।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আল-কুরআন আল্লাহপ্রদত্ত ওহী যা স্বয়ং নবী স.-এর কথা ও বাণী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তার সাহাবী ও মুমিনগণ আল-কুরআনকে বিশেষভাবে মর্যাদা দান করতেন ও সুসংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পার্থক্য বজায় রাখতেন।

অন্তত খ্রীস্ট ধর্মে লালিত পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ আল-কুরআন সম্পর্কে অনবহিত থাকার কোন কারণ নেই। ইউরোপীয় অনেক ভাষায় আল-কুরআন অনূদিত হয়েছে যা দ্বারা কুরআনের প্রতি তাদের সমর্থন ও বুদ্ধিগত আগ্রহের প্রমাণ মিলে । ১১৪৩ সালে প্রথম ল্যাটিন ভাষায় কুরআন অনূদিত হয় যার উপর ভিত্তি করে কুরআনের আরো অনুবাদ হতে থাকে। এসব অনুবাদের উপর একটু দৃষ্টি দিলেই বুঝতে পারা যাবে যে, ইহুদী ও খ্রীস্টধর্মের পটভূমিকায় তারা আল-কুরআনকে অনুবাদের প্রয়াস চালিয়ে বরং ভুল বুঝেছেন ও বিচিত্র ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। এসব অনুবাদকে পাথেয় করে এবং এসব উৎস ব্যবহার করে তারা স্বয়ং কুরআন এমনকি ইসলাম সম্পর্কেও ভ্রান্ত নীতি ও দৃষ্টিকোণ অর্জন ও পোষণ করেন যা মানবতার হিদায়াতের পথে এক বড় ধরনের হুমকি।

www.pathagar.com

আল-কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যার মধ্যে মানুষের চিন্তা, কল্পনা ও কথা যুক্ত হয়নি।

রসূল স. জিবরাইল আমীনের মাধ্যমে যে ওহী লাভ করেন তা তিনি লাভ করেন মুখনিঃসৃত ধ্বনি ও কালামরূপে, লিখিতরূপে নয়। আল্লাহর মহা পরিকল্পনায় মানুষের সময়, স্থান ও প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন সময়ে, স্থানে নবী স.-এর ক্বালব বা অন্তঃকরণে বাণী অবতীর্ণ হয়েছে। মহানবী স.-এর ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে ওহীর সমাপ্তি ও পরিপূর্ণতা নিশ্চিত হয়।

হাদীসের সত্যতা প্রমাণের জন্য এক জাতীয় মানদণ্ড বিকশিত হলেও আল-কুরআনের বিষয়ে এ জাতীয় মানদন্ড বিকাশের সুযোগ অবান্তর। এটি প্রথমত: এজন্য বিস্ময়কর যে, যখন কেউ কুরআনের প্রকৃতি নিয়ে বিবেচনা করবে তখন তার কাছে এ জাতীয় প্রক্রিয়া নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হবে।

ড. আবদুস সামাদ বলেন, কুরআনকে চ্যালেঞ্জ করার বহু অপচেষ্টা পৃথিবীতে হয়েছে কিন্তু সব চ্যালেঞ্জ ব্যর্থ হয়েছে। কুরআন তার সমহিমায় অবিকৃত ও সমুজ্জল রয়েছে এবং থাকবে অনন্তকাল পর্যন্ত। কারণ কুরআনের সুরক্ষার ব্যাপারে মহান আল্লাহ নিজেই অঙ্গীকার করেছেন। তাই মানব সভ্যতাকে সমুন্নত রাখতে হলে সর্বক্ষেত্রে কুরআনের আদর্শ বাস্তবায়ন করতে হবে।

সভাপতির ভাষণে এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, পবিত্র কুরআনের বিধান সমাজে চালু থাকলে বর্তমান মুসলিম সমাজের এ দুরবস্থা সৃষ্টি হতো না। মুসলিম বিশ্বে দেখা দিতো না অস্থিরতা। কুরআনের বিধান চালু থাকলে ন্যায় বিচার নিয়ে এতো চিৎকার করতে হতো না। সমাজে জালেমদের প্রাধান্য থাকতো না, মজলুমের আর্তনাদে বাতাস ভারী হতো না।

তিনি আরো বলেন, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মানব সমাজকে আল-কুরআনে নির্দেশনা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রসহ সকল ক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে।

প্রফেসর ড. আব্দুস সালাম আল-মাদানী বলেন, কুরআন মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে। কুরআন ছাড়া মানুষের মানবিক গুণাবলির সত্যিকার বিকাশ ঘটে না। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন, আল-কুরআনের প্রথম সূরা বাকারা আর শেষ সূরা নাস অর্থাৎ কুরআন পশু দিয়ে শুরু আর মানুষের বর্ণনা দিয়ে শেষ। কুরআন পাশবিক গুণাবলির মানুষকেও অনুশীলন ও অনুসরণের মাধ্যমে সত্যিকার মানুষে পরিণত করে। তাই আসুন আমরা সবাই কুরআন অনুসরণ করি।

www.pathagar.com

১. রিসার্চ প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইন
খ. মুসলিম পারিবারিক আইন
গ. নারী, শিশু ও মানবাধিকার
ঘ. ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস
ঙ. ইসলামী আইন সম্পর্কে ভ্রান্তি নিরসন
চ. ইসলামী আইনের কল্যাণ ও কার্যকারিতা উপস্থাপন

২. লিগ্যাল এইড প্রজেক্ট

ক. পারিবারিক বিরোধ নিরসনে সালিশ
খ. আদালতের বাইরে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি
গ. অসহায় মজলুমদের আইনী সহায়তা
ঘ. নির্যাতিতা নারী ও শিশুদের আইনী সহায়তা
ঙ. ইসলামের পক্ষে আইনী প্রতিরোধ

৩. সেমিনার প্রজেক্ট

ক. আন্তর্জাতিক আইন সেমিনার
খ. জাতীয় আইন সেমিনার
গ. মাসিক সেমিনার
ঘ. মতবিনিময় সভা
ঙ. গোল টেবিল বৈঠক

৪. জার্নাল প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)
খ. ইসলামিক ল' এন্ড জুডিশিয়ারী (ষান্মাসিক)
গ. আরবী জার্নাল (ষান্মাসিক)
ঘ. মাসিক পত্রিকা
ঙ. বুলেটিন

৫. বুক পাবলিকেশন্স প্রজেক্ট

ক. মৌলিক আইন গ্রন্থ
খ. অনুবাদ আইন গ্রন্থ
গ. আইনের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা
ঘ. ইসলামী আইন কোড
ঙ. ইসলামী আইন বিশ্বকোষ

৬. লেখক প্রজেক্ট

ক. বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক লেখক ফোরাম
খ. আইনজীবী ভিত্তিক লেখক ফোরাম
ঘ. মাদরাসা ভিত্তিক লেখক ফোরাম
ঘ. লেখক ওয়ার্কশপ
ঙ. লেখক সম্মেলন

৭. লাইব্রেরী প্রজেক্ট

ক. কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ
খ. ফিক্‌হ ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ
গ. আইন ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ
ঘ. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ
ঙ. ইসলামের ইতিহাস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ

৮. উন্নয়ন প্রজেক্ট

ক. আইন কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা
খ. আইন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
গ. আধুনিক অডিটোরিয়াম প্রতিষ্ঠা
ঘ. ই-লাইব্রেরী
ঙ. আইন ওয়েব সাইট

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার নিয়মাবলি

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দুই কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় কিবোর্ড ব্যবহার করে (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2000) টাইপ / ফন্ট Sutonny MJ ব্যবহার করতে হবে। কাগজের সাইজ অ৪। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে : উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১.৬৫ ইঞ্চি, বামে ১.৬ ইঞ্চি। প্রবন্ধের সফ্‌ট কপি সংস্থার ই-মেইল ঠিকানায় মেইল করে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে লেখকের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা থাকতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রবন্ধের সাথে লেখককে/দের এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে :

ক. জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/ তাঁরা;

খ. প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো জার্নাল-এ মুদ্রিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য তা অন্য কোনো জার্নালে জমা দেয়া হয়নি;

গ. প্রবন্ধে প্রকাশিত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোন পাণ্ডুলিপি ফেরত দেয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক জার্নাল-এর ২ (দুই) টি কপি এবং ৫ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. প্রবন্ধ বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণে (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান) রচিত হবে। তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

৫. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। লেখক কোন বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। টীকা ও বক্তব্যের উৎস উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে দিতে হবে। তথ্যনির্দেশের ক্ষেত্রে শব্দের উপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন[১]) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থ ও জার্নাল থেকে তথ্যসূত্র এভাবে লিখতে হবে।

যেমন– গ্রন্থ :

ক. এবাদুল হক, কাজী, *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ.২৯

খ. ইবনে হাযম, *আল-মুহাল্লা*, আল-কাহেরা : মাকতাবা দারুত্‌তুরাস, ২০০৫, খ. ১, পৃ. ৯০

গ. হুসাইন, যিকরা তাহা, *জামহুরিয়াতু মিসর আল-আরাবিয়্যাহ*, ওযারাতুস সাকাফা, আল-কাহেরা : আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯৭৭, পৃ. ১০৩

www.pathagar.com

প্রবন্ধ ঃ

* Monsoor, Dr. Taslima, Dissolution of Marriages on Test; A Study of Islamic Family Law and Women, *Journal of the Faculty of Law*, University of Dhaka, Volume:15, Number:1, June 2004, p. 26

৬. মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। *গ্রন্থ ও পত্রিকার নাম বাঁকা অক্ষরে (ওঃধষরপ) হবে* যেমন, গ্রন্থ ঃ *বিচারব্যবস্থার বিবর্তন;* পত্রিকা : *Journal of islamic law and judiciary.*

৭. কুরআনুল করীম-এর অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত আল-কুরআনুল করীম ও হাদীসসমূহের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আধুনিক প্রকাশনী ও বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার-এর অনুবাদ অনুসরণ করে চলতি রীতিতে রূপান্তর করতে হবে, তবে রেফারেন্সদানের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের (আরবি, উর্দু, বাংলা, ইংরেজি যে ভাষায় হোক) রেফারেন্স টেক্সটসহ দিতে হবে। ঝবপড়হফধৎু ংড়ঁপব এর উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআনুল করীমের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে। কুরআনের উদ্ধৃতি হবে এভাবে– আল-কুরআন, ২:১৫। হাদীসের উদ্ধৃতি হবে এভাবে– বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়:--, অনুচ্ছেদ:---, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান:---, প্রকাশকাল---, খ.--, পৃ.--। এছাড়া যে সকল প্রবন্ধে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি দেয়া হবে সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় তার অনুবাদ দিতে হবে।

৮. প্রকাশিত প্রবন্ধের ব্যাপারে কারো ভিন্ন মত থাকলে যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

৯. প্রবন্ধের শুরুতে 'সারসংক্ষেপ' এবং শেষে 'উপসংহার' অবশ্যই দিতে হবে।

১০. কুরআন ও হাদীসের আরবী Text নিচে ফুটনোটে এবং অনুবাদ মূল লেখার সাথে দিতে হবে।

প্রবন্ধ প্রেরণের ঠিকানা
সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন :০২-৭১৬০৫২৭, ০১৭১২-০৬১৬২১, ০১৭১৭-২২০৪৯৮
ই-মেইল: islamiclaw_bd@yahoo.com

www.pathagar.com

ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার

গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর গ্রাহক/এজেন্ট হতে চাই। আমার ঠিকানায় .....কপি পাঠানোর অনুরোধ করছি।

নাম ঃ .....

ঠিকানা ঃ.....

.....

বয়স..... পেশা .....

ফোন/মোবাইল ঃ .....সহজলভ্য মাধ্যম ঃ

ডাক/কুরিয়ার : ফরমের সঙ্গে ..... টাকা সংস্থার নামে মানি অর্ডার/টিটি/ডিডি করলাম/অথবা নিম্নলিখিত ব্যাংক একাউন্টে জমা দিলাম।

কথায় টাকা.....

স্বাক্ষর

গ্রাহক/এজেন্ট

ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে

সম্পাদক

ইসলামী আইন ও বিচার

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০২-৭১৬০৫২৭, ০১৭১২-০৬১৬২১, ০১৭১৭-২২০৪৯৮

E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com. www.ilrcbd.com

সংস্থার একাউন্ট নং

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

গঝঅ-১১০৫১ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, পল্টন শাখা, ঢাকা

ভি.পি ও কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়।

ডাক বা কুরিয়ার চার্জ সংস্থা বহন করে।

এজেন্ট হওয়ার জন্য ৫ কপির অর্ধেক মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হবে।

গ্রাহক হওয়ার জন্য ন্যূনতম এক বছর তথা ৪ সংখ্যার মূল্য বাবদ ৪০০/- টাকা অগ্রিম পাঠাতে হয়।

৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না। ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ২০% কমিশন

২০ কপির উর্ধ্বে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

⇨ ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) = ১০০ × ৪ = ৪০০/-

⇨ ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) = ১০০ × ৮ = ৮০০/-

⇨ ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(বার সংখ্যা) = ১০০ × ১২ = ১২০০/-

www.pathagar.com

একদল দক্ষ কলম সৈনিকের অক্লান্ত পরিশ্রমে
প্রকাশিত হচ্ছে 'ইসলাম আইন ও বিচার' পত্রিকার মাসিক বুলেটিন

জীবন বিধান

দেশ, জাতি ও সমকালীন দেশী-বিদেশী ঘটনার যুগোপযোগী
বিচার বিশ্লেষণসহ
বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও ফিচার থাকছে প্রতিটি সংখ্যায়
আপনি জীবন বিধান পড়ুন
এতে লিখুন ও
প্রকাশিত লেখার ব্যাপারে মতামত দিন।
আগামী মার্চ সংখ্যায় মাসিক বুলেটিন

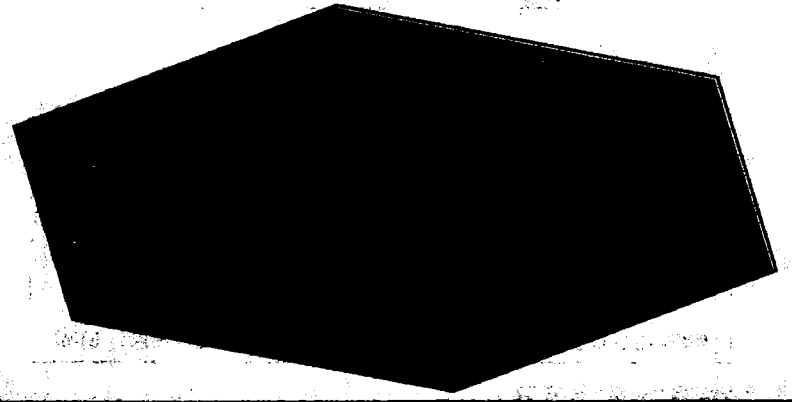

www.pathagar.com

REGD. NO. DA. 237(1) ISLAMI AIN O BICHAR : OCTOBER - DECEMBER : 2010. Tk. 100

- ইসলামী বিধানে রিবা : আধুনিক প্রেক্ষাপটে সংশয় নিরসন
  প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সোলায়মান
  মুহাম্মদ রুহুল আমিন

- দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায় : কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি
  ড. মোঃ শামছুল আলম

- দারিদ্র্য নিরসন ও যাকাত
  ড. মুহাম্মদ ইউসুফ

- মুদারাবা কারবারের শরয়ী বিধান : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহে এর প্রয়োগ
  ড. মুহাঃ কামরুজ্জামান

- বাংলাদেশে ইসলামী আইন : সমস্যা ও সম্ভাবনা
  ড. মো. মাসুদ আলম
  মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

- ইভটিজিং প্রতিরোধ : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট
  নাহিদ ফেরদৌসী

- ইসলামে বাল্যবিয়ে : ইসলাম ও বর্তমান সমাজ
  মোহাম্মদ ইলিয়াছ ছিদ্দিকী
  মোহাম্মদ মুরশেদুল হক